প্রথম প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ ১৩৬৬

প্রচ্ছদশিল্পী : ফণী সাহা

প্রকাশক : শ্যামাপদ ভট্টাচার্য । সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ।
৩৮ বিধান সরণী । কলিকাতা ৬

মুদ্রক : দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য । ব্রাহ্মমিশন প্রেস ।
২১১/১ বিধান সরণী । কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

সমালোচক কে?

সমালোচনায় অধিকার কার? যিনি স্বয়ং সাহিত্যস্রষ্টা, যিনি কবি, সমালোচনায় তাঁরই অধিকার, না সাহিত্য উপভোগ করার রুচি সত্ত্বেও সাহিত্যসৃষ্টি যাঁর ক্ষমতার বাহিরে?

প্রশ্নটি হালকা নয় কেননা এ-প্রশ্নের সঙ্গে আরো কয়েকটি প্রশ্ন অনুশ্লিষ্ট।

সমালোচনা কাকে বলি? ইওরোপীয় সাহিত্যে ক্রিটিক্ বলতে যা' বোঝায়, বিশেষত রেনেসাঁস পরবর্তী যুগ থেকে যা' বুঝিয়েছে, ইংরেজি সভ্যতার অভিসংঘাতের পরে থেকে বাঙলা সাহিত্যেও আমরা যা' বুঝেছি, ক্রিটিসিজ্‌ম বা সমালোচনার তেমন কোনো অভিধা সংস্কৃত চিন্তার ঐতিহ্যে ছিল কিনা সন্দেহ, ইওরোপীয় ঐতিহ্যেও বোধ'লো ড্রাইডেন জনসন-এর পূর্বে তেমন স্পষ্ট ছিল না। ক্রিটিসিজ্‌ম আর সমালোচনা, এই শব্দ দু'টির উৎপত্তি বিবেচনা করুন। ইংরেজি শব্দটির মূলে লাটিন ক্রিটিকাস্, গ্রীক ক্রিটিকোস্। মূল গ্রীক ও লাটিনে (মধ্যযুগীয় ফরাসী ভাষায়ও) এ-কথাটির চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় মানে বলবৎ ছিল। 'ক্রাইসিস্' থেকে 'ক্রিটিক্যাল', সে-অর্থ ইংরেজি ভাষায় এখনো চলছে। ব্যাধির সঙ্কটমুহূর্তে চিকিৎসকের সতর্ক বিচার-শক্তিতে যে-ভরসা রাখি, সে শক্তিই ক্রিটিকের শক্তি। কালক্রমে (অন্যান্য বহু শব্দের মতো) এ-শব্দটি এর গোড়াকার সঙ্কীর্ণ অভিধা ছাড়িয়ে ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করল, সে-অর্থে প্রবল হ'ল ত্রুটিনির্ণয় শক্তি, বিচারশক্তি, সৎ ও অসতের প্রভেদ জ্ঞান ও মূল্য নির্দেশের ক্ষমতা। ইংরেজি ভাষায় critic, critical, criticism, criticize শব্দগুলি আবির্ভূত হয়েছিল মধ্য-ষোড়শ থেকে মধ্য-সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তী কালে আর সে কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতীচ্যের সাহিত্য চিন্তার পরিণামে ক্রিটিসিজ্‌ম্ কথাটির আধুনিক অভিধা জন্মেছে। সংস্কৃতে সমীক্ষা বলতে বোঝাতো গ্রন্থ আলোচনা কিন্তু তা'তে আধুনিক সমালোচনার তাৎপর্য ছিল না। (লক্ষ্য করা দরকার যে সমীক্ষা ও আলোচনা যে-দু'টি শব্দে সংস্কৃত যুগে সাহিত্য-আলোচনা বোঝাতো—সে-শব্দ

দু'টির তাৎপর্য ঈক্ষণ, দৃষ্টিপাত, অবলোকন, কিন্তু এ-অর্থে বিচার ক্রিয়ার সে-ইশারা নেই যা' গ্রীক ও লাটিনের মূল শব্দে পাওয়া যায়, বরঞ্চ book review অর্থে গ্রন্থ-সমীক্ষা কথাটির ব্যবহার হতে পারে।). সংস্কৃতের ভাষ্যকার ছিলেন অর্থবেত্তা, সমঝদার লোক। আধুনিক অর্থে সমালোচক মূল্যবেত্তা, জহুরী, বিচারবিৎ। এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যালোচনায় পার্থক্য প্রচুর এবং মৌল কিন্তু দু'টি বিষয়ে তারা সমগোত্র। (১) দু'রকম আলোচনাতেই তারিফ করার শক্তি থাকা দরকার। রসের প্রশংসা করবেন রসিক, শিল্পের কদর জানবেন জহুরী, তবেই না জমবে তাঁদের আলোচনা! (২) দু' রকম আলোচনারই গোড়াতে সাহিত্যরূপ কী সে-সম্বন্ধে খানিকটা থিওরি বা ভাবয়িত্রী ধারণা হয়তো সবসময় খুব স্পষ্ট, সুসম্বদ্ধ ও প্রকট নয়, তবুও বিদ্যমান। যিনি ভাষ্যকার ও রসবেত্তা তিনি অবশ্যই রস-শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁর রসশাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য পাঠ সুসম্মত ব'লেই তিনি ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তবুও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে (এবং গ্রীকো-রোমান রেটরিক শাস্ত্রেও) ইস্থেটিক্স্ বা নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে কাব্যপাঠের ও কাব্যমূল্যায়নের ঘনিষ্ঠতা নেই যা' আধুনিক সমালোচনা-শাস্ত্রের সর্বপ্রধান লক্ষণ। ভারতীয় ঐতিহ্যে ছিল ভাষ্যকার, টীকাকার, ছিল না আধুনিক অর্থে সমালোচক, আর এই আধুনিক অর্থ ইওরোপীয় চিন্তার ক্রম-বিকাশেরই পরিণতি কেননা যদিচ লাটিন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ভারতের মতোই টীকা ও ভাষ্য রচিত হয়েছিল অগুণতি, যদিচ সে দেশেও সাহিত্যিক পঠন পাঠন দীর্ঘকাল সীমাবদ্ধ ছিল ব্যাকরণে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে, তবুও সোক্রাটেস্-প্লেটো-আরিস্টট্ল-হোরেস্-লন্জাইনাস্ থেকে যে-চিন্তা ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করেছিল তারই উত্তরাধিকার একালের সর্বদেশীয় সাহিত্য চিন্তায়।

সমালোচনার আধুনিক অর্থ কী?

সমালোচনার সংজ্ঞা টি, এস্, এলিয়ট দিয়েছেন এইভাবে: the commentation of works of art by means of written words—(লিখিত শব্দের মাধ্যমে শিল্পকর্মের ভাষ্য ও ব্যাখ্যারচনা)।

এমন হওয়া সম্ভব যে সংস্কৃত-পড়া এলিয়ট সংস্কৃত ভাষ্যের অনুরাগী ব'লেই সমালোচনার এহেন সেকেলে অভিধা পেশ ক'রেছিলেন। কিন্তু এ-ও সত্য যে তিনি এ অভিধাতেই আবদ্ধ থাকেননি। এলিয়ট নানা কারণে (অসঙ্গত

কারণ নয় সেগুলি) সমালোচনার নামে যে সব হঠকারী রচনা সংবাদপত্রে সচরাচর দেখা যায় তার বিরুদ্ধে কশাঘাত করেছিলেন এবং যে-sense of fact, যে-তথ্যনিষ্ঠা সৎ সমালোচকের মস্ত লক্ষণ তা'র প্রতি আমাদের চিন্তা আকর্ষণ করার জন্য বলেছেন :

Any book, any essay, any note in *Notes and Queries* which produces a fact even of the lowest order about a work of art is a better piece of work than nine-tenths of the most pretentious critical journalism in journals or in books.

(সংবাদপত্রে অথবা বইয়ে যে খবরের কাগজি হামবড়া সমালোচনা বেরয় তা'র শতকরা নব্বই ভাগের চেয়েও অনেক উন্নত কাজ সে সব বই, সে সব প্রবন্ধ, "নোট্‌স্ এ্যাণ্ড কোয়েরিস্" পত্রিকায় প্রকাশিত যে-কোনো সংক্ষিপ্ত রচনা, যা'তে শিল্পকর্ম সম্বন্ধে যত তুচ্ছই হোক না কেন কিছু তথ্য পাওয়া যায়।)

এলিয়টের তথ্যপ্রিয়তা ঠিক প্রাচীন ভাষ্যপন্থী নয়, বরং অতীব অধ্যবসায়ী আধুনিক textual scholarship-এর অর্থাৎ গ্রন্থজ্ঞানী তন্নিষ্ঠ পাণ্ডিত্যের পক্ষপাতী। Impressionistic criticism নামে এককালে যে আত্মকেন্দ্রিক স্বমতবিলাসী শিথিলদায়িত্ব রচনা সাহিত্যিক মহলে লোকপ্রিয় হয়েছিল তা'কে বর্জন করাই এলিয়টের উদ্দেশ্য। বস্তুত স্বয়ং আধুনিক সমালোচনার অন্যতম ধারক ও বাহক হ'য়ে এলিয়ট যে সমালোচনার আধুনিক অভিধা সম্বন্ধে সচেতন, তীক্ষ্ণভাবেই সচেতন, তা'র আভাস পাওয়া যায় যখন তিনি বলেন :

Criticism must always profess an end in view which, roughly speaking, appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste.

(সমালোচনার দৃষ্টিপথে সতত একটি উদ্দেশ্য থাকা চাই, সে-উদ্দেশ্য —মোটামুটিভাবে বলতে গেলে—শিল্পকর্মের উজ্জ্বল ব্যাখ্যা এবং রুচিমার্জনা।)

অর্থাৎ এলিয়টের বিশ্বাসে সমালোচনায় সচেতন উদ্দেশ্য একান্ত আবশ্যক,

সমালোচকের এমন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যাতে তিনি বুঝতে পারেন কোন্‌টি শিল্পকর্ম কোন্‌টি সংরুচি সম্পন্ন, এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে তিনি প্রথমে শিল্পের ব্যাখ্যা (প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা অবশ্য) করবেন আর সেই সঙ্গে অপরের রুচিমার্জনা করবেন। সচেতন উদ্দেশ্য, মূল্যজ্ঞান, সংরুচিবিস্তারস্পৃহা, এই তিনের অধিকারিত্বে সমালোচকচরিত্র বৈশিষ্ট্যবান। নানা কারণে এলিয়ট সমালোচনার সুস্পষ্ট সংজ্ঞাদানে বিরত থেকেছেন কিন্তু সংজ্ঞার যে-আভাসমাত্র তিনি দিয়েছেন তার নির্দ্বিধ প্রকাশ ম্যাথিউ আর্নল্ডে ও আইভর্ রিচার্ড্‌স্‌-এ। এঁদের সারকথা যে সমালোচনা আসলে মূল্যায়ন, আর এ-কথায় এ যুগের অধিকাংশ সাহিত্যশাস্ত্রীর সমর্থন মিলবে অল্পবিস্তর। আর্নল্ডের সংজ্ঞা ;

[Criticism is] a disinterested endeavour to learn and propagate the best that is known and thought in the world.

(জগতে শ্রেষ্ঠ ব'লে যা' কিছু জ্ঞাত হয়েছে বা ভাবা হয়েছে তা' জানবার এবং প্রচার করবার জন্য নিষ্কাম প্রয়াসই সমালোচনা)—আর্নল্ড অন্যত্র ক্রিটিসিজমের কথায় বলছেন :

Its business is, simply to know the best that is known and thought in the world, and by in its turn making this known, to create a current of true and fresh ideas.

(জগতে শ্রেষ্ঠ যা'কিছু জানা হয়েছে বা অনুধ্যাত হয়েছে তা'ই জানা এর কাজ, আরও কাজ এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রচার ক'রে সত্য ও সজীব চিন্তাধারার সৃষ্টি করা) ;—যেমন এলিয়টের উক্তিতে তেমনই আর্নল্ডের উক্তিতে প্রধান বক্তব্য হ'ল যে জ্ঞান অর্জন করতে হবে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ চিন্তা সে-বিষয়ে, সে-জ্ঞান অপরের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে হবে, এবং এতদ্বারা নবীন চিন্তাধারার প্রবাহন করাতে হবে। রিচার্ড্‌স্‌ বলেছেন :

Criticism, as I understand it, is the endeavour to discriminate between experiences and to evaluate them.

(সমালোচনা ব'লতে আমি বুঝি এক অভিজ্ঞতায় ও অন্য অভিজ্ঞতায় তারতম্য বিচার ও তা'দের মূল্যায়ন।)—রিচার্ড্‌স্‌-এর ধারণায়ও সমালোচনা-কর্মে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন, সদসৎ ও শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের জ্ঞান

থাকা প্রয়োজন, নতুবা যে কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপর অভিজ্ঞতার প্রভেদ বিচার করা যাবে কেমন ক'রে ? তাদের মূল্যনিরূপণ করব কী ক'রে ?

তীক্ষ্ণধী আধুনিক সমালোচক আরো জনকয়েকের উক্তির উল্লেখ করা বাহুল্য হবেনা।

প্রতিপত্তিশালী আমেরিকান সমালোচক হেন্‌রি লুই মেন্‌কেন্ বলছেন :

The function of a genuine critic of the arts is to provoke a reaction between the work of art and the spectator ; the spectator, untutored, stands unmoved ; he sees the work of art, but it fails to make any intelligible impression on him ; if he were spontaneously sensitive to it, there would be no need for criticism.

(খাঁটি শিল্পসমালোচকের কাজ এই : শিল্পবস্তু সম্বন্ধে দর্শকের চিত্তে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করা। বিনা শিক্ষায় দর্শক অসাড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। শিল্পবস্তু তিনি দেখেন বটে কিন্তু তাঁর চিত্তে কোনো বোধগম্য ছাপ পড়ে না। সমালোচনার কোনো প্রয়োজনই হ'ত না যদি তিনি স্বতঃই শিল্পের প্রতি সংবেদনশীল হতেন।)—এখানেও সৎরুচিবিস্তারের কথা আছে কিন্তু রুচি-বিস্তার তিনি কী ভাবে করবেন যদি সৎরুচি কোন্‌টি সে-বিষয়ে তাঁর নিজেরই জ্ঞান না থাকে ?

বহু সাহিত্যিকের চিন্তাগুরু এজরা পাউণ্ড বলছেন :

Excernment. The general ordering and weeding out of what has actually been performed···the ordering of knowledge so that the next man (or generation) can most readily find the live part of it, and waste the least possible time among obsolete issues.

(বাছাইয়ের কাজ। যে-কাজ বাস্তবিক করা হয়েছে তা'র বিন্যাস ও নিড়নো। জ্ঞানের বিন্যাস, যা'তে এর পরের জ্ঞানার্থী [অথবা পরবর্তী পুরুষপর্যায়ের জ্ঞানার্থী] চট ক'রেই প্রাণবান অংশটি খুঁজে পায়, অপ্রচলিত সমস্যা নিয়ে তা'র সময় নষ্ট হয় না।)

ইদানীংকার প্রভাবশালী ইংরেজ অধ্যাপক-সমালোচক ডক্টর লীভিস্ বলছেন :

The critic's aim is, first, to realize as sensitively and completely as possible this or that which claims his attention, and a certain valuing is implicit in the realizing ....A philosophic training might possibly—ideally would—make a critic surer and more penetrating in the perception of significance and relation and in judgment of value .... the business of the literary critic is to attain a peculiar completeness of response and to observe a peculiarly strict relevance in developing his response into commentary; he must be on guard against abstracting improperly from what is in front of him and against any premature or irrelevant generalizing.

(সমালোচকের লক্ষ্য হবে, প্রথমত, যে-বিষয়ে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, যতদূর সম্ভব সংবেদিত ও সম্পূর্ণভাবে সে-বিষয়ের প্রণিধান করা আর এই প্রণিধানে কিছুটা মূল্যায়নকর্ম অবশ্যই নিহিত থাকবে। সমালোচকের যদি দার্শনিক অনুশীলন থেকে থাকে—তেমন হওয়াই আদর্শ মনে করি—তাহ'লে তাৎপর্যজ্ঞান, সম্পর্কজ্ঞান এবং মূল্যনিরূপণ বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি নিশ্চয়তর ও গভীরতর হবে···সাহিত্য-সমালোচকের কাজ সংবেদনায় পূর্ণতা অর্জন করা আর এ-সংবেদনাকে প্রসঙ্গনিষ্ঠ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে পরিণত করা। তাঁকে সতর্ক হ'তে হবে যেন বক্ষ্যমান সাহিত্যবস্তু থেকে অবৈধ অর্থ আকর্ষণের চেষ্টা না করেন অথবা অপ্রস্তুত ও অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ মন্তব্যে লিপ্ত না হ'ন।)

দেখা যাচ্ছে, আধুনিক অর্থে সমালোচনা ও মূল্যায়ন সমার্থ। মূল্যায়ন কী ভাবে হবে, কেন মূল্যায়ন, সে-মূল্যায়নেরই বা কী মূল্য, কোন্ তৌলদণ্ডে মূল্যায়ন, এহেন অনেক সূক্ষ্ম প্রশ্নে সমালোচকদের মধ্যে অনেক বিতণ্ডার উদ্ভব হ'য়ে থাকে কিন্তু আধুনিক সমালোচনা-তত্ত্বের ইমারত গড়ে' উঠেছে

কয়েকটি সর্বস্বীকৃত চিন্তার বুনিয়াদের উপরে। যদি মানি যে সমালোচনা মানে মূল্যায়ন, তাহ'লে এ-ও মানব যে মূল্যায়ন মাত্রেই তুলনাশীল। কোনো বস্তুরই অনুত্তরণীয় মূল্য নেই (বাক্যাতীত চিন্তাতীত তুরীয় জ্ঞান ছাড়া). মূল্য মানেই আপেক্ষিক গুণারোপ। সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে মূল্য কমতে পারে কিন্তু বাড়তেও পারে। যে-বস্তু অদ্বিতীয়,—ধরা যাক, মীনাক্ষী মন্দির, সেলিমশাহ্ চিশ্‌তীর সমাধি, এল গ্রীকো'র 'জনৈকা মহিলা'—তা'রও মূল্যায়ন চলে একটা শিল্পাদর্শের তুলনায়। অর্থাৎ এমন মন্দির তৈরি হ'তে পারে যা' মীনাক্ষী মন্দিরের চেয়ে মহৎ, অথবা তার তুলনায় নিখুঁত। সুতরাং সুন্দর অনন্য বস্তুরও সৌন্দর্যের মাপকাঠি আছে। আর মাপকাঠি জানতে হ'লে সুন্দর বস্তু সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মীনাক্ষী মন্দির দেখতে হবে, আরো অনেক মন্দির দেখতে হবে, তবেই না শিল্পাদর্শ গড়ে' উঠবে। মূল্যায়নের গোড়ার কথা, প্রচুর জ্ঞান।

আধুনিক সমালোচনার প্রথম সর্বস্বীকৃত চিন্তা যে মূল্যায়নই সমালোচনার বিশিষ্টতম গুণ। দ্বিতীয় চিন্তায় পৌঁছই এই ধারণায় যে সমালোচনা মাত্রেই কোনো না কোনো থিওরির অর্থাৎ ভাবয়িত্রী জ্ঞানের, কোনো না কোনো দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমালোচক স্বয়ং খুব দর্শনবিৎ না হ'তে পারেন (অনেক সমালোচকই তেমন নয়) কিন্তু তাঁর মূল্যায়নে যে-সদসৎ জ্ঞান, সুন্দর-অসুন্দরে যে-তারতম্য নিহিত রয়েছে সে-জ্ঞান, সে-তারতম্য, মূলত দার্শনিক চিন্তা থেকেই উদ্ভূত। বিচক্ষণ দর্শনবিৎ সাহিত্যের এলাকায় এসেছেন—কতটা সাহিত্যের তাগিদে তা' বলা কঠিন তবে সাহিত্যের আলোচনা উপলক্ষে তাঁদের দার্শনিক শক্তি হয়তো সহজস্ফূর্ত হ'তে পারে—এমন ঘটনা বিরল নয়। সমালোচনার ইতিহাসে অ্যারিস্টট্‌ল্, টমাস্ অ্যাকোয়ায়নাস্, হেগেল, নীচে, ক্রোচে প্রভৃতির স্থান দার্শনিক সমালোচক হিসেবে। অপর পক্ষে কোল্‌রিজ্ ও ওয়ল্টর পেটার এর মতো সমালোচকের দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন, এঁরা দু'জনেই দর্শন-অনুরাগী ছিলেন, যেখানেই এঁরা সাহিত্যের কথা বলেছেন সেখানেই তাঁদের উক্তির দার্শনিক পশ্চাৎপট সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁরা সমালোচনায় লিপ্ত হ'য়েছিলেন সাহিত্যের কারয়িত্রী সৌন্দর্য অনুভব করার জন্য, কোন্ কবিতাটি ভালো, কোন্ কবি মহৎ, কোথায় কাব্যবিশেষের আবেদন এ সব শিল্পকৃতি আলোচনার জন্য। অন্য এক

শ্রেণীরও সমালোচক আছেন, তাঁরা কোনো দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন নন—যদিও একেবারে দর্শনবর্জিত মানুষ সম্ভব নয়—কিন্তু সাহিত্য কর্মের তুলনায় ও মূল্যায়নে সুপটু। দৃষ্টান্তস্বরূপ হ্যাজ্‌লিট্ ও স্যাঁৎ বোভ্-এর উল্লেখ করতে পারি। এঁরা স্বয়ং দর্শন-সচেতন যদি না-ও হ'য়ে থাকেন, এঁদের মূল্যায়নের দার্শনিক পশ্চাৎপট রচনা করা আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু থিওরি সম্বন্ধে চেতনা থাক বা না থাক, সাহিত্য সম্বন্ধে রুচি না থাকলে সমালোচক হওয়া অসম্ভব। দার্শনিক পশ্চাৎপটে রুচি প্রশিক্ষিত হয়, রুচিই বড়ো কথা, দর্শন গৌণ, রুচির জন্য শিক্ষার জন্যই দর্শন।

তৃতীয় সর্বস্বীকৃত চিন্তায় মানতে হয় যে সমালোচকের কাজে প্রচারপ্রবৃত্তি বর্তমান। সমালোচক নিজে ভালোমন্দ জেনে ক্ষান্ত নন, সে-জ্ঞান আরো পাঁচজনে না বিলানো অবধি তাঁর তুষ্টি নেই। অন্য সব প্রচারকের মতো সমালোচকও মস্ত একটা সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত। আর্নল্ড বলছেন সমালোচক স্বয়ং শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করবেন শুধু এমনই নয়, উপরন্তু সে-জ্ঞানের প্রচার করবেন। কেন প্রচার করবেন? না, সে-প্রচারের শক্তিতেই নূতন চিন্তা-ধারার পথ সুগম হবে, তা'র ফলে সমাজের অতএব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে। এজ্‌রা পাউণ্ড ভাবছেন সৎসমালোচকের কাজের ফলে আগামী জ্ঞানার্থীর উপকার হবে, অতএব সামাজিক দায়িত্ব চরিতার্থ হবে। সমালোচনা যে প্রচার, সমালোচকের যে কর্তব্য সমাজের প্রতি, সে কথা বলেছেন সব সমালোচনাশাস্ত্রী, হয় স্পষ্টভাবে নয় তো প্রকারান্তরে।

বস্তুত সমালোচকের কাজ আমার এই অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় যতটুকু নির্দেশিত হ'য়েছে তা'র চেয়ে অনেক বেশি জটিল। সে-কাজে বৈশিষ্ট্য কত রকমের, আর যখন যেমন বৈশিষ্ট্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করি তখন তেমন একপেশে সমালোচনার উদ্ভব হয়—সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা, মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিক, আঙ্গিকী আলোচনা, কলাকৈবল্যবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি—কিন্তু শিল্পের বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা, সুরুচি (আলঙ্কারিকদের ভাষায় সহৃদয়তা, বৈদগ্ধ্য, তন্ময়ীভবনযোগ্যতা, অথবা রিচার্ড্‌স্-এলিয়ট-এম্প্‌সনের ভাষায় 'সেন্‌সিবি-লিটি') এবং প্রচার কামনা যাবতীয় সমালোচকেরই গ্রাহ্য।

২

সমালোচক যদি হ'ন জহুরী, স্যাকরার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী ? যিনি স্যাকরা, তিনিই জহুরী, না অন্য কেউ জহুরী ? যিনি রেঁধেছেন তিনিই চাখবেন, না অন্য কেউ চাখবেন ? যে চা কুলি চা পাতা ফলিয়েছে, চা-রসের মর্ম সে বুঝবে ভালো না চা-চাখিয়ের আমদানি করতে হবে ? সমালোচনাকর্মে যোগ্যতা কার ? স্বয়ং কবির না সমালোচক নামধেয় অন্য জীবের ? এমন বলব কি যে কবি ও সমালোচক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ; তাঁদের চরিত্র, কাজ, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সবই আলাদা ? এ-প্রশ্ন তুলেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা হয়েছে।

এ-বিষয়ে প্রধানত দু'রকমের মত প্রচলিত। শেক্‌স্‌পিয়রের বন্ধু, যশস্বী লেখক বেন্ জন্‌সন্ বলেছিলেন : To judge of the poets is only the function of poets (কবিদের বিচার একমাত্র কবিদেরই কাজ)। অনুরূপ মত পোষণ করতেন কোল্‌রিজ :

The question should be fairly stated, how far a man can be an adequate, or even a good though inadequate critic of poetry, who is not a poet, at least *in posse*. Can he be an adequate, can he be a good critic, though not commensurate ? But there is yet another distinction Supposing he is not only not a poet, but is a bad poet ! What then ?

—(প্রশ্নটি পরিষ্কার ভাবে পেশ করা উচিত : যিনি কবি নন, নিদেন পক্ষে কবিত্বসম্ভব মন, তিনি কি সম্যক সমালোচক হ'তে পারেন, অথবা যদিও অসম্যক তবুও সৎ সমালোচক হ'তে পারেন ? এছাড়া আরো তারতম্য আছে। ধরা যাক তিনি কবি তো ননই বরং মন্দ কবি। তখন কী হবে ?)

বোদেলেয়র বিশ্বাস করতেন যে কবিরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক হ'তে পারেন, আর ড্রাইডেন (এককালে তাঁর নামে ও কাব্যে সঙ্গতি পাওয়া যেত কিন্তু ইদানীং যে তাঁকে কবিসত্তম ব'লে মানা হয় তাতে সমালোচনার ও রুচির পরিবর্তনশীলতা খানিকটা প্রমাণিত হয় বৈ কি !) সমালোচক সম্বন্ধে উক্তি করেছেন অপ্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুরে : The critic is the artist *manque* ! —

(যিনি একদা শিল্পসৃজন সাধনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনিই এখন হয়েছেন সমালোচক!) এলিয়ট বলেছেন :

At one time I was inclined to take the extreme position that the *only* critics worth reading were the critics who practised, and practised well, the art of which they wrote.

—(এককালে আমি এমনধারা বাড়াবাড়ি মত পোষণ করতাম যে কেবল সে-সব সমালোচকই পাঠযোগ্য যাঁরা স্বয়ং তাঁদের আলোচ্য শিল্পের চর্চা করতেন আর ভালোভাবেই করতেন।)

এ বিষয়ে অনেক উক্তি সংগ্রহ করে লাভ নেই। কোন্‌পক্ষে বাচনিক সমর্থন কতগুলি তার সংখ্যা গুণে মতানৈক্যের ফয়সালা করতে যাওয়া হাস্যকর ব্যাপার। কথাটা হচ্ছে, কে সমালোচক সে-বিষয়ে জনকয়েক নিষ্ঠাবান প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী একই ধরনের মত পোষণ করেছেন, এঁদের বিশ্বাস সৎ-কবি হ'লেই সৎ-সমালোচক হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ (ইংরেজি সাহিত্যে) বেন্‌ জন্‌সন্‌, ড্রাইডেন, কোল্‌রিজ্‌, ম্যাথিউ আর্নল্ড, এলিয়ট, এঁদের কথা ভাবতে পারি, এঁরা প্রত্যেকেই স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ কবি আবার প্রতিভাবান সমালোচক। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অধিক স্থিতপ্রজ্ঞ সমালোচক এতাবৎ জন্মাননি। মোহিত মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে সার্থক কবি আবার এঁদের সমালোচনা শক্তিও নিঃসংশয়।

অনেকে যেমন বলেছেন যে কবি যিনি তিনিই সমালোচক, অপরপক্ষে তেমনি সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে কবির সমালোচনা-পটুত্বে। এ-সংশয়ের অবিস্মরণীয় প্রকাশ সোক্রাটেসের উক্তিতে। মহাতার্কিক সোক্রাটেস্‌ অন্যান্য বহু কথার মধ্যে কবি ও কাব্য সম্বন্ধে কিছু উক্তি করেছিলেন যার ভিত্তিতে তদীয় শিষ্য প্লেটো তাঁর কাব্যতত্ত্বের ইমারত গড়েন আর অনতিকালপরে প্লেটোর শিষ্য আরিস্‌টট্‌ল্‌ অন্য ইমারত গড়েন বিপরীত চিন্তার ভিত্তিতে, আর সে-কাল থেকে আজ অবধি সরাসরি অথবা পরোক্ষে সোক্রাটেসের ধারণা ইওরোপীয় যাবতীয় কাব্যতত্ত্বের পশ্চাতে বিরাজমান। সোক্রাটেস্‌ এমন কথা মানেননি যে কাব্যরচনায় যাঁর প্রতিভা, সে-রচনার সযৌক্তিক বিশ্লেষণও তাঁর সাধ্যায়ত্ত। বরং উল্টো কথারই প্রমাণ পেয়েছিলেন নিজ অভিজ্ঞতায়।

আদালতের জবানবন্দীতে সে-অভিজ্ঞতার বর্ণনা-ই তিনি দিয়েছেন। সোক্রাটেস্ বলেছেন তিনি নানা কবিদের কাছে যেতেন, জিজ্ঞাসা করতেন তাঁদের কবিতার মানে কী? (সাংঘাতিক লোক ছিলেন সোক্রাটেস্! আমি কল্পনা করতে পারি সেই যে "আবোল তাবোল"-এর নাছোড়বান্দা বুড়ো আমাদের শ্যামাদাস বেচারিকে বুঝিয়ে বলার জন্য রাস্তার মাঝে গলার চাদর ধ'রে টেনেছিল, সোক্রাটেসের হাতে অ্যাথেন্সের কবিকুল লাঞ্ছিত হয়েছিল তেমনি করুণ ভাবে।) কিন্তু হায়, কবিগণ সে-প্রশ্নের জবাব নাকি দিতে পারেননি, অতএব সোক্রাটেস্ প্রথমত এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কবিরা কবিতা-ব্যাখ্যায় (এমনকি স্বরচিত কবিতা-ব্যাখ্যায়ও) অপারগ, হয়তো পথচারী যে-কোনো লোক কবির চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারেন। গল্প শুনেছি যে জনৈকা বিভ্রান্ত পাঠিকা কবি ব্রাউনিংকে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর 'সোর্ডেল্লো' কবিতার মানে কী? কবি সবিনয়ে বলেছিলেন, কবিতাটির রচনাকালে দুজনে তার মানে বুঝেছিলেন, ঈশ্বর ও রবর্ট ব্রাউনিং। রচনাশেষে এর মানে শুধু ঈশ্বরই জানেন, কবি স্বয়ং তাঁর পাঠিকার মতোই বিভ্রান্ত। সোক্রাটেসের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল যে কবিরা কাব্যরচনা করেন অলৌকিক প্রেরণাবলে, এক ধরণের ঐশী উন্মাদনার তাড়নায়। যেই কাব্যরচনা সম্পূর্ণ হয়, সে-প্রেরণাও অদৃশ্য হয়, কবি আর তখন অসাধারণ ব্যক্তি নন, খুবই সাধারণ মানুষ। সোক্রাটেস্ সম্ভবত বিগতপ্রেরণা কবিদের অবসাধারণ মানুষ ব'লেই গণ্য করতেন! শিল্পী যে স্বকীয় শিল্পের ব্যাখ্যায় অপারগ, একথা প্লেটোর গ্রন্থাবলীতে কয়েক জায়গাতেই পাওয়া যায়। তাঁর "আইওন" নামক গ্রন্থে দেখা যায় আইওন নামে জনৈক র‍্যাপ্সোড্ অর্থাৎ এক ধরনের অভিনয়-আবৃত্তিকার শিল্পী, হোমর্-এর কাব্যের পরম অনুরাগী কিন্তু সে-অনুরাগের যৌক্তিক বিশ্লেষণে অপারগ। শিল্পীর এই অক্ষমতা লক্ষ্য ক'রেই তর্কবাগীশ মহোপাধ্যায় সোক্রাটেস্ প্লেটোর "রিপবলিক্" গ্রন্থে গ্লৌকন্‌কে বলেছেন সদয়কণ্ঠে :

We might also allow her champions who are not poets, but lovers of poetry, to publish a prose defense on her behalf.

—(আমরা হয়তো অনুমতি দেব যাতে যাঁরা স্বয়ং কবি নন কিন্তু কাব্যপ্রেমী,

কাব্যের সমর্থক, তাঁরা যেন কাব্যের সপক্ষে জবাবদিহি প্রকাশ করেন।)
—এখানে সোক্রাটেস্ যে-জবাবদিহির উল্লেখ করেছেন সেটা আমাদের বর্তমান আলোচনার বাহিরে যদিও মূল্যবান কথা, কিন্তু আপাতত লক্ষ্যণীয় বিষয় যে তাঁর বিশ্বাসে কবি ও কাব্যপ্রেমী, শিল্পী ও সমালোচক স্বতন্ত্র ব্যক্তিসম্পন্ন।

সোক্রাটেস্ এবং প্লেটো মনে করেন কবি স্বয়ং সমালোচনায় অক্ষম। এমন কথা আরো অনেকেই ভেবেছেন, এখনো ভাবছেন। কোনো কোনো শক্তিশালী সমালোচকের কথা জানি—হ্যাজলিট্, স্যাঁৎ বোভ্., রিচার্ড্স্, লীভিস্—যাঁরা পুরোপুরি সমালোচক, স্বয়ং শিল্পী নন। আবার এ-ও জানি অনেক লেখক নিজ রচনার ব্যাখ্যায় তালগোল পাকিয়ে ফেলেন অথবা নিদেনপক্ষে নিজ রচনার ব্যাখ্যাসম্ভাবনায় বিস্মিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপে আমেরিকান লেখক হার্মান মেলভিলকে নেওয়া যাক। মেলভিলের "মোবি ডিক্" নামক মহাকাহিনীতে যে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়ই প্রতীকী সংকেত লুকিয়ে আছে একথা আজ ইস্কুলের ছেলেরাও জানে, কিন্তু মেলভিলের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করছি:

Your allusion to the 'spirit spout' first showed to me that there was a subtle significance in that thing—but I did not, in that case, *mean* it. I had some vague idea while writing it, that the whole book was susceptible of an allegoric construction, and also that *parts* of it were—but the speciality of many of the particular subordinate allegories was first revealed to me after reading Mr. Hawthorne's letter which intimated the part and parcel allegoricalness of the whole.

—(আপনি যখন 'অশরীরী ফোয়ারার' উল্লেখ করলেন তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম যে ওর একটা গূঢ় অর্থ আছে, কিন্তু এমন অর্থ আমি বোঝাইনি। যখন বইখানা লিখছিলাম তখন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে গোটা বইটিতেই রূপকার্থ আরোপ করা সম্ভব আর কোনো কোনো অংশে এমন অর্থ বাস্তবিকই নিহিত, কিন্তু মিঃ হথর্ন-এর চিঠি পড়ার পরেই আমার

কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'ল অনেক গৌণ রূপকের বৈশিষ্ট্য। তাঁর সে-চিঠি থেকেই আমি সম্পূর্ণ গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ রূপকত্ব বুঝতে পেরেছি।)

এ-চিঠিতে প্রশ্নবিৎ সোক্রাটেসের সিদ্ধান্ত খানিকটা সমর্থিত হয় বৈ কি! গ্রন্থের যা মূল বৈশিষ্ট্য সে-বিষয়ে লেখক নিজেই সচেতন নন, অন্যের কাছ থেকে সে-বৈশিষ্ট্য তাঁকে জানতে হয়! "পঞ্চভূত" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নানা চরিত্রের জবানিতে 'বিদায়-অভিশাপের' নানা ব্যাখ্যা দেবার পরে বলছেন : 'এই পর্যন্ত বলিতে পারি যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোনো অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড়ো নিরর্থক হয় নাই—অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়।'

সোক্রাটেস্ ও প্লেটো, চিন্তার ইতিহাসে মহামানী নাম কিন্তু আমার সংশয় অনপনেয়, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন কি কেন কবিরা নীরব ছিলেন, কেন কবিরা বলতে পারেন নি স্বরচিত কবিতাটি কী? সোক্রাটেস্ কবিদের যতো নির্বোধ অথবা যতো অপটু ভেবেছিলেন সত্যই কি তাঁরা তেমন, অথবা, ইংরেজি ভাষায় যেমন বলা হয় the boot is on the other leg, অর্থাৎ গলতি বোধ হয় ছিদ্রান্বেষীর নিজেরই? কোনো কবিকে যদি প্রশ্ন করা হয় (ধরে' নিচ্ছি তিনি সৎ কবি), আপনি যে কবিতাটি লিখেছেন এতে আছে কী? এটি কী বস্তু? তাহ'লে সৎ কবির পক্ষে একটি মাত্র জবাবই সম্ভব : বাপু হে, কবিতাটি কোন্ বস্তু আর হবে, এটি কবিতাই, কাব্যবস্তু, এতে থাকবে আর কী, আছে কাব্য। এমন জবাব দিলে কবি নিতান্তই যথার্থ কথা বলবেন। এ কথার মানে, কবিতায় (অথবা যে কোনো শিল্প কর্মে) অনন্য সত্তা, তা'র প্রতিভূ নেই, দ্বিত্ব নেই, নেই তা'র সম্যক সমান্তরাল। যদি প্রশ্ন কর, হে কবি, কোন্ কথাটি তুমি বলেছ কবিতায়? কবির জবাব হবে, আমি যে-কথাটি বলতে চেয়েছি তা' আছে কবিতাতেই, সে কথার আর কোনো রূপ আমার চিত্তে ছিল না, ছিল যে-অনন্য রূপ তাকেই আমি প্রকাশ করেছি আমার কবিতায়। যদি সে-কথা অন্যরকমে বলা যেতে পারত, যদি কেউ 'কোটী-জীব-কল্লোলিত—দাঁড়াইয়া এ জীবন-বারিধি-বেলায়,/মোর চক্ষে অশ্রু উথলায়!' এ-ছত্রটির হুবহু সমান্তরাল, হুবহু সমার্থ আরেকটি ছত্র রচনা করতে পারতেন, তাহ'লে বলা সম্ভব হ'ত না যে কবিতা অনন্য বস্তু, তাহ'লে

কাব্যের শিল্পপ্রাণ হ'ত দ্বিধা অথবা বহুধাগ্রস্ত, প্রাণ তা'র থাকত না, শিল্পের সুডৌল রূপে বঞ্চিত হ'য়ে সে পরিণত হ'ত এক খণ্ডিত-অবয়ব বাক্যসমাবেশে। একথা সত্য যে আমরা (মানে সাহিত্যের পঠনপাঠনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা) কাব্যবস্তুর ব্যাখ্যায় নিরত থাকি। আমরা জানতে চাই কবি কোন্ কথাটি বলতে চেয়েছেন? তাঁর জীবন-দর্শন কী, তাঁর সমাজবীক্ষণ তীক্ষ্ণ কিনা, তাঁর প্রিয় শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি ও ভাবানুষঙ্গ কোন্ ধরনের, ইত্যাকার কূট প্রশ্নে ছাত্র অধ্যাপক ভাষ্যকার সমালোচক মশ্‌গুল থাকেন বটে কিন্তু প্রশ্নোত্তরের সেই ক্ষণে কাব্য পরিণত হয়ে যায় ব্যবচ্ছিন্ন শবদেহে।

সোক্রাটেসের প্রশ্নশঙ্কিত কবি যদি নিরুত্তর অথবা স্বল্পোত্তর থেকে থাকেন তাহ'লে তিনি সৎ কবির উচিত কাজই করেছিলেন, অন্তত এবিষয়ে প্রশ্ন-কর্তার চেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন।

তবুও সোক্রাটেসের উক্তিতে মস্ত একটা স্বীকৃতি আছে, যে কাব্য ও কাব্যের আলোচনা পৃথক বস্তু, আর এই পার্থক্যের দরুন সোক্রাটেস ভেবেছিলেন কবি ও সমালোচক বিভিন্ন ব্যক্তি, যিনি কবি তিনি নন সমালোচক, যিনি সমালোচক তিনি কবি নন।

দেখা যাচ্ছে সোক্রাটেস্ ও বেন্ জনসন্—যদি এই দুইজনকে দুই ভিন্নপন্থী চিন্তার মুখপাত্র মনে করি—উভয়েই মেনেছেন যে কবিকর্ম ও সমালোচনা কর্ম আলাদা ক্ষেত্রে বিচরণ করে। তবে গ্রীক দার্শনিক যেখানে বলছেন যে কবি নয় এমন সমালোচকের সমালোচনাই গ্রাহ্য, ইংরেজ কবি-সমালোচক সে-প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধ ভাষায় বলছেন যে কবি-সমালোচকই একমাত্র সমালোচক।

তা হ'লে মানব কাকে? দুই পন্থার ভিন্নতা কি আপাত-ভিন্নতা, না দুরপনেয়?

৩

সমালোচকের কাজ পরগাছার কাজ। তার নিজ মূল নেই। অপরে যে-কাব্য রচনা করেছে, যে-শিল্পের রূপ দিয়েছে, তা' থেকেই সমালোচক স্বীয় কর্মের প্রাণরস আহরণ করেন। যদি সংসারে শিল্প না থাকত, তাহ'লে

শিল্প-সমালোচক থাকতেন না। শিল্পের জগতে শিল্পী প্রথম, সমালোচক দ্বিতীয়—এ ব্যবধান অলঙ্ঘ্য, তা' সে-শিল্পী যদি দুর্বল কারুকর্মী হ'য়েও থাকেন। এ-ব্যবধান ব্যক্তির নয়, গুণকর্মের ব্যবধান। সোক্রাটেস্ অথবা বোদেলেয়র যে যে-পক্ষের কথাই বলুন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে সৎ কবি সৎ সমালোচক হ'তে পারেন আবার না-ও হ'তে পারেন। স্পেন্সার, ডান্, মিল্টন্ সমালোচনায় লিপ্ত হননি, আর্নল্ড, সুইনবর্ণ, এলিয়ট হয়েছেন। তার মানে কবি-সত্তায় ও সমালোচক-সত্তায় কোনো আবশ্যিক বিরোধ নেই অথবা আবশ্যিক সাযুজ্যও নেই, কোনো ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিতে কবির গুণকর্ম ও সমালোচকের গুণকর্ম সমাবেশিত হয়েছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। যে ক্ষেত্রে সমাবেশিত হয়েছে—যেমন এলিয়টে—সেখানে বলব যে সাহিত্যিক এলিয়ট কখনো কখনো সৃষ্টিশীল, তখন তিনি কবি, কখনো বা মূল্যায়নশীল, তখন তিনি সমালোচক, কিন্তু যে-মুহূর্তে তিনি কবি সে-মুহূর্তে তিনি আর সমালোচক নন, আবার মূল্যায়নকালে তিনি কবি নন।

যত সুস্পষ্ট ভাষায় আমি এ-ব্যবধান বর্ণনা করলাম, বস্তুত কবি-সমালোচকের চরিত্রে ততটা সুস্পষ্টতা নেই। একদা জগতে সমালোচকের সংখ্যা কম ছিল, অন্তত বাক্যপরায়ণ সমালোচকের। (নীরব সমালোচক হয়তো, এক হিসেবে, অনেকেই ছিলেন, যেমন কার্লাইলের মতে প্রায় সব কর্মীই নীরব কবি!) তখনকার দিনে তারিফ যত হ'ত, ছিদ্রান্বেষণ কম হ'ত সে-তুলনায়। সমালোচনার সঙ্গে তখন সৃষ্টিকর্মের সম্পর্ক খুবই সৌজন্যময় ছিল। কবিগণ রাজারাজড়ার সভায় অথবা মুরুব্বির বৈঠকখানায় রচনা আবৃত্তি করতেন, স্তুতি প্রশস্তির রেওয়াজ ছিল সর্বত্র, খুঁতখুঁতে মন্তব্যের ভয় ছিল না, সুতরাং কবি লিখেই যেতেন কল্পনার আবেগে, সমালোচনার প্রতিফলনে নিজ কবিকর্ম যাচাই করার প্রয়োজন ছিল না। আধুনিক আত্মজিজ্ঞাসায় সে কালের কবিকর্ম কণ্টকিত হয়নি। কিন্তু এককালে অর্থাৎ রেনেসাঁস-পরবর্তী কালে মানুষের আত্মচেতনা বেড়ে ওঠার ফলে শিল্পীমাত্রেই শিল্পকর্ম বিষয়ে অতীব সচেতন হ'য়েছেন। আর আধুনিক আত্মচেতনা আসলে ব্যবচ্ছেদপরায়ণ, বিশ্লেষণাত্মক। অতএব একালের কবিগণ, এমনকি যাঁরা প্রধানত অরোধ্য ভাবাবেগে লেখেন তাঁরাও, নিজ

শিল্পসম্বন্ধে নিয়ত বিচারশীল, নিজ অন্তরের দিকে তাঁরা নিয়ত বিশ্লেষণের আলোকসম্পাত করেন।

এই তীব্র আত্মচেতনার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে রবীন্দ্রনাথে। "রবীন্দ্র-রচনাবলী"র চতুর্থ খণ্ডে কবির লেখা খানিকটা আত্মপরিচয় দেওয়া আছে। কবি বলছেন: 'আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই,—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।' এই পশ্চাৎ দৃষ্টির ফলে কবি বুঝেছেন যে তাঁর খণ্ড কবিতাগুলি একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ, তা'রা নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ বটে, মুহূর্তের মাধুরীতে ভরাট, আবার তা'রা এক বৃহৎ মহৎ ভূমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। নিজ সাহিত্যিক অভিব্যক্তির যে-মূল ছন্দটি রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন তা'র অধিকতর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা কোনো ভবিষ্যৎ সমালোচক করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। যাঁর কাব্যরচনা স্বচ্ছন্দগতি, উপলব্যথিত কোনো শৈল্পিক আত্মসংশয়ের আভাস যাঁর অনায়াস কাব্যে অনুপস্থিত, তিনি আবার গভীরতম মূল্যায়নের শ্রেষ্ঠ অধিকারী। এমন বলতে পারিনা যে প্রাচীন কালের সাহিত্যিকদের আত্মোপলব্ধি ছিল না কিন্তু কালিদাস-দান্তে-শেক্‌স্‌পিয়রে আধুনিক লেখকের সূচ্যগ্র নিয়ত-শাণিত আত্মব্যবচ্ছেদের প্রমাণ পাই না। পক্ষান্তরে, আধুনিক লেখক নিজেই নিজের চূড়ান্ত সমালোচক হ'য়ে পড়েন, যেমন বার্ণার্ড শ', আঁদ্রে জিদ্।

কিন্তু আমি আরো গভীরতর অর্থে কবি ও সমালোচকের সম্পর্ক দেখতে পাই, যে-অর্থে লাটিন কবি হোরেস্ বলেছিলেন, 'যে-কবি শিল্পসম্বন্ধে বিবেকবান, তিনি সততার সঙ্গে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হবেন।' ইদানীং সর্বত্র যে সাহিত্যিকের integrity-র কথা উল্লিখিত, সে-সততা আত্মবিচারের, শিল্পসাধনার সততা। সেকালে শিল্প সাধনায় বহির্জগৎ বা অন্তর্জগৎ থেকে তেমন কোনো বাধা পেতেন না কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যজীবনে ও ব্যবহারিক জীবনে অন্তত মোটামুটি সঙ্গতি থাকত, তাঁর শিল্পবিচার সৎ হ'তে পারত, কিন্তু এ-যুগের সভ্যতার সংকটে শিল্পীর আত্মবিচার অসংখ্য প্রশ্নবিদীর্ণ। নিরন্তর আত্মবিচার ছাড়া আজ কোনো কবিকর্মই সমাপ্ত হয় না। এমন বিশ্বাস

করা সম্ভব নয় যে স্বর্গ থেকে যেমন সাতনরী মালাগাছি নেমে আসত ব'লে রূপকথায় শোনা গেছে তেমনধারা কোনো মহৎ কবিতা একেবারে সর্বাঙ্গীণ অনবদ্যতা নিয়ে অকস্মাৎ শিল্পীচিত্তে মানসরূপ গ্রহণ করে ও তার পরে কথায় বা রংয়ে বা সুরে শিল্পরূপ ধারণ করে। A sonnet is a moment's monument—(মুহূর্তের মনুমেণ্ট একটি সনেট।) মনুমেণ্ট হ'তে পারে (অনেক সনেটই সার্থকতার তুঙ্গ শিখরাসীন) কিন্তু মুহূর্তের নয় কেননা হোক না সনেটের অবয়ব সংকীর্ণ, তবুও তার শিল্পকৃতি আকস্মিক নয়, এক মুহূর্তে তা' গড়ে' ওঠেনি, পরন্তু হয়তো অগণিত মুহূর্তের এমনকি অগণিত বৎসরের তিল তিল বেদনার ও ভাবনার আশ্চর্য নির্যাস সে-সনেটটি, দীর্ঘকালের কামনা ও প্রয়াস হয়তো উদ্‌ভাসিত হয়েছে একটি সংহতক্ষণ ভাবনায়। পাঠক দেখছেন স্বল্পাবয়ব স্বল্পবাক্ একটি কবিতা। পাঠক অনুমান করলেন এহেন ক্ষুদ্র কবিতা হয়তো সহসা উৎপন্ন হ'য়েছে। কিন্তু যেমন মানবশিশু অকস্মাৎ জন্মগ্রহণ করে না, জননীর জঠরে মাসের পর মাস অঙ্গসৌষ্ঠব ও প্রাণ অর্জন করে, যেমন বৃক্ষপ্রাণ দীর্ঘকাল নিহিত থাকে ভূমিতলে বীজগর্ভে, তেমনি শিল্পভাবনা তা'র চরম রূপ গ্রহণের পূর্বে কিছুকাল (কতকাল, তা'র কোনো নিশ্চিত সীমানা নেই) শিল্পীচিত্তে ভেসে বেড়ায় নীহারিকাপুঞ্জের মতো। কিন্তু বেড়ে-উঠতে-থাকা মানবপ্রাণ বা বৃক্ষপ্রাণ বেড়ে চলতেই থাকে, তিলেকের জন্যও তার ক্ষান্তি নেই, তিলেকক্ষান্তিতেও তা'র মৃত্যু, পক্ষান্তরে বেড়ে-উঠতে-থাকা শিল্প শিল্পীর ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে ক্ষান্ত হ'তে পারে। কবি যখন কবিতা-রচনায় নিযুক্ত, তাঁর যে-অবস্থায় 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ', যখন চিন্তা ও অনুভূতির নীহারিকাকে অন্তর থেকে নিষ্কাশিত ক'রে ভাষায় রূপায়িত করার চেষ্টায় তিনি একাগ্রচিত্ত, সেই উন্মন্থন কালে বারংবার সৃজনচক্র থেমে যেতে পারে, কবি তাঁর সৃষ্টিকার্য থামিয়ে দর্শক-সমালোচকে পরিণত হ'তে পারেন, আপনার বিচারবুদ্ধিতে ও মূল্যায়ন-শক্তিতে শিল্পকর্মটিকে (সেই মুহূর্ত অবধি যতটুকু সৃষ্টি হ'য়েছে) যাচাই ও পরিমার্জনা ক'রে নিয়ে আবার অগ্রসর হ'তে পারেন সৃষ্টিকার্যে। বস্তুত সমগ্র সৃজনকর্মটি যেন দুই প্রক্রিয়ার টানাপোড়েন। গতি ও ক্ষান্তি, রচনা ও সম্মার্জনা, আবেগ ও বিচার, সৃষ্টি ও মূল্যায়ন—এই দুই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাযুজ্যে এক আশ্চর্য ছন্দে সমগ্র সৃষ্টিকাল লীলায়িত হ'য়ে থাকে। যিনি

গাইয়ে তিনি সুর ভাঁজেন অনেকক্ষণ, একই কলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত ভাবে না গুণগুণ করেন যতক্ষণ অবধি না তাঁর শিল্পাদর্শের সঙ্গত রূপ ধরা পড়েছে তাঁর কণ্ঠে। তিনি সৃজনরত একমুহূর্তে, পরমুহূর্তেই সৃষ্টি থামিয়ে মূল্যায়নে, বিচারে প্রবৃত্ত। বিচার থেকেই সরাসরি আবার পরক্ষণেই তিনি চ'লে যান সৃষ্টিতে। ছবি-আঁকিয়ে কতবার আঁকা থামিয়ে চিত্রপট থেকে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন—সে-দৃষ্টির সময় তিনি সৃজনরত নন, তিনি মূল্যায়ন-কারী, সমালোচক। কবি কতবার না রচনায় ক্ষান্ত হ'য়ে অসম্পূর্ণ রচনাটির বিচার করেন! এহেন আত্মবিচারে যে সব শিল্পীই একই পরিমাণ সময়ক্ষেপণ করেন এমন নয়, কেউবা অধীর আবেগে কেউবা প্রশিক্ষিত শিল্পশক্তিতে রচনা সমাপ্ত করেন ক্লান্তিহীন গতিতে, কিন্তু সব শিল্পীর পক্ষেই আত্মবিচারী সমালোচনাশক্তি শিল্পসৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ।

অতএব সমালোচনাশক্তি তুচ্ছ নয়, এ-শক্তি (এতক্ষণ যে যুক্তি পেশ করেছি তার হিসেবে) সৃজনশক্তির সঙ্গে নিকট-সম্পৃক্ত। এই অর্থেই এলিয়ট বলেছেন, Every creator is also a critic—সব সৃজকই সমালোচক) আর জনৈক অধ্যাপক (ম্যাকেইল্) বলেছেন, The critical faculty is akin to the creative faculty of the artist—(সমালোচনা শক্তি সৃজন শক্তির সমগোত্র)।

সৃজন-সম্পৃক্ত এই যে-মূল্যায়নশক্তির বর্ণনা করলাম এ-ছাড়া অন্য অর্থেই সমালোচনার সচরাচরিক অভিধা। সে-অর্থে সমালোচনা সৃষ্টির অচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, সৃষ্টিকর্মের বাহিরে। এহেন অনাত্মবিচারী সমালোচনায় দু' ধরনের সাহিত্যিক প্রবৃত্ত হ'তে পারেন: (১) যিনি স্বয়ং কবিতা লেখেন আবার অন্যের লেখারও মূল্যায়ন করেন, (২) যিনি স্বয়ং সৃষ্টিধর্মী লেখক নন, শুধু অন্যের লেখার মূল্যায়নে নিবিষ্ট। সাধারণত এঁদেরই আমরা বলি সমালোচক। সমালোচকেরা কোনো কোনো সৃজকের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন, ইয়েট্স্-এর কবিতা ও তদনুযায়ী জীবনানন্দর কবিতা স্মর্তব্য। কিন্তু আমি চিন্তার যে-স্তরে সমালোচনাশক্তির আলোচনা করছি সেখানে ক্ষমতার বিকৃতি নয়, সুকৃতিই আলোচ্য। কবি বলতে যদি সৎ কবি বুঝি, কবি-নামধেয় পদ্য-লিখিয়েকে না বুঝি, তা'হলে সমালোচক বলতে সৎ

সমালোচকই বুঝব, ছিদ্রান্বেষী অসূয়াপর অসংবেদী লেখককে বুঝব না। এককালে অবশ্য গ্রীক ও লাটিন শব্দের মানে দাঁড়িয়েছিল ত্রুটি নির্ণয়কারী, সে মানের রেশ এখনো বর্তমান। কিন্তু যেমন কামপ্রবৃত্তিকে আমরা রূপায়িত করেছি প্রেমে, তেমনি ছিদ্রান্বেষণ থেকে আমরা উন্নীত হয়েছি মূল্যায়নী সমালোচনায়।

এখন প্রশ্ন, উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকের মধ্যে কি একে অন্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট ? এ-বিষয়ে কতকগুলি মতামত এ-প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হ'য়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে কবিতা লেখায় নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকলে সমালোচক সে-অভিজ্ঞতার উপরে আপন সমালোচনা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, অতএব তাঁর সমালোচনা অতীব গ্রাহ্য। যিনি সৃষ্টিকার্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি, তিনি কী ক'রে সে-কার্য সম্বন্ধে মতামতের অধিকারী ?—কিন্তু এ-যুক্তিতে মস্ত ফাঁক র'য়ে গেছে। যাবতীয় জ্ঞান, সকল অনুভূতি ও চিন্তা কি কেবল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্ভর ? যে-বস্তু আমার ইন্দ্রিয়ের আওতায় আসেনি, যে-জিনিষ আমি দেখিনি শুনিনি ছুঁইনি, যে-কাজ আমি নিজে করিনি, সে-বিষয়ে কি আমার অজ্ঞতা স্বতঃসিদ্ধ ? যদি নিজস্ব অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস ব'লে মানি তাহ'লে মানতে হবে যে উপন্যাসের (তথা কাব্যের, নাটকের) একমাত্র অধিকারী সমালোচক সে-ব্যক্তি যিনি নিজে উপন্যাস লিখেছেন, অন্যেরা সবাই ফালতু। কিন্তু এ-মেনে রেহাই নেই। তর্কের অপ্রতিরোধ্য যুক্তিতে আরো মানতে হবে যে যিনি নয়খানা উপন্যাস লিখেছেন তাঁর চেয়ে যোগ্যতর উপন্যাস-আলোচক যিনি দশখানা লিখেছেন ! উপরন্তু, এ-ব্যক্তি কেবল উপন্যাস-আলোচনারই অধিকারী, কাব্যের নন, নাটকের নন ! এমন কি এ-ও বলা যায় যে যিনি উপন্যাসটি রচনা করেছেন, একমাত্র তিনিই সে-উপন্যাসের সমালোচনা করতে পারেন, অর্থাৎ যে-কোনো রচনার রচয়িতা স্বয়ং সে-রচনার একমেবাদ্বিতীয়ম্ সমালোচক।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তর্কের সোপান-পরম্পরায় অগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পেঁছচ্ছি কেননা সোপানের প্রথম ধাপটি-ই অগ্রাহ্য। এই তর্ক-প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্নও ওঠে, সে-প্রশ্ন কোল্‌রিজ্‌ তুলেছিলেন। যদি ধরা যায় যে কবি-সমালোচকের দাবী অগ্রগণ্য, তা'হলে কি মানতে হবে যে প্রথম শ্রেণীর কবি হবেন প্রথম

শ্রেণীর সমালোচক, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচক ইত্যাদি? কোল্‌রিজ্‌ জানতে চেয়েছিলেন মন্দ কবি যদি সমালোচনার ক্ষেত্রে নামেন তা'হলে সমালোচনার কী অবস্থা হবে? ডক্টর জন্‌সন্‌ পোপ্‌-এর চেয়ে অবশ্যই নিকৃষ্ট কবি ছিলেন, কিন্তু সে জন্যেই কি সিদ্ধান্ত করব যে সমালোচক হিসেবেও নিকৃষ্ট ছিলেন? রস্‌কিন্‌ ও এডমণ্ড গস্‌ অল্পবিস্তর কবিতা লিখতেন, অলডাস্‌ হক্‌স্‌লিও লিখেছেন, ম্লানপ্রভ এঁদের কবিতা—রস্‌কিন্‌কে তো অনায়াসেই বলা যায় মন্দ কবি—কিন্তু এঁদের কবিতার দরুন কি এঁদের সমালোচনাও নস্যাৎ করব?

জ্ঞান একান্তই প্রত্যক্ষ নির্ভর, প্রত্যক্ষের বাহিরে কোনো জ্ঞান নেই, এমন ধারণা না যুক্তিসহ না প্রত্যক্ষেই টেঁকসই। অতএব সমালোচনার ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষের আত্যন্তিক মূল্য গ্রাহ্য নয়। আসলকথা, কাব্যের তথা শিল্পের এলাকায় প্রামাণ্য মানদণ্ড কল্পনাশক্তি—যে শক্তিকে জিনিয়স্‌, ইন্‌ভেন্‌শ্‌ন্‌, ক্রিয়েটিভ্‌ ফ্যাকাল্‌টি ইত্যাদি বলা হয়েছে ইংরেজি ভাষায়, বাংলায় আমরা বলছি কবিত্ব, প্রতিভা, সৃজনীশক্তি, অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া ইত্যাদি। সেই শিল্পপ্রাণ অসম্পৃক্ত নয় প্রত্যক্ষের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, কিন্তু অচিরেই প্রত্যক্ষের সীমানা ছাড়িয়ে সে-শক্তি নিজের উজ্জ্বল এখতিয়ার স্থাপন করে। একটা বিশেষ কল্পনা শক্তির অধিকারী ব'লেই কবি কবি, আরেক বিশেষ কল্পনাশক্তির অধিকারী বলেই সমালোচক সমালোচক। এমন হওয়া সম্ভব (কিন্তু আবশ্যিক নয়) যে একই আধারে দু'রকম কল্পনাশক্তিরই সমাবেশ হ'য়েছে (কোল্‌রিজে, এলিয়টে, রবীন্দ্রনাথে) কিন্তু একথা বলা চলেনা যে সে-সমাবেশের দরুন কবিত্বশক্তি হ'য়েছে মহত্তর অথবা সমালোচনাশক্তি হ'য়েছে বিচক্ষণতর। (বলা দরকার যে সৃজনশীল কবির পক্ষে আত্মবিচারী যে-মূল্যায়ন অমূল্য সম্পদ, যে কথা এই অনুচ্ছেদের গোড়ায় বলেছি, তার কথা আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়, এখন অন্য ধরনের মূল্যায়ন সম্বন্ধে চিন্তা করছি।)

যদি বলা হয় কবির বিশেষ কল্পনাশক্তি ও সমালোচকের বিশেষ কল্পনা-শক্তি, এ-দুয়ে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য, এক রকম কল্পনাশক্তিতে শিল্পসত্তা প্রাণ পায়, আরেক শক্তিতে পায় না। কবির বোধি ও সমালোচকের বোধিতে বহিরঙ্গ প্রভেদ নেই, প্রভেদ প্রাণসঞ্চারক্ষমতায়। সে-ক্ষমতার বর্ণনা দেবে কে?

অবাঙমনসোগোচর সে-আশ্চর্য ক্ষমতায় মানুষ পরমশিল্পীর নিকটতম হয়, সমালোচক দূর থেকে কবির লোকোত্তর প্রতিভায় মুগ্ধ। মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতায় তাঁর কল্পনাশক্তির প্রমাণ, কিন্তু তাঁর কল্পনাশক্তি নিচু স্তরের কেননা তার জীবনীশক্তি নেই, তিনি বুঝতে পারেন গড়তে পারেন না। প্রত্যেক সৎ সাহিত্যপ্রেমীর পক্ষে সৃজক ও সমালোচকের মধ্যে তারতম্য করা দরকার। শুধু যে দুজনের রচনারূপ ভিন্ন তা' নয়, একে অপরের পরগাছা তা-ই নয়, একের ধর্মে বিচার বিশ্লেষণ যুক্তি তর্ক প্রবল অথচ অপরের ধর্মে সংশ্লেষণ আবেগ ও প্রকাশের আনন্দ, তা-ই নয়, আসলে দু'জনের কল্পনাশক্তি চরম কোনো সীমানায় পৌঁছে পৃথকপন্থী। সমালোচকের কাজ মূলত অবশ্যই বিশ্লেষণী কাজ। পক্ষান্তরে শিল্পীর চিৎপ্রবাহে উন্মথিত হ'য়ে কোনো বিমূর্ত অনুভূতি, রূপাতীত বোধি ক্রমশঃ মূর্তি পরিগ্রহ করে, যা' ছিল বহু, যা' ছিল বিক্ষিপ্ত, শিল্পসত্তায় তারই সংশ্লেষিত নিটোল রূপ, আর সেই সংহত ঐক্যের বিশ্লেষণই সমালোচকের কাজ। শিল্পসত্তাকে তিনি ভাঙেন, অখণ্ডকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তার খণ্ডিত রূপের ভাষ্যরচনা করেন। কিন্তু কোনো সৎ সমালোচকের পক্ষেই এই খণ্ডন বিশ্লেষণ বিকিরণ-পদ্ধতি শেষ কথা নয়। সে পদ্ধতি ভাষ্যকারের, বৈয়াকরণের, কিন্তু সমালোচকের নয় কেননা সমালোচক এর পরেই পুনরায় ঐক্যের পথে এগিয়ে যান। From irtegration to disintegration, from disintegrtion to re-integration—ভেঙেছিলেন যে-অখণ্ড সত্তাকে, আবার তার অখণ্ড রূপেরই ধ্যান করেন আর তখনই সম্যক বুঝতে পারেন কত মূল্যবান কবির সংশ্লেষণী শক্তি, যে-শক্তিতে বিমূর্ত অনুভূতি মূর্তি পরিগ্রহ তো করেইছে, উপরন্তু সে-মূর্তি প্রাণবন্তুতায় লীলাচঞ্চল।

সৎ সমালোচকের প্রধান গুণ একটি বিশেষ ধরনের হৃদয়বত্তা, যাকে আলঙ্কারিকেরা বলেছেন সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদনা। ইওরোপের আঠারো শতকে Sensibility কথাটি চালু ছিল, এ-শতকেও খুব চলেছে, সংবেদনা কথাটি খানিকটা এ-কথারই প্রতিশব্দ কিন্তু অধিকতর ঐশ্বর্যবান এর সম্পূর্ণ অভিধা। ভারতীয় ঐতিহ্যে 'সহৃদয়' শব্দটি যে-অর্থে সাহিত্যালোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে, সে-অর্থেই আমিও এখানে প্রয়োগ করছি। সুরসিক, সহৃদয় অর্থাৎ সৎ-সমালোচক হওয়া মানে কেবল সহজাত শক্তির অধিকারী হওয়া নয়, যদিও সে-কথাও সত্য, কেননা হোরেস্-এর মত যদি গ্রাহ্য হয় যে কবিরা

জন্মান, গড়ে' পিটে' কবি হয় না, তাহ'লে সমালোচকও জন্মান, তবে তাঁকে গড়ে' পিটে' সমালোচক হ'তেই হয়। সহজাত শক্তির সঙ্গে বৈদগ্ধ্য আবশ্যক। সহৃদয় কে? যিনি কবির সৃজনশীল চিত্তাবস্থা প্রণিধান করতে পারেন, অর্থাৎ কবিকর্মে যে-চিৎস্বভাবসম্বিৎ প্রভাববান, যে-ধ্যানী অবস্থায় কবি-ব্যাপার সম্পন্ন, সে-সম্বিৎ, সে ধ্যান সমালোচকেও বর্তেছে। অভিনব গুপ্ত বলেছেন যে কাব্যরসিককে অবশ্য কবিকর্মের আঁটঘাট জানতে হবে; আঙ্গিকজ্ঞান তাঁর পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজন, কিন্তু তাঁর আরো বড় গুণ থাকা দরকার—তন্ময়ীভবনযোগ্যতা। যে-গুণ কীটস্ লক্ষ্য করেছিলেন কবিচরিত্রে: The poetical character ..is a thing *per se* and stands alone, it is not itself—it has no self—It is everything and nothing—(কবিচরিত্র অনন্য, তা'র তুলনা সে নিজে, তার নিজস্বতা নেই, স্বতন্ত্রসত্তা নেই, সে সব কিছু আবার কিছু নয়ও), সে-গুণ সমালোচকেরও বৈশিষ্ট্য। সহৃদয় সমালোচক প্রতি কাব্যের চিৎস্বভাবসম্বিতের সঙ্গে আপনাকে পুরোপুরি মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পারেন, সে-মুহূর্তে তাঁর ব্যবহারিক সত্তার লয়। এই আশ্চর্য সংবেদনা না থাকলে সমালোচক হওয়া যায় না, আর এই অর্থে প্রত্যেক কাব্যানুভূতির কালে সমালোচকের আপন সম্বিতে সৃজকের সম্বিৎ পুনর্ভব হ'য়ে যায়, তখন সমালোচক ও কবি একাত্ম, সে-মুহূর্তে সমালোচকও কবি। সৎ সমালোচকের চরিত্রে (আমি ব্যবহারিক চরিত্রের কথা বলছি না) ঔদার্য চমৎকার, তাঁর সংস্কৃতিবান তন্ময়ীভবনযোগ্য চিত্তে কত শত কাব্যের বেদনা অনুরণিত হয়, কত পরস্পরবিচ্ছিন্ন, কত পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞা ও অনুভূতি তাঁর সর্বগ্রাহী প্রশস্ত রুচিতে অনুমোদিত হয়। বিভিন্ন কবির বিভিন্ন কাব্যকে পুনর্ভব করার অসাধারণ শক্তির মালিক সমালোচক।

পূর্বে বলেছি সমালোচকের কাজ পরগাছার কাজ। সে-কথা সত্য কেননা কবিকর্মেই সমালোচনাকর্মের উপলক্ষ, তাছাড়া কবির জগতেই তিনি তন্ময়ীভূত হন। কিন্তু সমালোচকেরও নিজস্ব সৃজনক্ষেত্র আছে। সৎ সমালোচকের প্রশস্ত ও প্রশিক্ষিত সংবেদনায় কাব্যবস্তু নিত্যনব রূপ পরিগ্রহণ করে। তিনি যখন কবিতা পাঠ করেন, সে-পাঠ কেবল ঋণাত্মক থাকে না, যতটুকু তিনি পেয়েছেন কবিতা থেকে সেটুকুকে 'আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে' বাড়িয়ে তোলেন। বহিরঙ্গে কবির কবিতা এক স্থগিতগতি রূপ, কিন্তু

সহৃদয় সমালোচকের মনোমুকুরে সে-কবিতা দিনের পরে দিন নূতন রূপে উদ্‌ভাসিত হয়। যেখানে কবি দিয়েছিলেন একটিমাত্র কবিতা, সমালোচক সেখানে আবিষ্কার করেন নিত্য নবোন্মেষশালিনী infinite variety, ক্লিওপাট্রার অমলিন অসংখ্য রূপ। নিজের পরাশ্রিত সীমিতসাধ্য ক্ষেত্রে সমালোচকও কবি।

বাংলা সমালোচনায় স্বকীয়তা

বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনা এখনো প্রাচুর্য-লাঞ্ছিত অথবা প্রবীণতা-মন্থর হয়নি, মহৎ মণীষার বাহক হয়নি, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র এই সাহিত্য-সরণির পথিকৃৎ এবং রবীন্দ্রনাথ মুষ্টিমেয় বাংলা সমালোচকগোষ্ঠীর মধ্যমণি। মাত্র শতবর্ষবয়স্ক অর্বাচীন বাংলা সমালোচনা আরো অগ্রসর হওয়ার পূর্বে সংশয় জাগে এ-সমালোচনার কোনো চারিত্রিক স্বকীয়তা, সহজেই চেনা যায় এমন কোনো অনন্যতা, প্রস্ফুট হয়েছে কিনা। এমন বলা কি সম্ভব যে অমুক অমুক লক্ষণে বাংলা সমালোচনার বৈশিষ্ট্য, অমুক দৃষ্টিভঙ্গী অথবা মূল্যমান অথবা মূল্যায়ন-প্রণালী বাঙালী সমালোচকের একান্তই নিজস্ব? ভারতীয় অন্য কোনো ভাষাতেই ঐশ্বর্যবান সমালোচনা আছে বলে' জানি না। (বস্তুত, নানা ঐতিহাসিক কারণে বাংলা ভাষাতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সমালোচনার শুরু হওয়ার বেশ কিছুকাল পরেই অন্যান্য ভাষায় সমালোচনার আবির্ভাব হয়েছিল।) কিন্তু ইওরোপের প্রাগ্রসর সাহিত্যগুলির সমালোচনা-শাখায় (আমি বিশেষ করে' ফরাসী, জার্মান, রুশ, ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস স্মরণ কবছি) যে স্বকীয়তা বিদ্যমান, কোনো কোনো বিষয়ে যে-অননুকৃত স্বাধীন মূল্যজ্ঞান ও বিচারপ্রণালী কার্যকরী, বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায়ও তত্তুল্য, এমনকি ক্ষীণভাবেও তুলনীয়, কুললক্ষণ আমাদের দর্শনসাধ্য কি? স্থানে অস্থানে বাঙালী আপন ভাষাকৌলীন্যের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে' থাকেন, সে-মাহাত্ম্য কি কিছু মুষ্টিমেয় মেধাবী ও মৌলিক সমালোচনা ছাড়া সমগ্র বাংলা সমালোচনায়ও প্রযোজ্য? বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল এলাকাগুলিতে স্বকীয়তা নিঃসংশয়। লিরিক, কাহিনীকাব্য ও দৃশ্যকাব্য প্রভৃতি কাব্যবর্গে বাঙালীর কৃতিত্ব সুস্পষ্ট ও জাতিচরিত্রানুকারী। (শব্দটি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ধার-করা।) প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে, ১২৮০ সালের "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত এক গ্রন্থ-সমীক্ষায়, বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা করেছিলেন বাংলা গীতিকাব্যের ধারা কোথা থেকে কোথায় প্রবাহিত হয়েছে, সে-কাব্যের জাতীয় চরিত্র সন্ধানসাধ্য কিনা। এর মানে বাংলা গীতিকাব্যের ঐতিহ্য ও জাতিচরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্যগোচর হয়েছিল। গীতিকাব্যের তুলনায় অর্বাচীন অন্য কয়টি সাহিত্যগোত্রেও—যেমন গদ্যে-রচিত গল্পে ও

উপন্যাসে—অল্পবিস্তর স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শুধু সাহিত্যগোত্রেই নয়, প্রেম নিসর্গ সমাজবোধ প্রমুখ প্রধান সাহিত্যিক কল্পবস্তুগুলির (literary themes) ব্যবহারেও অথবা উচ্ছ্বাস বিষাদ কৌতুক প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির শৈল্পিক রূপায়ণেও বাংলা সাহিত্যের স্বকীয়তা সংশয়াতীত। এসব (এবং আরো কয়েকটি) কল্পবস্তু ও চিত্তবৃত্তি অবশ্য যাবতীয় সাহিত্যেরই সম্পত্তি। এমন কোনো সাহিত্য অস্তিত্ববান বলে' জানা নেই যাতে কৌতুক বা প্রেম (বিরহ বা মিলন বা সম্পূর্ণ ব্যর্থতা, যে-রীতিতেই সে-প্রেম আধৃত হোক না কেন) কাব্যের কল্পবস্তু হয়নি অথবা কাব্যে সুরসঞ্চার করেনি। (শুধু প্রেম বা কৌতুকেরই উল্লেখ করলাম, সর্বশৈল্পিক কল্পবস্তু বা চিত্তবৃত্তির তালিকা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।) বাংলায় প্রেমের কাব্য বা নিসর্গকাব্য এক বিচারে যে কোনো ভাষায় প্রেমকাব্যের অথবা নিসর্গকাব্যের সগোত্র কেননা প্রেম এবং নিসর্গপ্রীতি সর্বমানবিক হৃদয়বৃত্তি, সর্বশিল্পসম্মত কল্পবস্তু, কিন্তু অপরপক্ষে বাংলা কাব্যের প্রেমে ও নিসর্গপ্রীতিতে এমন কিছু সূক্ষ্মতা, এমন কোনো বর্ণচ্ছটা বিদ্যমান যা অপর ভাষায় পাওয়া যাবে না। এই একই বিচারে বাঙালীর কৌতুকবোধ সর্বমানবিক কৌতুকবোধের শামিল বটে, তবুও সূক্ষ্মতার বিচারে সে-কৌতুকবোধে একান্ত বঙ্গীয়তাও ভাগীদার, অতএব বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৌতুকে বঙ্গচিত্তসুলভ স্বকীয়তার স্বাক্ষর।

বাংলা সমালোচনায় স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার পথে কয়েকটি বিঘ্ন ঘটেছে। এ-সমালোচনা এখনো শতায়ু নয়। দ্বিতীয়ত এ-সমালোচনা নেহাৎই ইওরোপীয় সাহিত্যের (বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের) অভিঘাতের সাক্ষাৎ ফল। এ-প্রসঙ্গে জনৈক পূর্ণচন্দ্র বসুর কয়েকটি কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত "সমালোচনা-সাহিত্য-পরিচয়" নামক সঙ্কলনগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হতে পারে :

'আর্যসাহিত্যে আরও এক বিলাতী সামগ্রীর অভাব দৃষ্ট হয়। সে সামগ্রী সমালোচন-সাহিত্য। ইউরোপীয় সাহিত্যে সমালোচনা-সাহিত্য প্রচুর।... এরূপ সমালোচন-সাহিত্য সংস্কৃতে দেখা যায় না। ব্যাস, বাল্মীকির গুণকীর্তন লইয়া আর্যসাহিত্যে সমালোচন-গ্রন্থ কই? কালিদাসাদির সমালোচন-গ্রন্থ কোথায়? সে সাহিত্য-মধ্যে রীতিমত সমালোচনার স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই; আছে কেবল অলংকারশাস্ত্র-মধ্যে দোষগুণের পরিচ্ছেদে দৃষ্টান্তের

উল্লেখ। আর আছে টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণের পুস্তকারম্ভে সামান্য ভূমিকা। ভাষ্যকে ঠিক সমালোচনা বলা যায় না···এই যৎসামান্য সমালোচনা ছাড়িয়া দিলে কি বলিতে পারা যায় না যে আর্যসাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের মত সমালোচনা-সাহিত্যের সম্পূর্ণ অভাব ?'

এই লেখক সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গেরও আলোচনা করেছেন—আর্যসাহিত্যে সমালোচনা নেই কেন ?

'প্রাচীন ভারতে যখন অহিন্দু সংস্কার সকল আর্যগণের মনে প্রবিষ্ট হয় নাই ; যখন সকলেই হিন্দু রীতিনীতি, হিন্দু আচার-ব্যবহার বিলক্ষণ বুঝিতেন, যখন তদ্বিষয়ে কোনো কুসংস্কার মনে উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তখন আর্যসাহিত্যের সমালোচনার তত প্রয়োজন হয় নাই। সকলেই গ্রন্থের অধ্যয়ন ফল ও সামাজিক ফল ধরিয়া বিচার করিতে সক্ষম ছিলেন এবং সেই বিচারে সুকবিগণকে চিনিয়া লইতে পারিতেন। তাহা অবধারিত হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই, এক্ষণে ইংরেজি বিদ্যা আমাদিগকে বিভিন্ন অবস্থায় নিপতিত করিয়াছে। সেই অবস্থায় আমাদের সাহিত্যের সমালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে সে কার্যে কোন্ কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে ? সেই কর্ণধার আর্য সমালোচক। · আর্যদিগের গ্রন্থরচনায় একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ;—সেই উদ্দেশ্য ফলশ্রুতি বা অধ্যয়নফল।··· যদি গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য ফল উৎপন্ন হয়, তবেই গ্রন্থরচনায় সাফল্যলাভ হইয়াছে, নতুবা নহে।···গ্রন্থ অধ্যয়ন বা শ্রবণের সমষ্টি-ফল যাহা তাহাই গ্রন্থের সম্যক সমালোচনা। তদ্দ্বারা গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার স্বতই সম্পন্ন হইয়া যায় এবং জানা যায়—'যাহার ফলশ্রুতি বা অধ্যয়নফল ভাল, তাহাই ভাল গ্রন্থ ; যাহার অধ্যয়নফল মন্দ, তাহা মন্দ গ্রন্থ ; এবং যাহার অধ্যয়নফল কিছুই নাই, তাহা গ্রন্থই নহে।' রস সর্ববিধ গ্রন্থেরই আছে। সেই রসের পরিপুষ্টি সাধন হইলেই ফলশ্রুতি ঘটে। সমালোচনার এই মূল নীতি ইউরোপীয় সাহিত্য-সমাজে প্রচারিত না থাকাতে সে সমাজের সাহিত্য-সমালোচনাও সুনিয়মিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্যই সে সমাজে সমালোচনার এত ধূমধাম ও বাড়াবাড়ি। কিন্তু এই সহজ নীতি আর্যসমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া সংস্কৃত আর্যসাহিত্যে আর স্বতন্ত্রাকারে সমালোচন-সাহিত্যের আবশ্যকতা হয় নাই।'

গ্রন্থ-মূল্যায়নে ফলশ্রুতির প্রয়োজন সম্বন্ধে ধারণা এই লেখক পেয়েছেন শ্রীজীব গোস্বামীর একটি শ্লোকে :

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥

শ্রীজীব গোস্বামী 'ফলম্'-এর উল্লেখ করেছেন কিন্তু এমন কথা বলেন নি যে সেই ফলটি বিচারাতীত। গ্রন্থপাঠে বা পাঠশ্রবণে কোন্ ধরনের ফল জন্মালো, কোন্ প্রণালীতে, কোন্ গুণসমন্বিত ফল জন্মালো, সে কথার বিচারই সমালোচনা। উপরে উদ্ধৃত প্রবন্ধে পূর্ণচন্দ্র বসু ফলশ্রুতি = সমালোচনা, এই সমীকরণের আশ্রয় নিয়ে যতটা নিশ্চিন্ত আত্মপ্রসাদের পরিচয় দিয়েছেন ততটা সদ্বিচার করেন নি আলোচ্য বিষয়ের প্রতি অথবা গোস্বামী প্রভুর প্রতি। সে কথা ছেড়ে দিয়েও মানব যে ভারতীয় সাহিত্যে ইওরোপীয় অর্থে সমালোচনার অভাব বিষয়ে তাঁর ধারণা অভিনব বটে যদিও অহিন্দু সংস্কার ও হিন্দু রীতিনীতি সম্বন্ধীয় নির্বিধ উক্তিটিতে ইতিহাস-সম্মতি কিছু দেখছি না। আমার বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখকের বড় কথা হচ্ছে যে বাংলায় সমালোচনার উদ্ভব ইংরেজি প্রভাবের পরিণামে। দ্বিতীয় কথা, বাংলা সমালোচনার মূলনীতি আর্যসাহিত্যের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গঠিত হওয়া উচিত।

বাংলা সমালোচনার উপক্রম-যুগে সমালোচনা সম্বন্ধে আরো কিছু চিন্তা উল্লেখযোগ্য। ১৩১৫ সালের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় শরচ্চন্দ্র চৌধুরী রচিত 'সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি সুপ্রাসঙ্গিক কথা আছে :

'প্রাচীন কালে বোধ হয় কেবল সমালোচন উপলক্ষ করিয়া প্রবন্ধ লিখিবার প্রথা বড় একটা ছিল না, টীকা-টিপ্পনীতে প্রসঙ্গ উপলক্ষেই সচরাচর নানা গ্রন্থকারের মতামত সমালোচিত হইত। তখন সমালোচনার বড় বেশী প্রয়োজনও হইত না, কেননা গ্রন্থকারগণ জীবনব্যাপী অধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান উপার্জন করিতেন, সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় যে সত্য আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেন, তাহা নিজেই ধীরভাবে সমালোচনা করিয়া, উপযুক্ত ভাষা, ভাব এবং অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কাজেই তাঁহাদের গ্রন্থে অন্যের সমালোচনার জন্য তেমন অবকাশ থাকিত না। কিন্তু আজকালকার এই ব্যস্ততার দিনে, এই অভিনবতার যুগে

সে ভাবের কি আশা করা যায়, না তাহা সম্ভব হয়? * * * সমালোচন যখন কাব্যের শত্রু নহে, বরং একটা প্রবল সহায়, তখন ইহাকে আর অধিক কাল উপেক্ষা করা কি উচিত? বিধি-ব্যবস্থা-শূন্য রাজ্য যেমন, সমালোচনাশূন্য সাহিত্য-সমাজ কি সেইরূপ নহে? * * * কাব্যাদির প্রধান উদ্দেশ্যই শিক্ষা, আনন্দ-বোধ তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থা মাত্র। সমালোচনাই এই শিক্ষার সূত্র, কাব্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত। অলঙ্কার-শাস্ত্র এই শিক্ষার শৃঙ্খলাবদ্ধ সূত্র সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অলঙ্কার-শাস্ত্রের নাম লইয়া আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন, আমাদের অলঙ্কার-গ্রন্থ অনেক আছে, তাহাই তো পর্যাপ্ত। আমি এই ভয়েই আদ্যোপান্ত সমালোচন শব্দের ব্যবহার করিতেছি। আজ আমরা যাহাকে সমালোচন বলিতেছি, কালে তাহাই বঙ্গভাষায় অলঙ্কার-শাস্ত্র হইবে। যে অলঙ্কার আছে, তাহা আমাদের দিদিমার অলঙ্কার, মা'র গায়ে তাহা খাটিবে না।'

প্রাচীন সাহিত্যে কেন সমালোচনা ছিল না সে-বিষয়ে এই লেখকও একটি অনুমান পেশ করেছেন, সে অনুমান চতুর বটে, তবে তারও ইতিহাস-সম্মতি দেখছি না। কিন্তু এই লেখকও আধুনিক জীবনের সঙ্গে সাহিত্য-রচনার ও সমালোচনার সম্পর্ক প্রস্তাব করেছেন, আরো প্রস্তাব করেছেন যে প্রাচীন সাহিত্যের অলঙ্কার-শাস্ত্র দ্বারা আধুনিক সাহিত্যের সম্যক বিচার-পদ্ধতি প্রযুক্ত হবে।

সদ্যোজাত বাংলা সমালোচনায় বেশ একটি পরস্পর-বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ইওরোপীয় পদ্ধতির সমালোচনা বাংলা সাহিত্যেও প্রয়োজন একথা মানা হয়েছে, অথচ বাংলায় বিদেশীয়ানা বরদাস্ত হয় নি। বাংলা সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে কয়েকটি সমসাময়িক মত উদ্ধৃত করছি।

(পূর্ণচন্দ্র বসু) 'বিলাতী সাহিত্যের মান বিলাতী সমাজে থাকিতে পারে, সে সমাজের রীতিনীতি ও ধর্মাধর্মের বিচার স্বতন্ত্র। * * * কি সাহিত্য, কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি দর্শন—বিদ্যার সমস্ত অঙ্গই ধর্মনীতি এবং সমাজনীতির অনুকূল হওয়া চাই, যাহা অনুকূল নহে, তাহা তদ্বিরোধী, এজন্য পরিত্যজ্য। * * * সেক্সপীয়ার হউন, মিলটন হউন, যিনিই হউন না কেন, যাঁহার কাব্যের ফলশ্রুতি হিন্দু সমাজ-নীতি এবং ধর্মনীতির বিরোধিনী হইবে,

তিনি প্রকৃত হিন্দুর নিকট তদুপযুক্ত সমাদর লাভ করিবেন। * * * তাই আজ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর আদর ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ইংরেজি ছাঁচে ঢালা বাঙ্গালার অপরাপর উপন্যাস ও কাব্যাদির দশাও যে তদ্রূপ হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।'

(বঙ্কিমচন্দ্র : "মানস-বিকাশ" নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধার করার পরে বলছেন :) 'এ কবিতা উত্তম, কিন্তু ইহাতে বড় ইংরেজি গন্ধ কয়। ইংরেজ শিষ্য এইরূপে প্রেম বর্ণন করিলেন, ইহার সঙ্গে কণ্ঠিধারী বৈরাগিগণকৃত প্রেম বর্ণন তুলনা করুন, কিন্তু তৎপূর্বে আর একজন হাফ-ইংরেজ হাফ-জয়দেব-চেলার কৃত কবিতা শুনুন।'

(অক্ষয়চন্দ্র সরকার · 'কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' :) 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার শেষ কবি। মধুসূদন বাংলার মিলটন, হেমচন্দ্র পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র-বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ-শেলি,—বেশ কথা, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার কি? ঈশ্বর গুপ্ত—বাংলার ঈশ্বর গুপ্ত। ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের নিন্দা, ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসা। তাঁহার কবিত্ব বাঙালীর নিজস্ব। * * * বাঙালীর খাঁটি বাংলা পদ্য এখন আনাচে-কানাচে আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজী গন্ধী, ইংরাজী ছন্দী,—তাহার উল ইংরাজী, তাহার ফুল ইংরাজী—এরূপ পরস্ব পদ্য কেবল আসর জাঁকাইয়া পসার করিতেছে। * * * ১২৯২ সালের ভাদ্রের প্রথমেই আমরা এখনকার কালের কাব্য ইংরাজী গন্ধী ইংরাজী গন্ধী বলিয়া খটকা তুলিলাম, দুঃখ করিতে লাগিলাম। দুই মাসের মধ্যেই বঙ্কিমবাবুর লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী প্রকাশিত হইল। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন—

'আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্যবিশিষ্ট বাংলা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হউক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙালী কথায়, খাঁটি বাঙালীর মনের ভাব তো খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাংলা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না।'

(বীরেশ্বর পাঁড়ে : "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত", নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য :) ''অভিমন্যু' Sir Philip Sidney-র অনুবাদ। উত্তরা পাশ্চাত্য

রমণীর ন্যায় রূপগুণসম্পন্না। শৈলজার চরিত্র……পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা।… সুভদ্রাও পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা।'

উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই, উপরের বাক্য-স্তবক কয়টির মধ্যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যয়ঘন উক্তিও আছে। এসব মতামত থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্ভব: (ক) 'বিলাতী সাহিত্যের মান বিলাতী সমাজে'। এই যুক্তির সূত্রে স্থির অনুমান করা যেতে পারে যে তাহ'লে দেশী সাহিত্যের মান দেশী সমাজে, অথবা অপরপক্ষে বলা যেতে পারে যে দেশী সমাজের মান দেশী সাহিত্যে। আসল কথা, দেশী বা বিলাতী, যে কোনও সাহিত্যের মান স্বকীয় সমাজ। (খ) দেশী ও বিলাতীর এই প্রভেদ সম্বন্ধে উনিশ শতকী সমালোচকদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বড় সহজেই বিচলিত হত। তাঁরা নবীন কবিদের রচনায় ইংরেজি গন্ধ পেতেন, ইংরেজি আদর্শের প্রতিরূপ দেখতে পেতেন। (গ) কবিগণকে দুই পংক্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভব ছিল—খাঁটি বাংলা কবি, শিক্ষিত কবি। এই শিক্ষিত কবিগণ অবশ্যই ইংরেজি-শিক্ষিত, অতএব সম্ভবত ইংরেজি কাব্য-প্রভাবিত।

বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে অন্তত একজন লেখক সুচিন্তিত কথা বলেছেন। ১২৮৮ সালের "বঙ্গদর্শনে" জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ-সমীক্ষক 'রঙ্গমতী কাব্য' সম্বন্ধে একটি অনুবন্ধে বলেছেন:

'বঙ্গভূমিতে মহাকাব্য জন্মিল কিরূপে? ইহার উত্তর সহজ। যখনই এই চিরস্থিতিশীল সমাজের অটুট বন্ধনীগুলি কালপ্রভাবে এক একবার শিথিল হইয়াছে, অমনি বঙ্গে কাব্য জন্মিয়াছে। বৈদেশিক ভাবপ্রভাব যখন বহিয়াছে, তখনই কাব্য দেখা দিয়াছে—কেননা তখন সমাজ বৈচিত্রের মহিমা বুঝিয়াছে।'

এই লেখক কয়েকটি আপ্তবাক্যে সন্তুষ্ট থেকেছেন, বঙ্গসমাজে একদা বন্ধন ও অপরযুগে বন্ধনমুক্তি এই দ্বিবিধ গতির সঙ্গে কাব্যের উত্থান ও পতন কীভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছে (যদি সত্যিই হয়ে থাকে) আর সেই সংশ্লেষের সপক্ষে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত কোথায়, এসব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তিনি তোলেন নি। ঐতিহাসিক ঘটনার সমর্থনে বাংলা কাব্যের সঙ্গে বাংলা সমাজের সংযোগ সম্পর্কে বরঞ্চ হুমায়ুন কবির তাঁর "বাংলার কাব্য" নামক বিস্তৃত প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধাপ কয়টি দ্রুত অথচ তীক্ষ্ণ নজরে দেখে নিয়েছেন।

প্রায় একশো' বছর আগে বাংলা সমালোচনার পথিকৃৎগণ যে-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন—স্বকীয়তার সমস্যা, চিন্তা ও চিত্তবৃত্তির স্বাধীন আদর্শের সমস্যা—সে-সমস্যা আজও তিরোহিত হয়েছে বলে মনে হয় না, বরং যেহেতু সেকালের তুলনায় অধুনা সমালোচনা চালু অনেক বেশি, সমালোচনার পদ্ধতিও অনেক বেড়েছে কেননা সমালোচ্য শিল্পের বৈচিত্র্য আজ অনেক বেশি বিস্তৃত ও জটিল, সেজন্য মনে হয় বাংলা সমালোচনায় স্বকীয়তার সমস্যা আজ সেকালের চেয়েও তীক্ষ্ণতর। অন্তত এই প্রবন্ধ-লেখকের বিচারে তো বটেই।

কোনো সাহিত্যেই সমালোচনা স্বয়ম্ভূ কর্ম নয়, সমালোচনা নিয়তই সৃজনী সাহিত্যের অনুগামী। ইংরেজিতে যে কর্মৈষণাকে বলা হয়েছে, বলদের আগে গাড়ি জোতা, সে-অপচেষ্টা কেবল হাস্যকরই নয় তার ব্যর্থতাও অবধারিত। সমালোচিতব্য বস্তু হচ্ছে সৃজনী সাহিত্য, সে-বস্তুর অভাবে শেক্স্‌পিয়র-নায়ক ওথেলোর মতোই সমালোচকেরও পেশা অদৃশ্য হয়ে যায়। বাংলা সমালোচনায় স্বকীয়তার প্রশ্ন বস্তুত বাংলার সৃজনী সাহিত্যে স্বকীয়তার প্রশ্নের সঙ্গে অনুলিপ্ত। আমাদের দৃষ্টি আরো প্রসারিত করলে বুঝতে পারব যে শুধু বাংলা সৃজনী সাহিত্যের সঙ্গেই নয়, সমগ্র আধুনিক বাংলা জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে, সমগ্র আধুনিক ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গেও, বাংলা সমালোচনা সমতানে অনুরণিত। ব্যাপক ক্ষেত্রে যে-প্রশ্ন ঊর্ধ্বশির, যে-চিন্তা কুণ্ডলীকৃত, সমালোচনার সীমিত ক্ষেত্রেও সে-প্রশ্নের সে-চিন্তার প্রভাব, পরন্তু সমালোচনায় মীমাংসিত সত্য বৃহত্তর জীবনেও ধ্রুব। প্রভেদ বর্গের নয়, ঘনতার। সমালোচনার সীমিত ক্ষেত্রে প্রশ্নটি ও চিন্তাটি সংহত, ঘনীভূত, তীব্র। বাংলা সমালোচনায় আমি দু'টি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখতে পাই, তা'রা আপাত-দৃষ্টিতে অ-সঙ্গত, পরস্পর-বিরোধী, এমনকি পরস্পর-বিনাশী। বাংলা সমালোচনা একদিকে বহির্বিশ্বের সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ব্যগ্র ও প্রসারিতবাহু, সে-সাহিত্যের সঙ্গেই যেন তার নাড়ির যোগ। অপরদিকে যেহেতু ইদানীংকার বাঙালী জাতি বঙ্কিমের সমকালীন বাঙালীর মতো আত্মবিস্মৃত নয়, সেজন্য আজকের বাঙালী স্বীয় ইতিহাস-চেতনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ও পুনরাবৃত্ত ভাবনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আপন সৃষ্টির সাযুজ্যসাধন করতে চায়।

এই দ্বিশাখ উদ্দেশ্যের পথ সরল নয়, উভয় শাখায়ই বাহুল্যজনিত কদর্যতা ও নির্বুদ্ধিতা সম্ভব। ইওরোপের সাহিত্য, চিন্তা ও জীবনের সংস্পর্শে এসে একদা আমাদের চোখে এতই ধাঁধাঁ লেগেছিল (অনেক ব্যক্তিবিশেষের চোখে, কোনো কোনো সমাজস্তরস্থ নরনারীর চোখে, সে ধাঁধাঁ যেন আজ আরো বেশিরকমে লেগে আছে), আমরা এতই মনে করতাম যে ইওরোপীয়দের তুলনায় আমরা হীন সংস্কৃতির শস্য, যে তখন নির্বিচারে যা কিছু ইওরোপীয় তা-ই গ্রহণ করার চেষ্টায় ছিলাম। নির্বিচারে মানে কেবল সদসৎ বিচারের অভাব নয়, ইওরোপীয় কোন্ চিন্তা ও প্রথা সর্বকালীন বিচারের, এমনকি ইওরোপীয় বিচারেরই নিকষে অগ্রাহ্য প্রতিপন্ন হতে পারে, তেমন স্বাধীন বিচার আমরা খুবই কম করেছি। উপরন্তু এমন বিচারও করিনি যে ইওরোপের অনেক প্রথা ও চিন্তা সৎ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত হতে পারে কি না। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ব্লাড্ট্রান্স্ফিউশন্ হ'য়ে থাকে, অপরের রক্ত রোগীর দেহে প্রবিষ্ট করানো যেতে পারে, কিন্তু যে কোনো ব্যক্তির রক্ত নয়, রক্তে রক্তেও সগোত্রতা থাকতে হবে। বাংলা সমালোচকের এই জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক: অ-বাঙালী, অ-ভারতীয় সাহিত্যের কোন্ শিল্প-ভাবনা, কোন্ ছাঁদ কোন্ প্রকরণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-পরম্পরার সঙ্গে সগোত্র অতএব সঙ্গতি-সম্ভব? একদা পরানুকরণের উচ্ছ্বাসে আমরা ভেবেছি বাংলায় একটি স্কট, একটি বায়রন, একটি শেলি খুঁজে পেলেই আমাদের মান বেড়ে যাবে জগৎ-সভায়। পলাশীর যুদ্ধ পড়তে গিয়ে আমরা ভেবেছি চাইল্ড্ হ্যারল্ড-এর কথা, বৃত্রসংহার পড়ার সময় স্কটের কাব্য স্মরণ করেছি, রঙ্গমতী কাব্য ও লেডি অব্ দি লেক্ পাশাপাশি রেখে পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতাটি শেলির 'ওড্ টু দ্য ওয়েস্ট উইণ্ড' থেকে নিকৃষ্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমাদের চেতনা নেই যে ইংরেজি গীতিকবিতার সঙ্গে বাংলা গীতি-কবিতার রূপগত তুলনা অতীব সাবধানে করা দরকার কেননা দুই ভাষার সঙ্গীতধর্মে অনেক মৌল পার্থক্য, ইওরোপীয় সঙ্গীতে ও ভারতীয় সঙ্গীতে গভীর প্রভেদ, সুতরাং 'বর্ষশেষ' এবং শেলির 'ওয়েস্ট উইণ্ড' কবিতা দুইটিতে ভাবগত স্থূল সাদৃশ্য বর্তমান থাকলেও ভাবগুলির অবয়বী গড়নে মৌল প্রভেদ। হ্যাণ্ডেল্-এর সঙ্গীত এবং ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন মূলেই আলাদা বস্তু,

শোপাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে ঠুংরির তুলনা হয় না যেমন হয়সালা স্থাপত্যের সঙ্গে রীম্‌স্ ক্যাথিড্রালের তুলনায় তুলনাকারীর ঔচিত্যবোধের অভাব সূচিত হয়। মহাভারতের মহাকাব্যত্ব ইলিয়ডের আদর্শে মূল্যায়িত হতে পারে না কেননা যদিও দুই গ্রন্থই মহাকাব্য, মহাকাব্যের ধারণা ও রীতি দুই সংস্কৃতিতে পৃথক।

শিল্প-প্রকরণ যেখানে আলোচ্য সেখানে ইওরোপীয় সাহিত্যের নজির দেখবার পূর্বে বাংলা সমালোচককে অতিশয় সতর্ক হতে হবে। ইংরেজি সাহিত্যে (অথবা অন্য কোনো ইওরোপীয় ভাষার সাহিত্যে) ও বাংলা সাহিত্যে শিল্প-মাধ্যম—অর্থাৎ ভাষা—মূলেই পৃথক। একদা প্রাগৈতিহাসিক বিস্মৃত যুগে ইংরেজি ভাষার ও বাংলা ভাষার আদি জননী ছিল একই ভাষা এমন কথা মেনে নিলেই মানা যাবে না যে আজও দুই ভাষার জ্ঞাতিত্ব নিকট ও সুস্পষ্ট। দুই ভাষার শব্দরূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্য বন্ধ, শব্দের ও বাক্যের ব্যঞ্জনা, শব্দের ও বাক্যের ঐতিহ্য-বাহিত ভাবানুষঙ্গ, এ-সমস্তে দুরতিক্রম্য ব্যবধান দাঁড়িয়ে গেছে। সত্য বটে গত দেড়শতাধিক বৎসরের নিয়ত সংস্পর্শে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারে, শব্দব্যঞ্জনায় ও এমনকি বাক্যবন্ধেও কিছু ইংরেজিয়ানা প্রবেশ করেছে কিন্তু এই যাবনিকতায় বাংলা ভাষার নবত্বশীল প্রাণশক্তিই সপ্রমাণ হয়, ভাষার মূল রূপের কিছুমাত্র হানি হয়নি। শিল্পের রূপ নির্ভর করে শিল্পের উপকরণের উপরে। বাংলা সাহিত্যের উপকরণ বাংলা ভাষা, সেই ভাষার কুশলতম প্রয়োগে এমন কোনো কোনো শিল্পসিদ্ধিতে পৌঁছনো সম্ভব যা' ইংরেজি ভাষার কুশলতম প্রয়োগে সম্ভব নয়। বিপরীত প্রস্তাবও সত্য। তাহলে সদ্বিচারী বাংলা সমালোচক কোনো বাংলা শিল্প-বস্তুতে ও ইওরোপীয় শিল্পবস্তুতে বহিরাঙ্গিক সাদৃশ্য দেখেই তুলনায় ও মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হবেন না, উপকরণের ও প্রকরণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তুলনায় প্রবৃত্ত হতে পারেন অথবা বিরতও থাকতে পারেন। এই পরিপ্রেক্ষিতজ্ঞানে বা জ্ঞানের অভাবেই অধিকারী ও অনধিকারী সমালোচকের প্রভেদ। কোনো আধুনিক সমালোচক ইংরেজি (তথা ইওরোপীয়) প্রথায় বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করতে পারেন—করার প্রচুর সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে কেননা একদিকে যেমন বাংলা দেশে আমরা গত দীর্ঘকালের মধ্যে শিল্পনির্মিতি সম্বন্ধে, শিল্পপ্রকরণ সম্বন্ধে আদৌ কোনো নূতন চিন্তা করিনি, পক্ষান্তরে ইওরোপে গত এক শতকের মধ্যে চিন্তার নবত্ব আশ্চর্য দ্রুততায় এগিয়ে চলেছে—তবুও

সব সময়েই তাঁকে একটি ধ্রুব মূলপ্রশ্ন মানতে হবে যে বিদেশী প্রকরণটি বাংলা ভাষায় সাধ্য কিনা। কেবল সাধ্য হলেও চলবে না, tours de force হলে চলবে না, ইংরেজিতে হেক্সামিটারে, আল্‌কেইকে, কাটুল্লুসের হেন্‌ডেকাসিলাবিকে পদ্য রচিত হয়েছে, বাংলাতেও মন্দাক্রান্তা, মালিনী, শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের পরীক্ষা হয়েছে, এসবেই tours de force অর্থাৎ নির্মাণ-চাতুর্য লক্ষণীয় বটে কিন্তু শিল্পের সুষম সুমিতি নয়। শিল্পমাধ্যমের স্বধর্ম সম্বন্ধে নিয়ত-চেতনায় বাংলা সমালোচকের স্বকীয়তা প্রমাণিত হবে।

স্বধর্ম-চেতনা শুধু শিল্পমাধ্যমেই প্রযোজ্য নয়, শিল্পের বিষয়বস্তুতে ও শিল্পজ সংবেদনায়ও প্রযোজ্য। এমন মনে করার কোনোই কারণ নেই যে একটি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মাত্র একটি প্রকার অনুভূতিই সঞ্চারিত হতে পারে। বাস্তবিক দেখা গেছে যে আপনার কাছে যা' করুণরসাত্মক, আমার কাছে তা' বিরস, আমার কাছে যা' শোকাবহ আপনি তা'তে কৌতুক বোধ করেন। ভ্রাম্যমাণ এক ইংরেজ নট-সম্প্রদায় বারো তেরো বৎসর পূর্বে বোম্বাই দিল্লী লাহোর ঘুরে সব জায়গাতেই শেক্‌স্‌পিয়রের ওথেলো নাটক মঞ্চস্থ ক'রে অবশেষে পেশোয়ারে উপস্থিত হ'য়ে সেই নাটকই মঞ্চস্থ করেন এবং লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হন যে ওথেলো যখন ডেস্‌ডেমোনার শ্বাসরোধ করছে, বলিষ্ঠ পাঠানেরা তখন মহা উল্লাসে করতালি দিয়ে চলেছে কেননা অওরতের পাতিব্রাত্য সম্বন্ধে যদি স্বামীর সন্দেহ জাগে তাহলে কোনো মরদের পক্ষেই ব্যভিচারিণীর শ্বাসরোধ করা ছাড়া অন্য কোন্ আচরণ সম্ভব? আরেকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন। গীতার গোড়াতে আমরা জানছি যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধোন্মুখ দুই বাহিনী সমবেত হয়েছে, পাণ্ডবপক্ষের প্রধান যোদ্ধা বাহিনী পরিদর্শন করতে গিয়ে চিত্তবৈকল্য বোধ করলেন, তাঁর সারথি তখন জন্ম-মৃত্যু অবিনশ্বর আত্মা সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দিলেন। আমার পরিচিত জনৈক ইংরেজ সাহিত্যিক-অধ্যাপকের কাছে শ্রীকৃষ্ণের এই বক্তৃতা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ঠেকেছে। দুই দিকে সেনাবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে সেনাপতি অর্জুন ছাত্রের মতো দাঁড়িয়ে নিজ সারথির বক্তৃতা শুনছেন, ঘণ্টার পরে ঘণ্টা, এমন কাহিনী (উক্ত অধ্যাপকের মতে) ইওরোপীয় সাহিত্যে অসম্ভব। তাঁর মতে সেনাপতির পক্ষে চিত্তবৈকল্য যদি বা সম্ভব, অষ্টাদশ অধ্যায়ব্যাপী বক্তৃতা উপলক্ষে উদ্যত সমরায়োজন বিলম্বিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। বিদেশী

পাঠকের এই যুক্তি অবশ্য রিয়ালিজমের যুক্তি। কিন্তু ভারতীয় পাঠক গীতার প্রাকরণিক মূল্যায়নে এই যুক্তি প্রয়োগ করবেন না। আঠারো অধ্যায় ব্যাপী দার্শনিক উক্তি তাঁর কাছে অস্বাভাবিক মনে হবে না কেননা তিনি জানেন যেখানে স্বয়ং ভগবান বক্তা ও শ্রোতা অসামান্য ব্যক্তি অর্জুন, সেখানে দার্শনিক জ্ঞান সঞ্চার ক্রিয়াটি কালিকলমে বর্ণনা করতে যদিও আঠারো অধ্যায়ের দরকার হয়েছে, তথাপি সেই জ্ঞান এক মুহূর্তে, শ্রীকৃষ্ণের নির্বাক এক দৃষ্টিতেই, অর্জুনে সঞ্চারিত হতে পারে। বিদ্যুৎ-উদ্ভাসের মতোই এক পরম-সংহত সুতীব্র আধ্যাত্মিক প্রবাহনে আঠারো অধ্যায়ের দিব্যজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অর্জুনে পৌঁছেছে। মহাভারতের দিব্যশক্তিসম্পন্ন নায়কসমূহে যদি প্রত্যয় রাখি তাহলে এই নিমেষ-সংহত জ্ঞানসঞ্চার আদৌ অস্বাভাবিক মনে হবে না। ইওরোপীয় রিয়ালিজমের যুক্তি এহেন ভারতীয় সাহিত্যবস্তুর মূল্যায়নে অসার্থক, একথা জানার মধ্যে ভারতীয় সমালোচকের স্বকীয়তা প্রকাশ পায়।

সমালোচনায় যে-স্বকীয়তার কথা আমি বলছি তার আভাস বাংলা সমালোচনার আদিযুগ থেকেই সহৃদয় লেখকদের মনোভঙ্গীতে প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্বী রচনায় স্বকীয়তার সূত্রপাত, রবীন্দ্রনাথে তার ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি। এই স্বকীয়তার এক বিঘ্ন ইওরোপীয় আদর্শের বাহুল্যে, সে কথার আলোচনা করেছি। আরেক বিঘ্ন স্বাদেশিকতার বাহুল্যে। উনিশ শতকে আমাদের স্থবির সমাজপ্রথার উপরে ইওরোপীয় সংস্কৃতির অভিঘাতের সঙ্গে কোনো কোনো বুদ্ধিপন্থী যেমন নির্বিচারে বিদেশীয়ানায় প্রবৃত্ত হলেন, অপরপক্ষে অন্যেরা (সেই একই অভিঘাতের ফলে) আপন ঐতিহ্যসম্বন্ধে সচেতন হলেন। বাংলা সাহিত্য-রসিক বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসের সঙ্গে আপন সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যপাঠ সঙ্গত করার চেষ্টায় নিযুক্ত হলেন। বাংলা সাহিত্যেরও পূর্বে যে সংস্কৃত সাহিত্যের নিয়ম ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেসব নিয়ম ও আদর্শ বাংলা প্রমুখ নবীনতর ভাষাগুলির সাহিত্যে কমবেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। এখনকার সাহিত্য-রসিক স্বয়ং ধ্বন্যালোক না পড়ে থাকুন, এমনকি অতুল গুপ্তও না পড়ে থাকুন, হয়তো আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্তের নাম শুনে থাকবেন, অন্তত ব্যঞ্জনা-লক্ষণা, বাচ্যার্থ-বক্রোক্তি, ধীরোদাত্ত-ধীরোদ্ধত-ধীরললিত, বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীভাব প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্রীয়

সংজ্ঞাগুলি তাঁর কাছে দূরশ্রুত অস্পষ্ট ধ্বনি হ'তেও পারে। বস্তুত আমি যে উপরে 'সাহিত্য-রসিক' শব্দটির প্রয়োগ করেছি, অসংখ্য আরো লোক করেছেন, তা'র মানে এই নয় যে আনন্দবর্ধনের তত্ত্বগুলি আমাদের পক্ষে হস্তামলকবৎ, তা'র মানে শুধু এইটুকু যে 'রস' নামক আলঙ্কারিক ধারণা ঐতিহ্যপ্রভাবে আমাদের চেতনায় প্রবেশ করেছে যেমন কিনা বর্তমান জগতের অধিবাসী হওয়ার দরুন (বুঝি বা না বুঝি) এভল্যুশন্—রিলেটিভিটি—অ্যালার্জি—ক্লাস কন্‌শাস্‌নেস্ প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিক সংজ্ঞার সঙ্গেও আমরা পরিচিত। কাব্যপাঠের পরম্পরায় সাহিত্যাদর্শের যে-ঐতিহ্য আজকের বাঙালী সমালোচকের কাছে পৌঁছেছে, তাতে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক যত প্রভাবশালী, ততখানিই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র। এমন কথাও শুনেছি যে আজকের দিনে ভবভূতি-ভারবি-বাণভট্টের চেয়ে কুন্তক-ভামহ-আনন্দবর্ধনের সঙ্গেই রচনাশীল ভারতীয় সাহিত্যিকের আত্মিক সংযোগ অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও প্রাণবান। অপরাপর কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় যেমন বাংলা ভাষায়ও তেমনি ইদানীং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের পুনরালোচনা হচ্ছে, কিছু শাস্ত্রিক গ্রন্থের অনুবাদ হচ্ছে, আর বোধহয় তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য কথা, বাংলায় লেখা সমালোচনায় ও গ্রন্থসমীক্ষায় সংস্কৃত অলঙ্কারবিচারের কোনো কোনো প্রণালী প্রযুক্ত হচ্ছে। কোনো কোনো বিদ্বান চিন্তা করছেন সংস্কৃত অলঙ্কার, গ্রীকো-রোমান রেটরিক্, ইওরোপীয় রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শ, সমসাময়িক ইওরোপের নব্য সমালোচনারীতি, এ-সমস্তের সুমিত সমাহার সম্ভব কিনা। সমাহার যদি অর্জিত না-ও হয় (কেননা এই সমাহারের প্রশ্ন কেবল সাহিত্যিক সমস্যা নয়, আধুনিক ভারতীয় জীবনের ও দর্শনের লক্ষ্য), অন্তত সমাহারের প্রয়োজনজ্ঞানে আধুনিক বাংলা সমালোচকের স্বকীয়তা সূচিত হবে। এই সমস্যাচেতনায় তাঁর প্রগতিশীল চিত্তের পরিচয়। পক্ষান্তরে যাঁরা মনে করেন যে বাংলা সাহিত্য সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে যেখানে ইওরোপীয় অভিঘাত কার্যকরী হয়নি, তাঁদের ধারণায় এই অভিঘাত বিস্মৃত হ'য়ে প্রাচীন আদর্শের পুনরুজ্জীবন আমাদের কাম্য, তাঁরা রিভাইভ্যালিস্ট্। ভারতবর্ষে আজ রিভাইভ্যালিস্‌টের অভাব নেই। যে সমালোচক বাংলা সাহিত্যের আদর্শ ও প্রথা সম্পূর্ণত মধ্যযুগীয় সাহিত্যচিন্তার লাঙ্গুলে শৃঙ্খলিত রাখতে চান, তাঁর সাহিত্যচিন্তায় সাহিত্যপ্রীতির চেয়ে গতানুগতিক

সমাজ-ব্যবস্থায় প্রীতিই প্রবলতর। উদাহরণস্বরূপে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তিনজন পুরাতন সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করছি :

[পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় :] 'বিলাতের যে আদিরসের romanticism বায়রণ হইতে ব্রাউনিং পর্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মোহ এড়াইতে পারেন নাই। * * * নানাভাবে অনুশীলন-তত্ত্বটা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এ অনুশীলন-তত্ত্বটা কিন্তু খাঁটি ইউরোপের সামগ্রী। জর্মন পণ্ডিত ফিক্‌তের (Fichte) 'Individual and Communal Culture', ব্যক্তি এবং সংহতির অনুশীলনটাই তিনি বাঙ্গালার গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া বাঙ্গালীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় আছে, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় তাহার কোন আদর্শের অনুকূল নহে। * * * আমার অনুমান হয় যে আনন্দমঠের গড়নে নিউম্যানের ভাবের মসালা অনেকটা আছে। * * * আনন্দমঠের সন্ন্যাসীর আদর্শের তলায় বিলাতী পেট্রিয়টিজম্ আছে, ইউরোপের outlawry-র মোহন অংশটুকু অঙ্কিত আছে।'

[বীরেশ্বর পাঁড়ে : 'বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ' :] 'বঙ্কিমচন্দ্র খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবে গঠিত হইয়াছিল। শেষকালে তাঁহার মত সমস্ত পরিবর্তিত হইলেও, প্রথমে তিনি গোঁড়া পাশ্চাত্যবিষয়ানুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কাব্য হিন্দু রীতিনীতি ও হিন্দুভাবের বিরোধী নহে।'

[পূর্ণচন্দ্র বসু : 'সাহিত্যে খুন'] 'ইংরেজী ট্র্যাজেডির দোষ এক্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে গৃহীত হইতেছে। নিজে বঙ্কিমও এই দোষে দূষিত হইয়াছেন। তাঁহার কুন্দনন্দিনীর বিষপান এক্ষণে অনেক গৃহস্থসংসারে কার্যে পরিণত হইতেছে। আত্মহত্যায় যে ঘোর পাপ, এখন সে ঘোর পাপের ভয় আমাদের অনেক স্ত্রীলোকের মন ও কল্পনা হইতে অপসারিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্মভীরুতা বিনষ্ট হইতেছে। তাহারা রঙ্গভূমে ম্যাকবেথ দেখিয়া আসিয়া সাহসিনী হইতেছে। ম্যাকবেথের বিষ ছিল কেবল ইংরাজী ভাষায়, এক্ষণকার কুরুচিসম্পন্ন লোকে তাহা বাঙ্গলা ভাষায় আনিয়াছে।'

স্পষ্টতই এসব উক্তিতে সত্যিকার সাহিত্যবোধ আদৌ নেই যদিও সাহিত্যগ্রন্থের উল্লেখ আছে, এবং এসব সাহিত্যালোচনা প্রকৃত পক্ষে সমাজ-

ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা। ভারতীয় ঐতিহ্যের দোহাই আছে, সে-ঐতিহ্যের অপূর্ব উদারতা, পরিবর্তনশীলতা, বহুগ্রাহিতা সম্বন্ধে না আছে সুষ্ঠু ধারণা, না শ্রদ্ধা। এই দুর্বল ঐতিহ্যম্মন্যতা আজও বাংলা সমালোচনায় অপ্রচুর নয়, বরং ১৯৪৭ সনের পরে থেকে কখনো কখনো জোরদারী।

বহির্বিশ্ব থেকে শৈল্পিক প্রত্যয় ও প্রথা গ্রহণ করায় কোনো কলঙ্ক নেই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণযোগ্য :

'নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু যথাসময়ে সে হয় ভারতেই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ু-গ্রস্ত স্বাদেশিক যেন তাকে ভর্ৎসনা না করেন ; যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার করে' আপন সীমানা থেকে বার করে' দিয়েছে। সে মরু থাক আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে। তার উপরে রসের বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন, সে কোনোদিন প্রাণবান হয়ে উঠবে না। বাংলা দেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে দাশু রায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক। এটা অন্ধ অভিমানের কথা।'

রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি বাংলা সমালোচকের বীজমন্ত্র হওয়া উচিত। কোন্ বিষয় বা মনোভঙ্গী শিল্পীর অন্তরঙ্গ, কোন্‌টিই বা বহিরঙ্গ, তা'র নির্ণয় হবে সেই বিষয়ের বা মনোভঙ্গীর উৎপত্তিস্থল বিচারে নয়, তা'র শিল্পাবেগসঞ্চার-ক্ষমতায়। 'দ্য প্রুফ্ অফ দ্য পুডিং ইজ্ ইন্ দ্য ইটিং', স্বাদেই বিচার, রসসঞ্চার-ক্ষমতায় রসবস্তুর সত্যতা সপ্রমাণ। বাংলার সাহিত্যিক ইতিহাসে এমন অনেক সাহিত্যিক ঘটনা ঘটেছে যার মূল আদিতে দেশজ ছিল না, ক্রমে পুরোদস্তুর বঙ্গীয় হয়েছে। এই আত্মীকরণের শক্তিতে, নিত্য নব-রূপায়ণের সাবলীল ভঙ্গিমায়, যে কোনো ভাষার ও সাহিত্যের অগ্রগতি। যে-সাহিত্য ঐতিহ্যের নামে স্থিতবেগ, সে-সাহিত্য মৃত অথবা মরণোন্মুখ। এ-প্রসঙ্গে টি. এস্, এলিয়টের সুপরিচিত অভিমত পুনঃ পুনঃ স্মরণযোগ্য :

If the only form of tradition, of handing down, consisted in following the ways of the immediate generation before us in a blind or timid adherence to its successes, 'tradition' should positively be discouraged. We have seen many such simple

currents soon lost in the sand ; and novelty is better than repetition. Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour. It involves, in the first place, the historical sense which we may call nearly indispensable to any one who would continue to be a poet beyond his twenty-fifth year ; and the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence. [যদি ঐতিহ্যের একমাত্র রূপের, অর্থাৎ এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে হস্তান্তরের, মানে হয় পূর্ব-পুরুষের রীতিনীতির অন্ধ অনুসরণ অথবা শঙ্কিত অনুগমন, তাহলে নিশ্চয় এহেন ঐতিহ্যের আস্কারা দেওয়া উচিত হবে না। আমরা দেখছি এহেন অনেক সরল স্রোতস্বিনী বালুকায় পথ হারিয়েছে। পুনরাবৃত্তির চেয়ে নূতনত্ব ভালো। ঐতিহ্যের আসল মানে অতিশয় ব্যাপক। ঐতিহ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ হয় না। যদি ঐতিহ্য লাভ করতে চাও তাহলে বহু পরিশ্রমে লাভ করতে হবে। এর সঙ্গে জড়িত সেই কালক্রমধারণা যে-ধারণা প্রায় যাবতীয় পঁচিশ বর্ষোত্তীর্ণ কবি-যশঃপ্রার্থীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আর এই কালক্রমধারণায় অনুভূত হয় যে অতীত কেবল বিগত কালেই সমাপ্ত নয়, বর্তমান কালের সঙ্গেও অনুলিপ্ত।]

একদিকে ইতিহাস-চেতনা, ঐতিহ্যেষণা, অন্যদিকে বহির্বিশ্বের আহ্বান, এই দুইয়ের কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণ, ঘর ও বাইরের দুমুখো টান, বাংলা সমালোচনায় প্রথম থেকেই আমাদের সাহিত্যচিন্তায় প্রবল। এরি মধ্যে, নিঃসংশয়ে বাংলা সমালোচনায় স্বকীয় সুর বেজেছে। বাংলা সমালোচনায় প্রথমাবধি সাহিত্যের অভিধায় সংস্কৃত ব্যঞ্জনা। সাহিত্যের মূলে মানব-সমষ্টিই কেন্দ্র। এই সাহিত্যে সত্যশিবসুন্দরের যোগ আছে, যদিও সত্য, শিব, সুন্দর এই তিনটি কথার প্রয়োগেই অনেক ঝাপসা চিন্তা, গতানুগতিক নির্মনা প্রত্যয় নিহিত এবং সে কারণেই সত্য শিব ও সুন্দরের পারস্পরিক সম্পর্কও অস্পষ্ট। তবু বোঝা যায় যে সাহিত্যের উপভোগে কল্যাণবোধ ও সত্যনিষ্ঠা বড়ো উপকরণ। বাংলা সমালোচনায়—সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রভাবেই—কবির চেয়ে কাব্যকে বড়ো মানা হয়েছে। আধুনিক ইওরোপীয়

চিন্তায় কাব্যের পরম গুণ নৈর্ব্যক্তিকতা, সমালোচনার মহৎ লক্ষ্য কবির চেয়ে কাব্যে চিত্ত নিযুক্ত করা, আর এই চিন্তা ও এই লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও সাহিত্যালোচনায় পুনঃপুনঃ কথিত হয়েছে, অলঙ্কার-শাস্ত্রেও এই মনোভঙ্গীই জয়যুক্ত। এই সঙ্গে আরো দেখতে পাই, বহু শতাব্দীর আলোচনার পরে আজ ইওরোপীয় নন্দনতত্ত্বে রসবোধকে বড়ো মানা হচ্ছে, কাব্যপাঠকের (অথবা কাব্যশ্রোতার) চিত্তে যে সংবেদনার উদ্ভব হয় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান (রিচার্ড্‌স্‌, এম্‌প্‌সন্‌ প্রমুখ তাত্ত্বিকের আলোচনা স্মর্তব্য) করা হচ্ছে, অর্থাৎ রসবোধকে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। রসবেত্তার দিকে প্রধান লক্ষ্য ছিল অলঙ্কার-শাস্ত্রীরও, যদিও সেকালকার মনোবিজ্ঞান ছিল অনেক বিষয়েই অসম্পূর্ণ।

এ সকল মূল চিন্তাধারায় বাংলা সমালোচনার স্বকীয়তা নিঃসংশয়। এসব চিন্তাধারা ঐতিহ্যসম্মত, আবার বাংলা সমালোচকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। এই চিন্তাধারা যে সঙ্কীর্ণ অর্থে স্থানকাল শাসিত নয়, এদের মধ্যে শাশ্বত সত্য নিহিত, তার প্রমাণ এই চিন্তাধারার সঙ্গে সমকালীন ইওরোপীয় চিন্তাধারার নিশ্বাসপ্রশ্বাস তুল্যতায়। আসলে বাংলা সমালোচনার স্বকীয়তা আত্মসমর্পণের পথেও নয়, অবরোধের পথেও নয়; ধর্মান্তরে নয়, শিলীভূত সংস্কার-বন্দনেও নয়; বাঁধন-ছেঁড়া অগ্রগমনে নয়, রোমন্থনরত স্থবিরতায় নয়। এই সংতুলিত মধ্যপন্থাই বাংলা স্বকীয় সমালোচনার পথ।

সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য সমালোচনা

(১)

সাহিত্যের ইতিহাসে ও সমালোচনায় কোনো সম্পর্ক আছে কি? ইতিহাসকারকে কি ইতিহাস-রচনার জন্যই সমালোচক বলব? সাহিত্যকর্মের মূল্য কি তার ঐতিহাসিক মূল্যের সঙ্গে জড়িত অথবা বলব যে যদিও ইতিহাসকার ও সমালোচক একই বস্তুতে নিবদ্ধদৃষ্টি তথাপি তাঁদের কর্মতত্ত্ব, চিন্তাভঙ্গী ও বিচারপদ্ধতি স্বতন্ত্র, সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসে ও সমালোচনায় কোনো সম্পর্ক নেই?

এ-প্রশ্নের উদ্ভব সাহিত্যের ভারতীয় ঐতিহ্যে নিহিত নয়, ইওরোপীয় সাহিত্যেও মাত্র দুই তিন শতক যাবৎ সমালোচনার সঙ্গে ইতিহাস মিশেছে আর রেনেসাঁসের পূর্বে এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। ভারতীয় সাহিত্যে আলঙ্কারিক ও টীকাকারের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবিষ্ট ছিল কাব্যবস্তুটিতে, কাব্যের বাহিরে কোনো মূল্য থাকে কিনা সে কথায় তাঁদের কৌতূহল ছিল না। কবির জীবনীর সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কী সে বিষয় তাঁদের আলোচ্য নয়, কোনো কবিকর্ম পূর্বজ এবং পরবর্তী অন্যান্য কবিকর্মের সঙ্গে একযোগে কেমনধারা ইতিহাস রচনা করেছে সে প্রশ্নও তাঁদের নয়। বস্তুত, না বৈদিক যুগে না ধ্রুপদী যুগে, ভারতীয় মানস ব্যক্তিসত্তার মানদণ্ডে শিল্পের মূল্য নিরূপণ করেনি। গ্রীকো-রোমান সভ্যতায় ট্যাসিটাস্, হেরোডোটাস্ প্রমুখ ইতিহাসবিৎ সম্ভব ছিলেন, ইস্‌লামী জগতের ইব্‌ন্ খাল্‌দুন্‌কে তো আর্নল্ড টয়নবি বলেছেন প্রতিভাধর ইতিহাসতাত্ত্বিক। ভারতে তদনুরূপ মনীষী কেউ ছিলেন না। কাশ্মীরী কহ্লন কাহিনীকথনে যতটা পটু ছিলেন ইতিহাসের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে তদনুরূপ নিপুণচিন্তার অধিকারী ছিলেন না, ইতিহাসকে তরঙ্গপ্রবাহ ব'লে মেনেছিলেন কিন্তু প্রবাহের মধ্যে কোনো দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান করেন নি। সুতরাং ভারতীয় শিল্পতত্ত্বে প্রখর ইতিহাস-চেতনা নেই, ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রী কখনো ইতিহাসশাস্ত্রীর দৃষ্টিতে কাব্যের বিচার করেন নি। পক্ষান্তরে ইওরোপীয় কাব্যপাঠক সতেরো আঠারো শতক থেকে, বিশেষত উনিশ শতক থেকে, ক্রমেই সাহিত্যকর্মের ইতিহাসে উৎসুক হ'তে থাকলেন,

কাব্যবিশেষ অধ্যয়নে যে-সুখ উপভোগ করলেন, তারই সঙ্গে পুঞ্জীভূত কাব্যের কালানুক্রমিক বিবর্তন আলোচনায়ও তৃপ্তি পেলেন। সৃষ্টি হ'ল নতুন বিদ্যার, সাহিত্যের ইতিহাসের। অনেক গ্রন্থ প্রস্তুত হ'ল, বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎতুল্য জ্ঞানচর্চা-কেন্দ্রগুলিতে এই বিদ্যার অনুশীলন ও চর্চা হ'তে থাকল, ক্রমে সাহিত্যের পঠনপাঠন এমন প্রবলভাবে ইতিহাসপন্থী হ'য়ে পড়ল যে সাহিত্য-অধ্যয়নের প্রকট উদ্দেশ্য হ'ল সাহিত্যকর্মের শিল্পগুণ অনুধাবন করা নয়, তার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। স্টাডি অব্ লিটরেচর্ হ'য়ে দাঁড়াল স্টাডি অব্ দি হিস্‌টরি অব্ লিটরেচর্। সাহিত্যের অধ্যাপকের মহৎ গুণ হ'ল শিল্প-সংবেদনা নয়, 'স্কলারশিপ্', যার এই বিশেষ উল্লেখে মানে হ'ল সাহিত্যকর্মের চতুষ্পার্শ্বস্থ নানারকম তথ্যসংগ্রহ। একটি ইংরেজি বাক্‌সমষ্টির অনুসরণে বলতে পারি, গাছগাছালি এত বেশি হয়েছে যে অরণ্যের সমগ্র রূপ আর দর্শনসাধ্য নেই।

সাহিত্যের ইতিহাসের, লিটারেরি হিস্‌টরির এই প্রচণ্ড অভিঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্লিষ্ট হয়েছে বহুযুগ-অনুসৃত, গতানুগতিক সাহিত্য-সমালোচনা। বিদ্যায়তনে পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা বেড়ে যাওয়ার ফলে সমালোচনা-কর্মের স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি ক্ষীণপ্রাণ হ'য়ে গেল, সমালোচনা কোনো ক্রমে সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়ে, পরধর্মে স্বধর্ম মিশিয়ে দিয়ে যা হোক ক'রে আত্মরক্ষা করল। বস্তুত আজকের দিনে জনপ্রিয় কয়েকটি সমালোচনা পদ্ধতির কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে সমালোচনা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ইতিহাস চর্চার অনুযায়ী। সমালোচনার এক পদ্ধতিতে কবির জীবনচরিত মস্ত এক আলোচ্য বিষয়, জীবনচরিতের পরিপ্রেক্ষিতে (অর্থাৎ মানুষটির সম্পূর্ণ জীবনপ্রবাহের যে কয়টি তরঙ্গ আমাদের জ্ঞানসাধ্য তার হিসাবে) বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলির ও সমগ্র কাব্যধারার মূল্যায়ন চেষ্টা। যতক্ষণ না জানছি মার্গেরিতে ছিলেন বাস্তবিক কোন্ মেয়েটি যাঁর উদ্দেশে ম্যাথিউ আর্নল্ড কয়েকটি সুন্দর কবিতা রচনা করেছিলেন, যতক্ষণ না গ্যোটে ও বায়রণের প্রত্যেক প্রণয়িনী বিষয়ক যাবতীয় তথ্য সঞ্চয় করতে পারছি অথবা কীট্‌স্-এর মৃত্যুর পরে ফ্যানি ব্রন্-এর কী গতি হ'ল সে বিষয়ে সংবাদ লাভ হচ্ছে, অনেক সাহিত্যপাঠকের বিশ্বাসে ততক্ষণ আমাদের সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য অসম্পূর্ণ থেকে সমালোচনা-কর্মের প্রস্তুতি দৃঢ় হচ্ছে না।

অক্‌সফোর্ডের অধ্যাপক বেইট্‌সন্ ফলাও ক'রে বলেছেন যে টেনিসন্-এর 'ইন্ মেমরিঅম' পড়ার পরে তাঁর মনে নিয়ত এক প্রশ্ন জাগছে, কবি-ভগ্নী এমিলি টেনিসন্ যে আর্থার হ্যালাম-এর স্মৃতি বুকে নিয়ে বাকি জীবন কাটাননি বরং বিয়ে থাওয়া ক'রে দিব্যি ঘরসংসার বেঁধেছিলেন সে কারণে কবি কি ভগ্নীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন? এসব বিভ্রান্ত সাহিত্যপাঠকের বেলায় দৃষ্টিকোণের কিঞ্চিৎ প্রভেদে, মূল্যবোধের সামান্য হেরফেরে, সমালোচনা কর্ম পরাস্ত হয় জীবন-চারিত্রিক কৌতূহলের কাছে। প্রস্তুতি হয় মুখ্য কর্ম আর পরিণতি গৌণ। সাহিত্যের ইতিহাসের কাছে সাহিত্য-সমালোচনার এহেন পরাজয় অন্যান্য বিচার পদ্ধতিতেও অজ্ঞাত নয়। আর্টিফ্যাক্ট অথবা শিল্পবস্তুটির সামাজিক পরিবেশ নিয়ে যখন আলোচনা করি, এবং সাহিত্য কর্মের উৎস খুঁজি সমাজ জীবনে; অথবা শিল্পে আধৃত চিন্তা ও ভাবগুলিকে যখন চিন্তাজগতের অনুরূপ ভাব ও চিন্তার প্রবহমান ধারার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করি, অর্থাৎ ইদানীং হিস্‌টরি অব আইডিয়াস্ নামে যে নূতন বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে তার অংশ হিসাবে আলোচনা করি; যে সব বাক্‌প্রতিমা ও কল্পনা আধেয় হয়েছে শিল্পটির আধারে, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসে তাদের আদি মধ্য পরিণতি কোথায় সে বিষয়ে গবেষণা করি; এমন কি 'বিশুদ্ধ' শৈল্পিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে শিল্পবস্তুটির উদ্ভব কোন্ ঘটনায় বা ঘটনাবলীতে, তার 'ফর্ম' বা শিল্পরূপের ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত হই, অনুরূপ অন্যান্য শিল্পকর্মের তুলনায় আলোচ্য শিল্পটি কী পরিমাণ প্রভাবশালী অথবা প্রভাবগ্রাহী, এসব দূরপ্রসারী বিষয়ের অনুসন্ধানে শিল্পবস্তু থেকে ক্রমেই দূরে সরে' পড়ি—তখন সর্বক্ষেত্রেই সমালোচনার পণ্ডিতী পারিপার্শ্বিকের কাছে সমালোচনার সার উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'য়ে পড়ে।

(২)

ইতিহাস ইওরোপীয় চিন্তায় চিরকালই প্রভাবশালী। সাহিত্য-আলোচনায় আরিস্‌টট্‌লের কালেও ইতিহাস চেতনা বর্তমান ছিল। আরিস্‌টট্‌লের 'পোয়েটিক্‌স্' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ইতিহাস-চেতনার সাক্ষ্য। তবুও নানা-কারণে আঠারো শতকেই ফরাসী এন্‌সাইক্লোপিডিস্‌ট নামক পণ্ডিত গোষ্ঠীর

প্রবর্তনায় ইতিহাস সম্বন্ধে উৎসাহ ও উদ্যমের নবপর্যায় শুরু হ'ল। ইংরেজি ভাষায় গিবন্-এর বিশাল ও মহৎ ইতিহাস রচিত হ'ল, উনিশ শতকে দশ বারোজন এমন ইতিহাসবিদের উদ্ভব হ'ল যাঁদের তথ্যভাণ্ডার তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির তুলনায় কম সমৃদ্ধ ছিল না। ইতিহাস মানে কি শুধুই তথ্যপঞ্জী, না তথ্য-স্তূপের ভিত্তিতে কোনো দার্শনিক তত্ত্ব বিদ্যমান, সে-বিষয়ে কৌতূহলী হ'লেন অনেকে, আর ১৭২৫ সনে জিয়ামবাটিস্টা ভিকো'র 'সিয়েন্‌ৎসা ন্যুয়োভা' রচিত হওয়ার পরে উনিশ শতকে অন্তত দু'জন মহৎ দার্শনিক ইতিহাস-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, হেগেল ও কার্ল্ মার্ক্স্। ইতিহাস অবশ্য সময়চেতন দার্শনিকের চিত্তে দোলা লাগিয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। এককালে হেরাক্লিটাস্ বুঝেছিলেন যে নদীর চূর্ণিত তরঙ্গগুলি স্বতন্ত্র নয়, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের অঙ্গীভূত, Space and Time এর অন্তর্গত, মহাকালের স্থান ও কালশাসিত অংশমাত্র। উপনিষৎকার একদা মহাকালের সর্বব্যাপী নিরতিক্রমতার স্তুতিগান করেছিলেন ও মহাকালকেই জগৎনিয়ন্তা জ্ঞান করেছিলেন. আর সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ চেয়েছে ইতিহাসে প্যাটার্ন খুঁজতে। ইতিহাস মানে কি কেবল কালানুক্রমী তথ্যপুঞ্জ; না তথ্যরাজির মধ্যে কোনো বিশিষ্ট ছাঁদ? ইবন্ খাল্‌দুন্, হেগেল, মার্ক্স্, স্পেংলার, ক্রোচে, টয়ন্‌বি, সবাই মূলত একই সন্ধানে নিরত—বিভিন্ন ঘটনা সমাবেশের অন্তর্লীন ঐক্যের বা ছাঁদের সন্ধান। ইতিহাস চক্রবৃত্ত হোক, কম্বুরেখ হোক, প্রবহরেখ হোক, ইতিহাসের একটা মানে আছে, এ বিশ্বাসে পশ্চিম জগতে বারংবার ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা, পুনর্বিন্যাস, পুনরালোচনা হচ্ছে, হচ্ছে সমগ্র ইতিহাসের গতির, আর সেই সঙ্গে ধর্মীয় অর্থনৈতিক সাহিত্যিক প্রভৃতি আংশিক ইতিহাসের গতির। ইংরেজি সাহিত্যে আঠারো শতকে টমাস্ ওয়র্টন্ সাহিত্যের সুষ্ঠু ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তাঁর পরে আরো অনেক মনীষী পণ্ডিত এ কাজে হাত দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় সাহিত্যের ইতিহাস-রচনা তো মাত্র সেদিন শুরু হয়েছে।

ইতিহাসবিদ্‌গণ যেমন তথ্যপুঞ্জের মধ্যে নানারকম ছাঁদ দেখতে পান, সাহিত্যের ইতিহাসকারগণও (আমি এই মুহূর্তে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের কথাই ভাবছি কারণ লিটেরারি হিস্‌টরি হিসাবে শ্রেষ্ঠ ইতিবৃত্তগুলি ইংরেজি সাহিত্য নিয়েই লেখা হয়েছে) তেমনি সাহিত্যতথ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিন্যাস,

বিভিন্ন নিয়ম দেখতে পেয়েছেন অথবা দেখতে চেয়েছেন। কার্লাইল এবিষয়ে প্রণিধানযোগ্য উক্তি করেছিলেন :

The history of a nation's poetry is the essence of its history, political, scientific, religious. With all these the complete Historian of Poetry will be familiar: the national physiognomy, in its finest traits, and through its successive stages of growth, will be clear to him; he will discern the grand spiritual tendency of every period, which was the highest Aim and Enthusiasm of mankind in each, and how one epoch evolved in itself from the other.

(কোনো জাতির কাব্যের ইতিহাস সে-জাতির রাজনৈতিক, বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়, ধর্মীয় ইতিহাসের সার কথা। কাব্যের নিখুঁত ইতিহাসবিৎ এই সমস্ত তথ্যের সঙ্গে সুপরিচিত থাকবেন। তিনি জানবেন জাতীয় সত্তার শ্রেষ্ঠ অঙ্গগুলি কি ভাবে পর্যায়ের পরে পর্যায়ে বেড়ে উঠেছে। প্রত্যেক যুগের মহৎ অধ্যাত্মপ্রবণতাগুলিতে মানবের তুঙ্গতম উদ্দেশ্য ও উৎসাহ কি ভাবে প্রকট হয়েছে, কি ভাবে এক যুগ থেকে বিবর্তিত হয়েছে অন্য যুগে, একথাও তিনি জানবেন।)

কার্লাইল সাহিত্যের মধ্যে খুঁজেছিলেন জাতির অধ্যাত্মরূপ। জড়বাদী সমাজবিজ্ঞানীর মানদণ্ড হ'ল অন্যরকম :

The methods of production in material life determine the general character of the social, political, and spiritual processes of life. It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness.

(জড়বাস্তব জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতি দিয়েই জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক প্রগতি নিরূপিত হয়। মানুষের চেতনায় তার অস্তিত্ব নির্ধারিত হয় না, বরং তার সমাজ জীবনেই তার চেতনা নির্ধারিত হয়।)

In every historical epoch, the prevailing mode of economic production and exchange, and the social organization

necessarily following from it, form the basis upon which is built up and from which alone can be explained, the political and intellectual history of that epoch.

(প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগের ভিত্তিতে সেই যুগের অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টনপদ্ধতি বিদ্যমান এবং কেবল এই পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতেই সেই যুগের রাজনৈতিক ও মানসিক ইতিহাসের ব্যাখ্যা হ'তে পারে।)

মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌সের দু'টি উক্তি। উক্তিগুলির দার্শনিক গ্রাহ্যতা আমার বিচার্য নয়, আমার পক্ষে আপাতত একথাই যথেষ্ট যে এসব উক্তি বহুলোকের কাছে গ্রাহ্য, অনেক বিচক্ষণ, সংবেদনশীল, অভিজ্ঞ লোকের কাছে গ্রাহ্য। আমি শুধু এইটুকু লক্ষ্য করছি যে কার্লাইল যেখানে সাহিত্যের মুল্য বিচার করেছিলেন জাতীয় অধ্যাত্মজীবনের কষ্টিপাথরে, মার্ক্‌স্‌ সেখানে বিচার করেছেন জড়পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। বিচারের মান পৃথক হওয়ার দরুণ নিশ্চয় সমাজব্যবস্থার তারতম্য হবে প্রচণ্ড কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বের সীমিত স্বার্থের বিচারে দুই মতবাদে খুব প্রভেদ নেই, দুই মতবাদেই সাহিত্যবস্তুটির বাহিরে যাওয়া হয়েছে তার মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে। বস্তুত, শুধু এই দুই মতবাদ নয়, আরো যে সব মতবাদ প্রচলিত আছে (সেগুলির বর্ণনা এ-প্রবন্ধের এলাকায় নয়), সেগুলিও সাহিত্যের বিচার করে থাকে সাহিত্যের বহিঃস্থিত ঘটনা বা অবস্থা বা আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে।

(৩)

যদিচ সাহিত্যবিচারে সাহিত্যাতিরিক্ত মাপকাঠির আমদানি হয়, তা ব'লেই কি সাহিত্যপাঠের ইতিহাসানুগ পদ্ধতি বাতিল হ'য়ে যাবে? যেহেতু ইতিহাস তথ্যের মধ্যে ছাঁদ খোঁজে (যে-ইতিহাস নেহাৎ তথ্যের নিরর্থক সমষ্টিমাত্র তা'র কথা বলছিনা); যেহেতু সাহিত্যের ইতিহাসও বিশেষ প্রত্যয়ে নির্ভরশীল হ'য়ে সাহিত্যের তথ্যাবলীর ব্যাখ্যা করে (অথবা ইতিহাসকার যদি তীক্ষ্ণ বিবেকের অধিকারী হন তিনি হয়তো বলবেন যে গোড়ায় প্রত্যয় নয়, তথ্যই গোড়ায় ; তিনি শুধু নিরাসক্ত ভাবে তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছেন, সেই সংগ্রহের ফলেই অন্তর্নিহিত ঐক্যের ছাঁদ স্বতোজ্জ্বল হয়েছে) ; যেহেতু সাহিত্যের ইতিহাস সাহিত্যকর্মের মধ্যে

মূলত শিল্পপ্রাণ খোঁজে না, খোঁজে জীবন-চারিত্রিক অথবা ধর্মীয় অথবা সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য্য, real estimate ছেড়ে historical estimate-এ গুরুত্ব আরোপ করে, সে জন্য কি বলব যে সমালোচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক? আমার বিচারে এমন কথা বলা সঙ্গত হবে না। আধুনিক সমালোচনায় তিনটি চিহ্ন সর্বস্বীকৃত: (১) সমালোচনা আসলে মূল্যায়ন; (২) মূল্যায়ন মানেই কোনো থিওরির, কোনো ভাবমৈত্রী জ্ঞানের আলোকসম্পাতে মূল্য বিচার; (৩) সমালোচকের সমূহ উদ্দেশ্য সমালোচনার মাধ্যমে বিশেষ ধরণের সদসৎ জ্ঞানের প্রচার। সাহিত্যের ইতিহাসও এক হিসাবে মূল্য নিরূপণ করে, গুণবিচার করে। লেখক ও লেখা শ্রেণীনিবদ্ধ হয়, প্রশস্ত গুণচিহ্নিত হয়, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে লেখাটির লাভ ক্ষতি বিবেচিত হয়। অতএব সাহিত্যের ইতিহাস একপ্রকার সমালোচনা বৈ কি!

অন্য অর্থেও ইতিহাস সমালোচনার নিকট প্রতিবেশী। সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যকর্মের পটভূমি ব্যাখ্যাত হয় আর তার ফলে সমালোচকের উপভোগ এবং মূল্যায়ন হয় তথ্যানুগ, সদ্বিবেকী, সমনস্ক্রিয়। শিল্পকর্মের জটিল পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সমালোচনা শিথিল আপ্ত বাক্যে পর্য্যবসিত হতে পারে। অর্ধশতাব্দী পূর্বে 'অ্যাপ্রিসিয়েশন', 'ইম্প্রেশনিষ্টিক্ ক্রিটিসিজ্ম্' নামে যে আপ্তবাক্যনির্ভর সাহিত্যালোচনা প্রচলিত ছিল তার অন্তঃসারলঘুতা ইদানীংকার আলোচনায় ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে ইতিহাসের সহযোগিতায়। ইতিহাসজ্ঞানে সমালোচনার বলিষ্ঠতা।

(৪)

সাহিত্যের ইতিহাস একপ্রকার সমালোচনা এ কথা বলার সময় কথাটির সীমিতসিদ্ধতা স্মরণ রাখা দরকার। সৎ সমালোচনায় শিল্পের মানদণ্ডে সাহিত্যের বিচার হয়। ইতিহাস মূল্যায়নশীল বটে কিন্তু ইতিহাসের মানদণ্ড মূলত (এমন কি গৌণত) শৈল্পিক নয়। ঐতিহ্যের ও পারিপার্শ্বিকের সন্ধানে ইতিহাসবিৎ আর্টিফ্যাক্ট অর্থাৎ শিল্পবস্তু থেকে দূরে চলে যান। সাহিত্যপাঠে ছায়াকে কায়া ব'লে জ্ঞান করার কিছু আশঙ্কা আছে, উপরে প্রথম অনুচ্ছেদের শেষভাগে তার আভাস দিয়েছি। ইতিহাস তো অন্তিম বিচারে সমালোচনার

প্রকরণ মাত্র, অনেক প্রকরণের একটি মাত্র, কিন্তু ঐতিহাসিক পণ্ডিতীয়ানা গ্রন্থকীট-সমালোচকের চারিদিকে ঊর্ণনাভের এমন জাল বুনতে পারে যে শিল্পবস্তু তাঁর দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়, শিল্পবহির্ভূত অন্যান্য বিষয়েই তাঁর মনোযোগ আবদ্ধ থাকে। (এ-উক্তির সমর্থনে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব। ইতালীয় অধ্যাপক মারিও প্রাজ্-এর 'দ্য রোমাণ্টিক অ্যাগনি' বইখানায় পশ্চিম ইওরোপীয় সাহিত্যের ও সংস্কৃতির কতকগুলি জটিলসম্পৃক্ত, সাধারণের অগোচর ভাবনা ও আচরণ বিশ্লেষিত হয়েছে। এযাবৎ তাঁর বিশ্লেষণে কেউ ভুল দেখান নি, অতএব মেনে নেওয়া যায় যে তাঁর বর্ণিত ভাবনা ও আচরণগুলি ইতিহাসসম্মত। ইতিহাসসম্মত হ'তে বাধা নেই কিন্তু এক্ষেত্রে অধ্যাপক প্রাজ্-এর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে ইতিহাসের ধূসর আলোকে। কতকগুলি সদ্য-আবিষ্কৃত তথ্যের উন্মাদনায় তথ্যেরও অধিক যে শিল্পগৌরব তার কথা ভুলে গেছেন। তাঁর তথ্যে ধারণা জন্মায় যে বোদ্‌লেয়র, স্যুইনবর্ণ, দা'ন্নুন্‌ৎসিও প্রভৃতি কবিরা নেহাৎই নিউরটিক অথবা রোগপীড়িত এবং অবৈধ অভ্যাসতাড়িত হতভাগ্য ছিলেন, তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যাবলী এইসব লেখকদের কবিত্বশক্তির চিন্তনে আমাদের প্রবুদ্ধ করে না। কিন্তু যেহেতু কাব্যপাঠকের কাছে কাব্যই প্রথম ও প্রধান সত্য, ইতিহাস গৌণ, ইতিহাস বিচারসহায়ক ভৃত্য মাত্র, সেজন্য অধ্যাপক প্রাজ্-এর প্রমাণস্ফীত ইতিবৃত্তের চেয়ে বোদ্‌লেয়র ও স্যুইনবর্ণের কাব্য উজ্জ্বলতর ও মহত্তর।)

অতএব সাহিত্যের ইতিহাস সমালোচনারই মতো মূল্যায়নশীল হ'লেও তার মূল্যমান আলাদা, সুতরাং খুব সতর্ক বিচারে ইতিহাসকে সমালোচনার সমার্থ করা সঙ্গত হবে না বরং বলব সমালোচনার বহু পদ্ধতির মধ্যে একটি-মাত্র পদ্ধতি ইতিহাসে।

বস্তুত এক জায়গায় (সমালোচনার গভীরতম ক্ষেত্রে) সমালোচনার ধর্ম ইতিহাসের ধর্ম থেকে নিতান্তই পৃথক। ইতিহাস বর্ণনা করে এককাল থেকে কালান্তরে গতির। ইতিহাসে ধ্রুব নক্ষত্রের স্থান নেই, নক্ষত্রেরা নিয়ত ধাবমান। ইতিহাস স্থিতবিন্দু মানে না, নির্বিকল্পের ধ্যানে প্রত্যয়ী নয়। ইতিহাসে অচঞ্চল কোনো মানদণ্ড নেই যা' যুগ থেকে যুগে, অসংখ্য ঘটনার অরণ্যে নিষ্কম্প মূল্যায়নে প্রযুক্ত হবে। যেহেতু ইতিহাস-চিন্তার প্রধান

উপজীব্য পরিবর্তন, পরিবর্তন না থাকলে ইতিহাসও থাকে না, সে জন্য ইতিহাসের মূল্যমানও পরিবর্তনশীল, আপেক্ষিক। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যমান একাধিক। পাঁচজন কবিকেই মহৎ বললাম কিন্তু আলাদা কারণে, আলাদা আলাদা বাটখারায় ওজন ক'রে। ইতিহাসে মহত্ত্বের ধারণাও আপেক্ষিক। নিছক ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর যুগের প্রধান কবি, মোহিত মজুমদার নিজ যুগের দ্বিতীয় সারির কবি। অপরপক্ষে শৈল্পিক দৃষ্টিতে মোহিত মজুমদারে ও ঈশ্বর গুপ্তে আসমানজমিন দূরত্ব।

ইতিহাস যদি পরিবর্তনশীল, তাহ'লে শিল্পের নিগূঢ় প্রাণরস অস্থির ঘূর্ণ্যমান চক্রের কেন্দ্রস্থায়ী স্থিতবিন্দুতে। যেন ধাবমান ক্ষিপ্র কাল রাশি রাশি তরঙ্গ নিয়ে পাশ দিয়ে চলেছে, আর স্থিরনেত্র মহাকাল পরম ধ্রুবের ধ্যানে সমাসীন!

শিল্পের শাশ্বত রূপ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের দু'টি উক্তি স্মরণ যোগ্য:

এই যে শিল্পের মোটামুটি জাতিবিভাগ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঘটেছে, সেই দিক দিয়ে শিল্পচর্চা করে' দেখার মানে হ'ল শিল্পের ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে একেবারে বাইরে-বাইরে পরিচয়। আর-এক দিক দিয়ে পরিচয়—সে হল রসের দিক দিয়ে, সেখানে জাতিবিভাগ ঐতিহাসিক রহস্য ইত্যাদি না হলেও কাজ চলে যায়।...... এই যে রসের প্রাধান্য এই নিয়ে জগতের তাবৎ শিল্প এবং এই নিয়ে যা' শিল্প নয় তা' যে সম্পূর্ণ আলাদা তা'ও প্রমাণিত হয় রসিকদের কাছে।

(বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী, ১৮৬ পৃ:)

শিল্প হ'ল এক জিনিষ যা সর্বদেশে সর্বকালে সমান।

(বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী, ১৬১ পৃ:)

যেহেতু শিল্পের ধ্যানবস্তু পরম-অপরিবর্তনীয়, নির্বিকল্প, সে জন্য শিল্প-সমালোচনায় প্রকরণের যত বৈচিত্র থাকুক না কেন, তার চরম লক্ষ্য ধ্যানীশিল্পের রসাস্বাদ, তার মূল্যমানও এই পরম-অপরিবর্তনীয় ধ্যানরসে অভিষিক্ত। সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সমালোচনার এখানেই চরম প্রভেদ। ইতিহাসের কিছু পদ্ধতি সমালোচনায় গ্রাহ্য হতে পারে, ইতিহাস

নিজেও হয়তো অংশত সমালোচনার মতোই মূল্যায়নশীল কিন্তু সাহিত্য-ইতিহাসের মূল্যমান আপেক্ষিক, অ-স্থিতকেন্দ্র, অপর পক্ষে সাহিত্য-সমালোচনার মূল্যমান ধ্রুব, ধ্যানসাধ্য। ইতিহাস বাহনমাত্র, সাহিত্য-সমালোচনার অনেক বাহনের একটি, এই বাহনটি নিত্যপ্রয়োজনীয়। যখন প্রয়োজনীয় হবে তখনও এই বাহনের অথবা সমালোচনার অন্য কোনো পদ্ধতির নিয়ত লক্ষ্য হবে শিল্পের পবিত্র সম্বোধি লাভ।

সমালোচনার পদ্ধতি

প্রথম প্রস্তাব : ভাষাভিত্তিক বিচার

(১)

সাহিত্যালোচনা নিপুণ কর্ম। যাবতীয় নিপুণ কর্মের মতোই সমালোচনাতেও হাতিয়ারের দরকার। আকস্মিক দৈবী প্রেরণায় কাব্যরচনা যদি-বা সম্ভব, সমালোচনা নয়। সমালোচনার শক্তি মার্জিত, শিক্ষিত, পরিশীলিত। সমালোচকের প্রতিপত্তি তাঁর রুচির ঐশ্বর্যে।

সমালোচনার ক্রমবিকাশের প্রারম্ভিক ও চূড়ান্ত পর্যায়ে হাতিয়ার ছাড়াই কাজ চালানো যায়, কেননা আখেরে সমালোচনার কাজ মূল্যনিরূপণ। কোনো ছবি দেখে যখন বলি, "রঙের চমৎকার সমাবেশ!" অথবা সেতারের বাজনা শুনে বলি, "বড়োই করুণ সুর!" তখনই ছবির বা সুরের গুণ গ্রহণ করলাম আর সে-গুণগ্রাহিতা আমার মূল্যনিরূপণশক্তির পরিচায়ক। আমি যে সমালোচ্য শিল্পের গুণগ্রহণ করতে পেরেছি, তাতে প্রমাণ হয় যে আমার রসবোধ আছে। যাঁর রসবোধ আদৌ পরিশীলিত নয় শুধুই সহজাত, যিনি নন্দনতত্ত্বে ও সমালোচনাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন নি, তিনি আপন শিল্পানুভূতির বিশ্লেষণ করতে পারেন না বটে, কিন্তু তাঁর অনুভূতিটি অলীক বা অগ্রাহ্য নয়। অপরপক্ষে যিনি শিক্ষিত, যাঁর মার্জিত রসবোধ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণেও পটু, তিনিও সমস্ত বিচারের অবশেষে অমল অনুভূতিতে উপনীত হন, তখন তাঁর একটিমাত্রই কথা—এই কবিতায় আমার আবেগ উদ্বুদ্ধ হয়েছে। সে-আবেগের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা তিনি যদি না-ও করেন, আমরা তাঁর অনুভূতি মেনে নিই, কেননা তাঁর রুচি নির্ভরযোগ্য, এই রুচি অর্জিত হয়েছে কত দীর্ঘ পরিশীলনের ফলে, সে-কথার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

অতএব নিছক তারিফ, অ্যাপ্রিসিয়েশন্‌, যদি শুনতে চাই, তাহলে হয়তো শিক্ষিত ও স্বভাবরসিকে বিশেষ প্রভেদ করার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শুধু সহজাত রসবোধ-জ্ঞাপনে সমালোচনা-কর্ম সীমিত নয়। যে-নিপুণতা সাহিত্যালোচনার গোড়ার কথা, তা'তে গুণগ্রাহিতা ও মূল্যায়ন দুই-ই তথ্যানুগ ও যুক্তিসম্মত। সাহিত্যালোচনা (নিছক তারিফের কথা বলছি না)

আসলে মানসিক শাসন, ইন্‌টেলেকচুয়াল ডিসিপ্লিন্। সার্থক সমালোচনায় গুণগ্রাহিতার ভাবালু উচ্ছাস নেই, তার মূল্যায়ন আপ্তবাক্যে সাঙ্গ নয়। সহজাত গুণগ্রাহিতা প্রশংসনীয় সম্পদ বটে, কিন্তু প্রশিক্ষিত রসবোধের সঙ্গে তার প্রভেদ কোথায় সে-বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার। সহজ প্রবৃত্তিতে যে-বস্তু মনে হ'তে পারে কর্কশ, সে-বস্তু সংস্কৃতিবান্ রুচিতেও পীড়াদায়ক হ'তে পারে, শেষ পর্যন্ত উভয়েরই রসসিদ্ধান্ত অভিন্ন, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি ও সংস্কৃতিবান রুচির বিচার-পদ্ধতিতে প্রভেদের দরুন বিচারের মর্যাদাও ভিন্নস্তরী।

প্রশিক্ষিত বিচার-পদ্ধতির প্রয়োজন কেন?

বলা যেতে পারে যে রসের প্রকাশ অসংখ্য। শিল্পী যতজন, শিল্পবেত্তা যতজন, শিল্পের রসগুণও ততই বহুসংখ্যক। আমরা অহরহ দেখতে পাই যে বিভিন্ন গুণগ্রাহীর কাছে একই শিল্পের আবেদন বিভিন্ন প্রকারের। যে কোনো শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আমার ভালোলাগা আর আপনার ও অপরের ভালোলাগা হুবহু এক হয় না, সূক্ষ্ম প্রভেদ কিছু না কিছু থেকে যাবেই। আর তা-ই যদি হয়, প্রতি গুণগ্রাহীর সংবেদনা ও মানদণ্ড যদি স্বতন্ত্র হয়, তাহ'লে যাবতীয় বিচারের সর্বগ্রাহ্য মানদণ্ড পাওয়া যাবে কেমন ক'রে? অতএব সমালোচনার কোনো নির্বিশেষ নিয়ম থাকতে পারে না। প্রতিটি শিল্পবোধ নিজস্ব নিয়মে প্রতিষ্ঠিত।—কিন্তু এ-যুক্তি যথার্থ নয়। এ-যুক্তিতে নৈরাজ্যধর্মী রসগ্রাহিতার সহজ প্রবৃত্তি মানা হয়েছে, কিন্তু মানা হয়নি যে আপ্তবাক্যের পিচ্ছিল ভিত্তিতে সার্থক সমালোচনা নির্মিত নয়। সমালোচনা সব হিসাবেই সংস্কৃতিবান, মননশীল কর্ম। সে-জন্য মার্জিতরুচি সমালোচক "যত লোক তত গুণ" এই সহজিয়া পথ ছেড়ে মনস্ক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন শিল্পসৃষ্টিগুলির মধ্যে খুঁজবেন যুগপৎ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত গুণ, বিচার করবেন একই শিল্পসৃষ্টি কি উপায়ে একক শক্তি ও ব্যাপক শক্তি এ-দু'য়ের সংঘাতে ও সংযোগে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। এই বিচারে প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টি একক ও স্বয়ম্ভূ অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। দেখা যায় প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টি বহিরঙ্গে বা অন্তরঙ্গে কোনো-না-কোনো genre-এর পর্যায়ে পড়েছে, কোনো-না-কোনো সাধারণ গুণান্বিত জাতি বা বর্ণভুক্ত। সমালোচকের বিচার যখন অতদূর অবধি পৌঁছয় তখন বিশেষ শিল্পসৃষ্টিটিকে তা'র সাধারণ জাতি বা

বর্গের নিখুঁত পরম রূপের সঙ্গে তুলনা সম্ভব হয়। সেই তুলনাতেই মূল্যায়ন। যে-বস্তু নিতান্তই একক, তার তুলনা নেই, মূল্যও নেই। সমালোচকের বিচারে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি নিঃসঙ্গ নয়, বরং বর্গধর্মী, সুতরাং তা'র বিশ্লেষণ চলে, তা'র মূল্যায়ন সম্ভব। শিল্পসৃষ্টির মূল প্রেরণা যে-পরিমাণেই স্বকীয় ও ব্যক্তিত্ব-নির্ভর হোক না কেন, শিল্প-সমালোচনা নিঃসন্দেহে সমষ্টি-সচেতন, যুক্তি-পরায়ণ কর্ম। অতএব যদি-বা স্বভাব কবি সম্ভব, স্বভাব সমালোচক অলীক। যেহেতু সমালোচনা অতীব নিপুণ মনস্ক্রিয়া, সেজন্য সমালোচনার সৌষ্ঠব, মর্যাদা ও গ্রাহ্যতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে তা'র পদ্ধতির উপরে।

(২)

বাংলা সমালোচনা বয়সে নবীন, কীর্তিতে অপ্রচুর। বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজি, তথা ইওরোপীয় সাহিত্যের সৃজনী অভিঘাতের অন্যতম ফল বাংলা সমালোচনা। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ভাষায় সমালোচনা ছিল না ; এই শতাব্দীতে যখন কাব্যে উপন্যাসে নাটকে গদ্যে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল তা'র পরেই হ'ল বাংলা সমালোচনার শুরু। গোড়ায় সৃষ্টিকর্ম, পরে সে-কর্মের মূল্যায়ন, এটাই স্বাভাবিক। আজ অবধি বাংলা সমালোচনার ভাণ্ডারে পাই কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, সাহিত্যের ধর্ম বা রূপ-বিষয়ক কয়েকটি গভীর ভাবয়িত্রী আলোচনা, বিশেষ-বিশেষ গ্রন্থ বা লেখক সম্বন্ধে দূরস্পর্শী বিশ্লেষণ, বিশেষ কোনো যুগ বা সাহিত্যধারা সম্বন্ধে মননশীল বিচার। কোনো কোনো সাময়িকপত্রের গ্রন্থালোচনাও বিদেশী সাময়িকপত্রের অনুরূপ আলোচনার চেয়ে আদৌ নিকৃষ্ট নয়। এতৎসত্ত্বেও বলতে হবে যে সাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসাবে সমালোচনার যে-নিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হওয়া আকাঙ্ক্ষ্য, বাংলা সমালোচনায় তা' হয়নি আজ অবধি। মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে উপরোক্ত আলোচনাগুলির অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন, খণ্ড আলোচনা মাত্র, সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক পদ্ধতিনিষ্ঠ আলোচনা নয়। বাংলা সমালোচনার কোনো নিজস্ব ধারা নেই যেমন আছে বিদেশী সাহিত্যে, এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যেও। সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে বাংলা সমালোচনার পদ্ধতিগত অনগ্রসরতা। যে-পদ্ধতিতে

বাংলা সমালোচনা লেখা হ'ত উনিশ শতকের শেষার্ধে, সেই একই পদ্ধতির রোমন্থন চলেছে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। আজকের সমালোচনা সত্তর বৎসর পূর্বের সমালোচনার চেয়ে হয়তো কিয়ৎ পরিমাণে অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও বিশ্লেষণপন্থী, কিন্তু মূলত আলোচনার চরিত্র থেকে গেছে একই—বিশেষণাঙ্কিত আপ্তবাক্যের সমষ্টি। সত্তর বৎসর পূর্বে বাঙালী সমালোচক ভিক্টরীয় ইংরেজ সমালোচকের অনুকরণে যে-সব studies in appreciation লিখতেন এখনকার সমালোচকও তা-ই লেখেন। প্রথম সমরোত্তর বাংলা সাহিত্য নানা দিকে নূতন আঙ্গিকের অভিসারী, যেমন কাব্যে তেমনিই কথাসাহিত্যে, অথচ সমালোচনা সে-অনুপাতে আদৌ নব্যপন্থী নয়। বর্তমানে বাংলার মৌল সাহিত্য ও সমালোচনা সাহিত্য চলছে বেমিল কদমে, আর এই অসঙ্গতির ফল না একের পক্ষে না অপরের পক্ষে ভালো।

জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো সাহিত্য-সমালোচনা এ-শতাব্দীতে আশ্চর্যরকম কুশলী ও দায়িত্বসম্পন্ন কর্মে পরিণত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ও পরে অনুশীলিত ইওরোপীয় সাহিত্যের দিকে নজর দিলে বোঝা যায় আধুনিক সমালোচনার পদ্ধতি কতটা বদলে গেছে! ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে বাঙালী ছাত্রমহলে জনপ্রিয় ইংরেজ সমালোচক ছিলেন ম্যাথিউ আর্নল্ড, ব্র্যাড্‌লি, সেইন্ট্‌স্‌বেরি, স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক্, ওয়াল্টার র‍লে: আজকের ছাত্ররা পড়েন এলিয়ট, উইল্‌সন্ নাইট্, ক্লিয়ন্থ ব্রুক্‌স্, এম্‌প্‌সন্, লীভিস্, হয়তো কড্‌ওয়েল বা কড্‌ওয়েলপন্থী নব্যতর লেখক। (বলা প্রয়োজন যে কেবল উদাহরণ দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য, তালিকা দেওয়া নয়।) সেদিনকার সমালোচনায় আর চল্‌তি সমালোচনায় পার্থক্য চমৎকারী, সমালোচনার পরিবর্তন সুস্পষ্ট। অবশ্য পরিবর্তন মাত্রেই উন্নয়ন নয়, বিশেষত সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়। আধুনিক সমালোচকের পদ্ধতি অভিনব বলেই তাঁকে হ্যাজ্‌লিট্ বা সাঁৎ বোভ্-এর চেয়ে মহত্তর সমালোচক বলবো এ কোনো কথা নয়, কেননা হ্যাজ্‌লিট্ বা সাঁৎ বোভ্ তাঁদের সাধ্য পদ্ধতির সাহায্যেই লাভ করেছিলেন রুচির সেই বৈদগ্ধ্য, সেই মূল্যায়ন ক্ষমতা যা নবপদ্ধতিজ্ঞানী আধুনিক সমালোচকেরও কাম্য। সমালোচকের পক্ষে তাহ'লে বিচার পদ্ধতিটা পরম সত্য নয়, কিন্তু যেহেতু যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টাতেই পদ্ধতি কালোপযোগী হওয়া দরকার নতুবা সত্যানুসন্ধান বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, সেজন্য

বাঙালী সমালোচকের পক্ষে আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অনবহিত থাকা শোচনীয়। কোনো এক কালে নাপিতের নরুণ ছিল শল্যচিকিৎসার হাতিয়ার, সেটা নরুণের দোষ নয়, সে-হাতিয়ারে নিশ্চয় অনেকের রোগমুক্তিও হয়েছে। তবুও আজকের কোনো প্রকৃতিস্থ সার্জন অবশ্যই সে-হাতিয়ার ব্যবহার করবেন না। টেক্‌নিকের সঙ্গে সমাজ-বিবর্তনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, এ কথা যেমন অর্থনৈতিক উৎপাদনের বেলায় সত্য, মননক্রিয়াতেও তেমনি অধিকাংশে গ্রাহ্য। অতএব সমালোচনায় নব্যপদ্ধতি-অবলম্বন বাঙালী সমালোচকের পক্ষে ফ্যাশান নয়, প্রয়োজন। বাঙালী সমালোচকের হাতিয়ার বাড়াতে হবে। তাঁর তূণীরে বাণ হবে বহুসংখ্যক, কালোপযোগী। সুশিক্ষিত সমালোচনায় একাধিক পদ্ধতি একই সঙ্গে অনুসৃত হ'তে পারে, আর অন্য যে-সব পদ্ধতির ব্যবহার ক্ষেত্রবিশেষে হ'ল না সেগুলি সম্বন্ধেও প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি থাকা কাম্য। তা হ'লেই বাংলা সমালোচনা এমন ঐশ্বর্যময় মনস্ক্রিয়াতে রূপান্তরিত হবে যার প্রভাব শিল্পসৃষ্টিপরায়ণ সাহিত্যের উপরে নিশ্চয় শুভ হবে। বাংলা সমালোচনাও creative criticism হ'তে পারে।

সমালোচনার আধুনিক পদ্ধতি কত প্রকার, সমালোচনার উদ্দেশ্য কী, সিদ্ধি কোথায়—এ-আলোচনায় বস্তুত সমগ্র ইস্থেটিক্‌স্ শাস্ত্রের আলোচনা এসে পড়ে। সে-আলোচনা জটিল, বহুবিস্তৃত, সম্ভবত আমার সাধ্যাতীত। বর্তমান প্রবন্ধগুচ্ছের পরিধি সুস্পষ্ট ও সীমাবদ্ধ। বাংলা সমালোচনায় নব্য পদ্ধতি অবলম্বনের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করার পরে আমি এমন কয়েকটি সমালোচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই যা' বিশেষভাবেই বিশ শতকী পদ্ধতি, যে-সব পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যবিচারে উজ্জ্বলভাবে অবলম্বিত হ'তে পারে।

এ-স্থলে আরেকটি কথারও উল্লেখ হওয়া দরকার। আধুনিক সমালোচনার কোনো কোনো পদ্ধতি বিশিষ্ট জীবনদর্শন এবং চিন্তাভঙ্গী থেকে উদ্ভূত। এ-সব পদ্ধতিকে নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হ'লে এদের দার্শনিক উৎসের সঙ্গেও প্রবুদ্ধ পরিচয় থাকা আবশ্যক। আধুনিক সমালোচকের জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্র দূরপ্রসারী না হ'লে চলবে না, কেননা তাঁর দায়িত্বও বিরাট।

(৩)

সাহিত্য-সমালোচনার একটি নবাপদ্ধতির প্রস্তাব এখানে করা যাক।

সাহিত্যশিল্পের মাধ্যম ভাষা, যেমন কিনা ধ্বনি সংগীতশিল্পের মাধ্যম, একথা সুপরিচিত সত্য। সাহিত্যশিল্পের আলোচনায় সর্বাগ্রে অবহিত হ'তে হবে ভাষা সম্বন্ধে। বিশেষত যখন সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে চিন্তা করি, যুগে-যুগে সাহিত্যের শিল্পরূপ ও প্রকাশভঙ্গী কি কারণে ও কোন্ পন্থায় স্বকীয়তা অর্জন করে সে-বিষয়ের অনুধাবন করি, তখন অন্য পাঁচটি কারণের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে প্রতি যুগে সে-ভাষার পরিবর্তন ও বিবর্তনের উপরে। বাংলা ভাষায় যে-কাব্য সম্ভব, ব্রাহুই ভাষায় অবশ্য তা' সম্ভব নয়, কেননা বাংলা ভাষার তুলনায় শেষোক্ত ভাষার প্রকাশক্ষমতা অকিঞ্চিৎকর। প্রত্যেক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তার ভাষার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অনুসারী। এর পরে একই ভাষার কথা ভাবা যাক। রবীন্দ্রনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীতে অথবা শেক্স্পিয়র পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মালে যদিচ শক্তিশালী কবিপ্রতিভার পরিচয় দিতে পারতেন, তাঁদের কাব্যের প্রকাশভঙ্গী ও বচনকারু—সুতরাং সার্বিক মূল্য—অবশ্যই ভিন্ন রকমের হ'ত। যে-আধুনিক কবির কল্পনা প্রধানত চিত্রল তাঁর পক্ষে অন্য এক যুগের পরিবেশে কাব্যরচনা, যদি সম্ভব হ'ত তা হ'লেও অবশ্য তাঁর কল্পনা স্বকীয় মৌলিক ধর্ম পালন করতো কিন্তু তাঁর চিত্ররচনার বাচনকারু নিশ্চয় সেই অপর যুগের ভাষা-রীতির অনুসরণ করতো। ভাষা কত রকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে তা'র প্রাণবান বেগে, তা'র ভাণ্ডারে আসে কত নূতন শব্দ, কত শব্দই না লোপ পায়। তা'র শব্দার্থে, তা'র ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে, তা'র বাক্যরীতিতে কত আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে যুগে-যুগে! এ সমস্ত পরিবর্তনের ছাপ পাওয়া যায় লিখিত সাহিত্যে। ভাষাভিত্তিক সাহিত্যপাঠে তথ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সূক্ষ্ম রসজ্ঞান। ইংরেজ কবি পোপ্-এর কবিতা প'ড়ে জানতে পারি tea শব্দটির উচ্চারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিল 'টে'। তথ্য হিসাবে এটি অতি তুচ্ছ কিন্তু এই উদাহরণ থেকে অনুমান করতে পারি চীনে ভাষা-মালয়-ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় আমদানি হ'য়ে শব্দটি প্রথমে tay পরে teaতে পরিণত হয়েছিল, বুঝতে পারি কেন সে যুগে tea শব্দটির সঙ্গে 'এ'-স্বরান্ত শব্দের মিল হ'ত পদ্যে, আরো বুঝতে পারি চা-প্রিয়তা

সে যুগের চীন-প্রিয়তারই অন্যতম সূচনা ছিল। অ্যান্‌ড্রিউ মার্ভল্‌-এর একটি শ্লোক দেখুন :

My vegetable love would grow
Vaster than empires and more slow.

এখানে vegetable শব্দটির আধুনিক অর্থ গ্রহণ করলে শব্দটির বিশেষণ-শক্তি প্রায় হাস্যকর মনে হবে, অথচ যখন ভাষাবিৎ স্মরণ করিয়ে দেন যে সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক এই শব্দটিতে বুঝতেন আমরা আজ যা বুঝি vegetative বলতে, তখন শব্দটিতে প্রাণপ্রচুর শক্তির ব্যঞ্জনা পাই আর কবির কল্পনা ও সুষ্ঠ ভাষার সাযুজ্যবোধে আমাদের সংবেদনা অদ্ভুতভাবে আলোড়িত হয়। মার্ভ্‌ল অন্যত্র তাঁর Coy Mistress-এর উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতায় বিশেষণটি যে-অর্থে প্রয়োগ করেছেন শব্দটির সে-অর্থ পাওয়া যাবে না চসর্‌-এর প্রায়রেস্‌ সম্পর্কিত লাইনে : 'That of hir smylyng was ful symple and coy'। শব্দার্থের মতো বাক্‌ভঙ্গীও বদলায়। উক্ত প্রায়রেস সম্বন্ধে যে-বর্ণনা পড়ি, 'And peyned hire to countrefete cheere', তার মানে এ নয় যে আমুদেপনা প্রদর্শন করতে ভদ্রমহিলার কষ্ট হ'ত। চসর্‌-এর And peyned hire আধুনিক ইংরেজিতে She took pains to counterfeit এই বাক্‌ভঙ্গী গ্রহণ করেছে। কাব্যপাঠের জটিল আনন্দে এ-সমস্ত তুচ্ছ ও বৃহৎ ভাষারূপেরও অংশ আছে। যুগসম্মত উচ্চারণ, ব্যাকরণ ও শব্দরূপের সঙ্গে কাব্যের মাধুর্য অবিচ্ছেদ্য রকমে জড়িত। চসর্‌-এর কয়েকটি ছত্র দেখুন :

Allas, myn hertes queene! allas, my wyf!
Myn hertes lady, endere of my lyf!
What is this world, what asketh men to have?
Now with his love, now in his colde grave
Allone, withouten any compaignye.

মৃত্যুপথযাত্রী আর্কিটের এই উক্তিটিতে, বিশেষত শেষ ছত্রটিতে, হাউস্‌ম্যানের মতে, ইংরেজি কাব্যের সর্বাধিক মর্মস্পর্শী বেদনা ফুটে উঠেছে। এই বেদনাপ্রকাশের বাচনিক রূপের মূলে আছে আধুনিক without শব্দটির মধ্য-যুগীয় রূপ ও company শব্দটির মধ্যযুগীয় চার-অক্ষরী ভিন্ন ঝোঁকযুক্ত ধ্বনি।

কাব্যের প্রায়-অনির্বচনীয় প্রায়-অবিশ্লেষণীয় যে-মাধুর্যে আমাদের

শিল্পান্বেষী চিত্ত আনন্দ লাভ করে সে-মাধুর্য মুখ্যত ভাষা-নির্ভর। প্রত্যেক সার্থক কবির ভাষাপ্রয়োগে স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট, প্রত্যেক কবি—তথা, সাহিত্যস্রষ্টা—তাঁর বিশিষ্ট শব্দপ্রয়োগে ভাষাকে অগ্রগত ক'রে দেন একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে প্রত্যেক সাহিত্যিকের স্বকীয়তা সমসাময়িক ভাষার গুণাবলীর ভিত্তিতেই নির্মিত। সাহিত্যিকের হাতে সমসাময়িক ভাষা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা পায় সন্দেহ নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বায়রণের ভাষা ও শেলি বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষা বিভিন্ন, একের বাচনভঙ্গী আদৌ অপরের মতো নয়। বাচনভঙ্গীর এই স্বকীয়তার যথাযোগ্য কদর হওয়া দরকার, কেননা এই স্বকীয়তার বলেই শেলি শেলি, বায়রণ বায়রণ। কিন্তু কোন্ মুহূর্তে কবির শব্দযোজনা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হ'ল তা বুঝতে হবে সে-পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে রয়েছে সমসাময়িক সমাজের সাধারণ ভাষা-প্রয়োগ-রীতি ও শব্দযোজনা। প্রত্যেক কাব্যসৃষ্টির মাধ্যমেই টানাপোড়েনের মতো দুটি বাচন-প্রণালীর অভিব্যক্তি—একটি স্বকীয়, অপরটি সাধারণবাচন।

এ কথা মেনে নিলে দেখতে পাব যে সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্যিক দৃষ্টিতে, প্রধানত ভাষা-বিবর্তনের ইতিহাস। প্রত্যেক যুগের সাহিত্যিক প্রকৃতিতে আর ভাষারূপে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। যেন একই কম্পাসের দু'টি কাঁটা। ভাষার ক্রমবিকাশের সূত্রধারা যাঁর জ্ঞানমর্মে প্রবেশ করে নি তিনি সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা করতে পারেন না। তাঁর রচনায় ইতিহাস কেবলমাত্র কতকগুলি সাল-তারিখের সমষ্টি, কতকগুলি গ্রন্থপঞ্জী, গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার, বড় জোর গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে কতকগুলি ভালোমন্দ মতের সমাবেশ। তিনি সাহিত্যকে সাহিত্যের শিল্পমাধ্যমের সংযোগে ভাবতে পারেননি, তাঁর মতামতগুলি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সংবেদনার প্রকাশমাত্র, যুক্তিসম্মত জ্ঞানসমৃদ্ধ নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ নয়। ভাষা ও সাহিত্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সচেতন আলোচনা ইদানীং ইওরোপীয় রচনায় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে। জনৈক ইংরেজ সমালোচক দেখিয়েছেন যে এলিজাবেথীয় সাহিত্যের দুর্বার প্রাণশক্তি, অষ্টাদশ শতকী অগাস্টানদের পরিচ্ছন্ন যুক্তি-প্রবল চিন্তাভঙ্গী, ভিক্টরীয় লেখকদের উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ ঐ সব যুগের ইংরেজি ভাষার বিশেষ-বিশেষ অবস্থান্তরের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। অনুরূপ ভাষা-সচেতন সমালোচনা-পদ্ধতিতে দেখানো

যেতে পারে যে ভারতচন্দ্রের বা ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা একদিকে যেমন তাঁদের সমসাময়িক বাচনভঙ্গীর ভিত্তিতে নির্মিত—তাঁদের ভাষাপ্রয়োগ কোনক্রমেই তৎকালীন সাধারণ বাক্‌রীতি থেকে দূরে সরেনি—অপর পক্ষে তাঁদের লেখনরীতি আবার সমসাময়িক বাচনভঙ্গীকে অগ্রগত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বিস্তীর্ণ কাব্যের সূচনায় ও পরিণতিতে বাচনভঙ্গীর যে-প্রভেদ লক্ষ্য করি তা কি নিতান্তই কবির ব্যক্তিত্ব-বিবর্তনের ফল, না সে-প্রভেদের পিছনে আছে অর্ধশতাব্দীব্যাপী বাংলা ভাষার সাধারণ পরিবর্তন? এই সেদিনও নবীন বাঙালী কবির ভাষায় ছিল সত্যেন দত্তর বাচনভঙ্গী, "সোনার তরী"—"পূরবী" পর্যায়ের ভাষাপ্রয়োগ-রীতি, আর গত ত্রিশ বছরে নবীন কবির ভাষা বদ্‌লে গেছে আশ্চর্য রকমে। এ-পরিবর্তন কি নেহাতই ক্ষণস্থায়ী ফ্যাশান, কৃত্রিম ঢং না এ-ও সমসাময়িক সাধারণ বাংলা বাক্‌রীতির অনুষঙ্গী?

এ-সব প্রশ্ন সাহিত্য সমালোচনায় আসা প্রয়োজন কিন্তু এ-সব প্রশ্নের উত্তর সমালোচক সম্যকভাবে দিতে পারেননা যতক্ষণ-না তিনি শিক্ষিত ভাষাবিদের সাহায্য পান অথবা নিজেই চতুর ভাষাজ্ঞানের অধিকারী হন। কিন্তু ভাষার ইতিহাস ব্যাপকতর সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র, ভাষার বিবর্তন সমাজ বিবর্তনের অংশ, কেননা ভাষা সমাজ-জীবনের মূল্যবান অঙ্গ। ভাষার বিবর্তন অতি জটিল বিষয়। বাংলা ভাষাবিদের কর্মপথে বিঘ্নও প্রায় দুস্তর। তাঁর অধ্যয়ন ইতিহাস-গবেষকের অধ্যয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইংরেজি ভাষাবিৎ ও ইংরেজি ঐতিহাসিক নিবিড়ভাবে পরস্পরের সাহায্য নিয়ে থাকেন, বিশেষত যখন তাঁরা প্রাচীন ইংরেজজীবনের অধ্যয়নে নিযুক্ত। অ্যাংলো-স্যাক্‌সন্‌-সাহিত্যের আলোচক হাত মেলাচ্ছেন অ্যাংলো-স্যাক্‌সন্‌ ভাষাবিদের সঙ্গে, আবার ভাষাবিদের সহকর্মী প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক। অধুনা কোনো মনস্ক্রিয়াই স্বয়ংসিদ্ধ নয়; বিংশ শতাব্দীতে প্রত্যেক বিদ্যাচর্চা এতই বিশেষীকৃত হ'য়ে পড়েছে যে কোনো বিদ্বানের পক্ষেই নিজস্ব গণ্ডী ছাড়িয়ে অপর গণ্ডীর পরিচয় নিতে হ'লে সেই অপর গণ্ডীর বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া চলে না। এই পরস্পরনির্ভরতা, আমার বিশ্বাসে, বিদ্যাচর্চার পক্ষে শুভ। বিদ্যাচর্চা এখন সমবায় কর্ম, নিভৃতে একক সাধনা নয়। আর সর্বক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের প্রামাণ্য মতামত মিলছে ব'লেই যে-ক্ষেত্রে একাধিক বিদ্যার সমবায় চর্চা আবশ্যক, সে-ক্ষেত্রে সে-সংযুক্ত বিদ্যাচর্চার

সিদ্ধান্তগুলি বৈজ্ঞানিক সত্যসমৃদ্ধ ব'লে গণ্য হবে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক সেদিন পর্যন্তও স্বীয় প্রয়োজনে অপর বিদ্যার গণ্ডীতে যেতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত সে-সব গণ্ডীতে বিচরণ করেছেন ব'লে তাঁর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হয়েছে পল্লবগ্রাহী, অগভীর। তবুও তাঁর চেষ্টার প্রশংসা করা যায়, করা যায় না অন্য ঐতিহাসিকের প্রয়াসের, যাঁর ইতিহাসে সাহিত্যের বিস্তৃত পরিবেশ একেবারেই অনুল্লিখিত। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের সমালোচক, বাংলা ভাষাবিৎ, বাংলা নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পরস্পরের গবেষণানির্ভর হ'লে, বিশেষত সাহিত্যালোচক পারিপার্শ্বিক অন্য বিদ্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হ'লে, অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যালোচনা অবশ্যই খাঁটি মনস্ক্রিয়ার সম্মান পাবে।

আধুনিক সমালোচনার একটি পদ্ধতির আভাস দেওয়া গেল—ভাষা-বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের আলোচনা এ-পদ্ধতির লক্ষ্য। বাংলা সমালোচনায়, আমার বিশ্বাসে, এ-পদ্ধতির সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু সমালোচকের মনে রাখতে হবে যে এ-পদ্ধতিও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয় বা সাহিত্যালোচনার সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। কোন্ ক্ষেত্রে এ-পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ হ'তে পারে তা সদ্বিচারী সমালোচকের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে। ভাষাভিত্তিক সাহিত্যালোচনা আলোচকের তূণীরস্থিত বহুসংখ্যক বাণের একটি মাত্র।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : শৈলীবিচার

(১)

ভাষা-বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের আলোচনা হওয়া দরকার, একথা এই প্রবন্ধমালার প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি এককতা-উত্তীর্ণ বর্গধর্মী, নিতান্তই একক ও স্বয়ম্ভু কর্ম নয়। কিন্তু এ কথাও সত্য যে প্রত্যেক শিল্পেরই অন্তস্তলে যে-অতুলনীয় অনন্যতা, যে-সূক্ষ্ম এককতা বর্তমান, তার মর্ম অবিদিত থাকলে সমালোচনা হ'য়ে পড়বে অসম্পূর্ণ, অসংবেদী। সাহিত্যকর্ম যে-পরিমাণে গোষ্ঠীচিত্ত ও সামাজিক প্রকাশভঙ্গীর নিদর্শন সে-পরিমাণেই ব্যক্তিনির্ভর অনন্য মানসের বাচনিক রূপ।

প্রত্যেক সাহিত্যকর্মে গোষ্ঠীমানসের ও ব্যক্তিমানসের জটিল সম্মেলন ঘটে, আর এ-মিলনে দুই মানসের কার কতখানি অংশ, সে-বিচার অতীব দুরূহ, সর্বক্ষেত্রে সম্ভবও নয়। গোষ্ঠীমানসের বিশ্লেষণ হ'তে পারে ঐতিহাসিক ও ভাষাভিত্তিক আলোচনায়, সে-বিশ্লেষণ প্রধানত সমাজতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতি-তাত্ত্বিক আলোচনা। অপর পক্ষে ব্যক্তিমানসের অনুসরণ ও অনুপ্রবেশ বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক অথবা মনস্তাত্ত্বিক বিচারের অন্তর্গত। সাহিত্যের—তথা মানবজীবনের —কোনো কর্ম বা অনুভূতি-ই পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ নয়। পূর্ণ বিশুদ্ধি কৈবল্যের নামান্তর, যে-কৈবল্যে বিদেহী প্রজ্ঞা জড় সম্বন্ধের অতীতে চ'লে যায়। জীবনের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি অভিজ্ঞতা বিচিত্র ও জটিল অন্যান্য সম্বন্ধে সম্পৃক্ত। অতএব জ্ঞানী সমালোচক কোনোকালেই এমন কথা বলবেন না যে কোনো বিশেষ সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে কেবলমাত্র সমাজতাত্ত্বিক অথবা কেবলমাত্র নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা গ্রাহ্য, কেননা উভয় তত্ত্বই সম্পূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টিতে জড়িয়ে আছে। তবে সমালোচক এতদূর বলতে পারেন যে কোনো সৃষ্টির রসোপলব্ধিতে (অতএব সমালোচনায়) ইতিহাস অথবা নন্দনতত্ত্ব প্রধান উপাদান, সুতরাং আলোচ্য বস্তু। 'বিশুদ্ধ' নন্দন-তাত্ত্বিক আলোচনা বলতে আমরা এই আপেক্ষিক বিশুদ্ধতা বুঝব।

৫ সাহিত্যসৃষ্টির অনন্য শক্তির অনুধাবন করতে হ'লেও সমালোচনা প্রধানত ভাষাভিত্তিক হবে। শিল্পভাবনা যখন বাক্ময় রূপ নেয় তখনই সাহিত্যের সৃষ্টি। বর্ণময় বা ধ্বনিময় রূপ গ্রহণ করলে শিল্প ভাবনা বিমূর্ত হয় চিত্রকলায় অথবা সঙ্গীতকলায়। বাক্যেই সাহিত্যের অঙ্গ অথবা বলতে পারি বাক্যই সাহিত্যশিল্পের প্রতীক। সার্থকনামা কবির হাতে ব্যবহারজীর্ণ অসাড় ভাষা নূতন সৌন্দর্য, দীপ্ত জীবন লাভ করে। কীট্‌সের ছত্রটি স্মরণ করুন :

Now more than ever seems it rich to die

অতি সাধারণ শব্দ rich, সর্বজনবোধ্য, অথচ এ-ছত্রে শব্দটি অকল্পিতপূর্ব ভাবদ্যোতনা লাভ করেছে, সে-দ্যোতনা এর সামান্য অভিধাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে গেছে। আরো কয়েকটি ছত্র লক্ষ্য করা যাক :

(রবীন্দ্রনাথ) হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে

* * *

এল তোমার পথের সাথী বিপুল অট্টহাসে।

(রবীন্দ্রনাথ) উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন্ গুচ্ছ
(রবীন্দ্রনাথ) বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ
(বুদ্ধদেব) হবো অপরূপ অপরাহ্ণের নদী
(বুদ্ধদেব) আমি অপেক্ষা করতে পারতুম তোমার জন্য :
তলোয়ারের মতো দীর্ঘ দীপ্ত দিন
(জীবনানন্দ) গাছের শাখার জালে এলোমেলো আঁধারের মত
(অজিত দত্ত) যদিও আজের মতো শুক্লা সন্ধ্যা নিষ্ফলা, অথবা
(সমর সেন) দীর্ঘ দিনে করাল রৌদ্র নির্মম ঐশ্বর্য বিলায়
(সুভাষ মুখোপাধ্যায়) গলিতনখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস

এ সব উদাহরণেই প্রযুক্ত বিশেষণগুলি অপ্রত্যাশিত বিলম্বিত অর্থ বহন করেছে, আর এই প্রত্যাশাতীত বাচনিক শক্তি কবির শিল্পগৌরবের অন্যতম হেতু। প্রত্যেক সার্থক কবির ভাষাপ্রয়োগে সৎ শিল্পভাবনার নিঃসংশয় স্বাক্ষর পাওয়া যায়, সে ভাষাপ্রয়োগের সুসম্বদ্ধ বিশ্লেষণ আধুনিক সাহিত্যালোচনার একটি উজ্জ্বল পদ্ধতি।

(২)

কাব্যের ভাষা নিয়ে আলোচনা অবশ্য আধুনিক সমালোচকের আবিষ্কার নয়। সম্ভবত যেদিন থেকে মানুষ কাব্যশ্রুতির আনন্দকে বিশ্লেষণ করেছে সেদিন থেকেই তার নজর এদিকে গেছে। আরিস্‌টট্‌লের "পোয়েটিক্‌স্" ও "রেটরিক্" গ্রন্থ দুইটিতে "ডিক্‌শন্"-এর বিচার আছে। লাটিন সাহিত্যে ও প্রাক্-রেনেসাঁস্ ইটালীয় সাহিত্যে রেটরিক্-চর্চা বিশাল ব্যাপকতা লাভ করেছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যের ভাষা-আলোচনা রীতিমত শাস্ত্রের মর্যাদা পেয়েছিল, বিশেষত কাশ্মীরী আলঙ্কারিকদের সূক্ষ্ম-শ্রেণীকৃত বিশ্লেষণ শাণিত মননশক্তির আশ্চর্য নিদর্শন। আধুনিক ইওরোপীয় সমালোচনায় প্রবর্তিত হয়েছে নূতন ধরনের "রেটরিক্"-বিচার। ইংরেজ সমালোচক রিচার্ড্‌স্ এই নব্য পন্থায় অগ্রগণ্য, অন্যান্য দেশের অনেক সমালোচক—বিশেষত আমেরিকায় যাঁরা "নিউ ক্রিটিক্‌স্" এ-আখ্যা পেয়েছেন—সাহিত্যের অলঙ্কার সম্পর্কে পুনরায় উদ্যমশীল যদিও

এঁদের সকলেই রিচার্ড্‌সের মত অনুসরণ করছেন না। এই নব্য অলঙ্কারশাস্ত্র এ-যুগের একটি বিখ্যাত দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে প্রেরণা পেয়েছে। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক মুর্‌-প্রবর্তিত "লজিক্যাল পজিটিভিজ্‌ম্" এ-সমালোচনার মূল উৎস। এই দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে মিলেছে আরো কয়েকটি আধুনিক জ্ঞান, নৃতত্ত্বের ও মনস্তত্ত্বের কতকগুলি ধারণা আর সেই সঙ্গে এই ঐতিহাসিক বোধ যে ভাবাতীত প্রত্যয়কে ভাষায় রূপান্তরিত করার চেষ্টায় মানুষ বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রতীকী বচনের আশ্রয় নিয়েছে। কুইন্টিলিয়ানের ও রিচার্ড্‌সের রেটরিক্‌-সংক্রান্ত গ্রন্থ দুইটির তুলনা করলে বোঝা যায় ভাষালঙ্কার সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ কতখানি। গ্রীকো-রোমান অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাগ্মিতা চর্চা, শ্রোতার চিত্তে কোন্‌ ধরনের প্রভাব স্থাপন ক'রতে হ'লে কোন্‌ বিশেষ বাক্যালঙ্কার প্রয়োগ করা সঙ্গত এ-আলোচনাতেই আরিস্‌টটল্‌ থেকে সিসেরো হ'য়ে কুইন্টিলিয়ান অবধি বিশ্লেষণকারিগণ নিযুক্ত ছিলেন। গ্রীকো-রোমান আলঙ্কারিকদের তুলনায় সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা ছিলেন কম উপযোগবাদী অথচ অধিকতর রসবেত্তা কেননা তাঁরা বাক্যালঙ্কারকে প্রধানত বাগ্মিতার সহায়ক মাত্র জ্ঞান না ক'রে, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌" এ-নীতির অনুসরণে, বাক্যনিহিত রসের বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছিলেন। সংস্কৃত অলঙ্কার সূক্ষ্ম শ্রেণীকারী বিশ্লেষণের এবং পূর্বকালীন মনোবিদ্যার আশ্চর্য উদাহরণ বটে, তবুও, চরম বিচারে, সংস্কৃত অলঙ্কার ও গ্রীকো-রোমান অলঙ্কার অভিন্নমূল্য, কেননা উভয়ের দৃষ্টিই বাক্যের প্রভাবে নিবদ্ধ, অলঙ্কৃত বাক্যকে মেনে নিয়ে শ্রোতার চিত্তে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণে নিযুক্ত, অর্থাৎ এই দুই অলঙ্কার শাস্ত্রই শ্রোতার দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যকে দেখেছে। এ-দৃষ্টিকোণ অতি সঙ্গত ও মূল্যবান দৃষ্টিকোণ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক সমালোচক এ-দৃষ্টিকোণে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তিনি চেয়েছেন শ্রোতাকে ছাড়িয়ে, বাক্যোত্তীর্ণ হ'য়ে, বাক্যের অন্তঃস্তলে যে সৃজনীশক্তি বর্তমান তার সন্ধান করতে। স্থূল কথা, বলা যায় যে গ্রীকো-রোমান ও সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা আরিস্‌টট্‌ল-পন্থী, বস্তুবাদী, অপর পক্ষে আধুনিক আলঙ্কারিক প্লেটো-পন্থী, ভাববাদী। মূল উদ্দেশ্যের এই প্রভেদের দরুন যদিচ আধুনিক সমালোচক পূর্বসূরীর মতোই বাক্যবিচারী তবুও তাঁকে

আলঙ্কারিক না বলে শৈলীবিৎ বলা সঙ্গত হবে। শুধু রেটরিক্ নয়, ব্যাপকতর স্টাইলিস্‌টিক্‌স্ আধুনিক সমালোচকের সন্ধান। স্টাইল শব্দটির যথাযথ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নেই—অধুনা 'শৈলী' শব্দটিতে এর অর্থবহতা আরোপিত হচ্ছে—তাতেও কিছুটা প্রমাণ হয় যে এতকাল আমরা যে পরিমাণে অলঙ্কারের, তথা সাহিত্যের, বহিরঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা করেছি সে-পরিমাণে তার গূঢ়, মায়াময় সৃজনীশক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিনি।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে স্টাইলিস্‌টিক্‌স্ বা শৈলীশাস্ত্র ও এ-শাস্ত্রের প্রণালী-সম্মত সাহিত্যবিচার আধুনিক সমালোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু স্টাইল বা শৈলী বলতে আমরা কী বুঝব? সাহিত্যের কোন্ বস্তু আমাদের বিচার্য, আর সে-বিচারের প্রণালী ও পদ্ধতি কী?

এ-স্থলে আবার বলা প্রয়োজন যে সাহিত্যের শিল্পরূপ একটি অখণ্ড সত্তা, অতএব সৎ সমালোচকের আসল সন্ধানবস্তু সে-অখণ্ড সত্তা। যে-সমালোচনায় শিল্পরূপের অংশবিশেষ আলোচিত হয়, সাহিত্যের বিষয়বস্তু বা ছন্দোরূপ বা বাক্‌প্রণালী বা অন্য কোনো অঙ্গ মাত্র বিশ্লেষিত হয়, সে-সমালোচনা খণ্ডিত সত্য মাত্র। মহৎ শিল্প যেমন সুডোল পূর্ণতাধন্য, মহৎ সমালোচনাও তেমনি পূর্ণতা-সচেতন। এই পূর্ণতা-চেতনার একটি মাত্র উপাদান হিসাবেই শৈলীজ্ঞানের মূল্য, অতএব শৈলী-বিচারী সমালোচনা-পদ্ধতি পরম পদ্ধতি নয়; কোনো একটিমাত্র পদ্ধতি-ই পরম নয়, বিশেষ খণ্ডিত প্রণালী মাত্র। এ-প্রণালীর উদ্দেশ্য বাক্য-বিচার দ্বারা বাক্যের উৎস যে শিল্পভাবনা তার নিকটবর্তী হওয়া।

(৩)

শিল্পভাবনার মূর্ত রূপ শৈলীতে, আর শৈলীর সংজ্ঞার্থ বহুবস্তুজ্ঞাপক। আলাদা-আলাদা শব্দ, শব্দ-সমাবেশ, শব্দের অর্থ ও ধ্বনি, যোজিত শব্দের দৃশ্য ও শ্রুতিরূপ, শব্দের ইমেজ্ বা বাকপ্রতিমা, তার প্রতীকী অর্থ, বহুস্তরে বিন্যস্ত অথবা সুস্পষ্ট ঋজু অর্থ, তার সেন্‌সুয়াস বা ইন্দ্রিয়বেদী দ্যোতনা, ভাবনাধর্মিতা বা অনুভূতিধর্মিতা, সংক্ষেপে ভাষার অবয়বী ও আন্তর সম্পর্ক, এর সমস্তই শৈলীবিচারের অন্তর্গত।

বাঙলা কাব্যের আলোচনায় আজ অবধি শব্দপ্রয়োগের বিচার সুষ্ঠুভাবে হয়নি। কোনো কোনো কবির বিশেষ শব্দ-আসক্তি, হয়তো প্রায় মুদ্রাদোষই লক্ষিত হয়েছে কিন্তু প্রণালীসম্মত পদ্ধতিতে তার বিচার হয়নি। মোহিতলালের "মৃত্যু ও নচিকেতা" ও "নূরজহান ও জহাঙ্গীর" কবিতা দু'টিতে শব্দসম্ভারের উপাদানেই প্রভেদ। প্রথমটিতে তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের প্রাধান্য, এমন কয়েকটি শব্দ আছে যা বাঙলা কাব্যে ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়নি। দ্বিতীয়টিতে বিদেশী উপাদানের প্রাবল্য। বক্তারা মোগল ছিলেন অথবা ঔপনিষদিক পুরুষ ছিলেন, শুধু এই ছেলেমানুষি কারণে কবি নিশ্চয় একক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের ও অপরক্ষেত্রে ফার্সী শব্দের আশ্রয় নেননি। এ-স্থলে শব্দকোষের প্রভেদ সার্বিক শিল্পভাবনার অনুগামী, সুতরাং সদ্বিচারী সমালোচক শব্দপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিমূলে পৌঁছবার চেষ্টা করবেন। মিল্‌টনের কাব্যে লাটিন ঢঙ প্রবল, কী শব্দচয়নে, শব্দের বিশেষাভিধানে অথবা ব্যাকরণে। এ-ঘটনা লক্ষিত হয়েছে বটে, পরবর্তী কালে কোনো-কোনো পাঠকের সপ্রশংস সমর্থনও পেয়েছে, কারুর বা নয়, কিন্তু আধুনিক সমালোচনার বিশ্লেষণের পূর্বে এ-সত্য সম্যক প্রণিহিত হয়নি যে লাটিন শব্দপ্রীতি কবির খামখেয়াল নয়, তাঁর অন্তরোৎসারিত ধ্বনিচেতনার অবশ্যম্ভাবী রূপ, সে-ধ্বনি নিয়েছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি বিশেষ সুর আর সে-সুর ছিল লাটিনিজমেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এককালে মেঘনাদ-বধ কাব্যের প্রথম ছত্র কয়েকটির নবরূপ দিয়েছিলেন, সেটা নিশ্চয় তাঁর আপাতগম্ভীর কৌতুক নয় তো যদিচ মাইকেলের মেঘনাদে ও রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদে ছন্দের মূল কাঠামো একই, বিষয়বস্তু এক, তবুও এমন কথা বধির পাঠকও বলবেন না যে তাদের আবেগ-দ্যোতনাও এক! অধুনা কোনো-কোনো বাঙালী কবি বলেছেন যে মৌখিক ভাষা ও কাব্যের ভাষার বাক্‌রীতি অভিন্ন হওয়া দরকার। এ-মত সমসাময়িক প্রতিষ্ঠাবান ইংরেজ কবিদের মতের সহগামী, দেড়শো বছর পূর্বে ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ এমন কথাই বলেছিলেন, আর তারও পূর্ববর্তী কবিরা—ড্রাইডেন, ডান্‌, স্পেন্সর্‌, চসর্‌—এ-মতের পরিপোষক ভাষাতেই কাব্য রচনা করেছিলেন, তাঁদের পূর্বে দান্তে ও আরিস্‌টট্‌ল্‌ একই কথা বলেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ে এ মত অবশ্য প্রয়োজনীয় এমনকি স্বাস্থ্যকর যদিও তেমন যুক্তিবহ নয়, কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের সাময়িকতা-

উত্তীর্ণ নিরিখে এর মূল্য নিঃসংশয় নয়। সমসাময়িকতা সমসাময়িক দৃষ্টিতে যত মূল্যবান, নিরবধি কালের দৃষ্টিতে ততটা নয়। সৎ শিল্পভাবনা ও তদনুবর্তী সুসমঞ্জস ভাষারূপই নিরবধি কালের দৃষ্টিতে মূল্যবান, আপ্তবাক্য বা আর্ষবাক্য নয়।

এই সমসাময়িক দৃষ্টিতে মিল্‌টন্ ও মাইকেল উভয়েরই ভাষা ইদানীং লাঞ্ছিত হয়েছে আর এ-দৃষ্টির বাড়াবাড়ি হ'লে অনেক সার্থক সমসাময়িক কবিও বাতিল হয়ে যেতে পারেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় 'চল্‌তি' কথা ও 'সাধু' কথার অজস্র মিশ্রণ। "ঘুমাতেছে", "শুকাতেছে", "পালায়েছে" প্রভৃতি না-সাধু না-চল্‌তি ক্রিয়ারূপ আখছার পাওয়া যায়। একই ছত্রে পাওয়া যায়: "আমাদের দুজনার !—দুইজন,—একা !—", "উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা ক'রে গেছে পৃথিবীর সব সিংহাসন"। অথবা,

অনেক জেনেছে ব'লে আর কিছু হয় না জানিতে ;
অনেক মেনেছে ব'লে আর কিছু হয় না মানিতে।

এ-সব মিশ্রিত পদ কি কবির ছন্দ দৌর্বল্যের নিদর্শন? জীবনানন্দ ছিলেন বিদ্বান, অতীব আত্মসচেতন কবি, তাঁর সুরেলা চিত্তে অবশ্য এ-মিশ্রণের একটা বিশেষ অর্থ ছিল, সাবধানী সমালোচক একটু অবহিত হ'লে সে-অর্থের সে-সুরের সন্ধান পেতে পারেন আর এ-ও বুঝতে পারেন যে কাব্যের কাব্যত্ব সর্বক্ষেত্রেই কাব্য-ভাষা প্রয়োগে সীমাবদ্ধ নয়।

(৪)

আসলে কোনো শব্দ বা কোনো পদই স্বভাবত কাব্যধর্মী অথবা স্বভাবত কাব্যবিধর্মী নয়, শব্দমাত্রেই নিগুর্ণ, শব্দের গুণ জন্মায় অপর শব্দের "কন্‌টেক্‌স্‌ট্"-এ, পরিবেশে। এ-অধ্যায়ের গোড়ায় উদ্‌ধৃত কীট্‌সের ছত্রে rich শব্দটি স্ব-প্রকৃতিতে নিগুর্ণ, তার সামান্য অভিধায় কীট্‌স্-আরোপিত অর্থ নেই, অথচ কীট্‌সের ভাবপ্রবাহে ঐ ছত্রে ঐ বিশেষ স্থানে শব্দটি অপূর্ব গুণমণ্ডিত হয়েছে। নির্লিপ্তপ্রাণ শব্দে এই গুণসঞ্চার মহৎ কবিতেই সম্ভব। "তোমার নগ্ন, নির্জন হাত"—জীবনানন্দর এ-দুটি বিশেষণ, বিশেষত দ্বিতীয়টি, অদ্ভুত দ্যোতনা বহন করেছে, সে-দ্যোতনা এদের সাধারণ প্রয়োগে পাওয়া যায় না।

(১) (জীবনানন্দ) চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা

(২) (বুদ্ধদেব) আমার মনের অনেক গুহায় চূড়ায়-চূড়ায় শব্দ বাজে

(৩) (সমর সেন) তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে

এ-সব ছত্রে শব্দগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তাদের মধ্যে সহজাত চমৎকারিত্ব খুব কিছু পাওয়া যাবে না যদিও পরম্পরাগত ভাবানুষঙ্গের ফলে দুয়েকটি শব্দ হয়তো সহজেই কল্পনা-উদ্দীপক। প্রত্যেক ভাষাতেই কালক্রমে কতকগুলি শব্দ ও শব্দ-সমবায় গ'ড়ে ওঠে যেগুলি বহুকবি-আরোপিত সঞ্চিত দ্যোতনার ভাবানুষঙ্গে অন্যান্য শব্দের চেয়ে বেশি পরিমাণে কাব্যধর্মী। তবুও কাব্যধর্মিতা তাদের স্বধর্ম নয়, কেননা তারা যতবার কাব্যার্থে ব্যবহৃত তার চেয়ে অনেক বেশি বার সামান্যার্থে নিযুক্ত। কিন্তু উপরোক্ত ছত্রগুলিতে প্রতিটি শব্দ অপরাপর শব্দগুলির সংযোজনায় কবির গূঢ় রহস্যময় শিল্পভাবনার ক্ষণদ্যুতি বিস্তার করে। প্রত্যেকটি ছত্র গভীর কাব্যধর্মী, আর এ-সব উদাহরণে শব্দগুলির কাব্যধর্মিতা উদ্ভূত হয়েছে শব্দপ্রয়োগের উপায়ে ও প্রকরণে, অন্য শব্দের সন্নিধিতে, ভাবপ্রবাহের বিশেষ সংস্থানে, ধ্বনি ও দ্যোতনার সম্মিতিতে। এখানেই কবিতার করণকৌশল, সমালোচকের কর্ম এ-কৌশলের অনুসন্ধান। কাব্যের আদি সৃজন-শক্তি অনুসন্ধানের অতীত কিন্তু সৃষ্টকাব্যের মহিমা ও তার কারু বিশ্লেষণ-সাধ্য। শব্দ-বিশ্লেষণ আধুনিক সমালোচনার অন্যতম মূল্যবান প্রণালী।

*শব্দের সামান্যার্থ ও বিশেষাভিধানে যে ব্যবধান লক্ষ্য করা যায় তা' থেকে প্রমাণ হয় যে বিশেষাভিধানটি মূলত প্রতীকী, শব্দটির মধ্যে কোনো ইমেজ্ বা প্রতিমা সুপ্ত আছে, সে-প্রতিমা সমুচিত পরিমণ্ডলে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। কথ্যভাষায় এমন অনেক সুপ্ত প্রতিমার উদাহরণ পাওয়া যায়: পাগলা হাওয়া; বাসি কথা; বাঁকা কথা; কথার ওজন; ঠুনকো মন; বনেদি ঘর; হাল্কা হাসি ইত্যাদি। প্রতিক্ষেত্রেই অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যগুলিতে এমন গুণের আরোপ হয়েছে যা প্রাণীতেই সম্ভব, গুণের এই স্থানান্তরণ রূপকের তথা বাক্‌প্রতিমা-প্রয়োগের সাধারণতম ও স্থূলতম দৃষ্টান্ত। রস্‌কিন একে বলেছিলেন 'প্যাথেটিক্ ফ্যালাসি', আধুনিক সমালোচনার ভাষায় সুপ্ত প্রতিমা বলা ভালো, কেননা পুনঃপৌনিক ব্যবহারের ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এই শব্দযোজনাগুলির পেছনে যে

সূক্ষ্ম অর্থ আছে সে-সম্বন্ধে বক্তা আদৌ তীক্ষ্ণভাবে অবহিত থাকেন না। কিন্তু ভাষার এই স্থূল, সুপ্ত, অবহেলিত প্রয়োগ-সম্ভাবনার ভিত্তিতেই শিল্পীর মহত্তর ইমেজ্ বা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত, শিল্পীর ভাষা-প্রয়োগেও মূলত একই স্থানান্তরণ-প্রণালী বর্তমান। কয়েকটি উদাহরণ দেখুন :—

সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝ'রিণী (রবীন্দ্রনাথ)
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস (")
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেণিল উন্মত্ততা (")
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার হৃদয়ের বিশল্যকরণী (মোহিতলাল)
একান্তে তরুণী তমালী অপাঙ্গে মাখে আজি কালি (নজরুল)
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হয়ে (জীবনানন্দ)
হৃদয়ের সেতু বৈশাখী ঝড়ে কোথা চলে গেছে ভেসে (অজিত দত্ত)
তোমাকে ডাকছি সরু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে (বুদ্ধদেব)

এ-সব উদাহরণে গুণ-স্থানান্তরণের প্রভাবে বিমূর্ত ও মূর্ত একীকৃত হয়েছে, এই একীকরণেই word-image বা বাক্‌প্রতিমার মহিমা। বাক্-প্রতিমার রূপ বিচিত্র, অগণিত কবির মতোই বহুসংখ্যক। প্রত্যেক কবির অনন্য কল্পনা সার্থক কাব্য বিশিষ্ট বাক্ প্রতিমার রূপ নেয়। সে-হিসাবে প্রত্যেক কবিতার রস স্বতন্ত্র, বাক্‌ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য পৃথক। কিন্তু যে-কথা এই প্রবন্ধমালার প্রথম প্রস্তাবে বলেছি, সমগ্র জাগতিক কর্মকে শ্রেণীকৃত করা সম্ভব (শৃঙ্খলিত নয়) সুসম্বন্ধ যুক্তিযুক্ত বিচারে, সে-যুক্তিতেই এখানে বলা প্রয়োজন যে কাব্যের বহুবিচিত্র ও আপাতপৃথক বাক্‌প্রতিমাগুলিও, চরম বিচারে, কতিপয় শ্রেণীভুক্ত হতে পারে।

তৃতীয় প্রস্তাব : বাক্‌প্রতিমার আলোচনা

(১)

সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা আর ভাষার চূড়ান্ত ব্যষ্টিরূপ শব্দে। প্রত্যেক শব্দেরই দুটি ক'রে অর্থ-দ্যোতনা সম্ভব : একটি তার সামান্যার্থ যা বিনা ব্যাখ্যায় বিনা দ্বিধায় সবার কাছেই স্পষ্ট, যার আভিধানিক ও সাহিত্যিক প্রয়োগ অভিন্ন ; আরেকটি তার বিশেষ অর্থ, সাহিত্যিক প্রয়োগের অনন্য পরিবেশে যে অর্থের সূচনা পাওয়া যায়। সাহিত্যিক প্রয়োগে বিশেষ অর্থের সুযোগ আছে, সাধারণ ব্যবহারিক প্রয়োগে নেই, তবুও সাহিত্যিক প্রয়োগে শব্দমণ্ডলীর অধিকাংশে যদি আভিধানিক সামান্যার্থ বর্তমান না থাকে, অধিকাংশ শব্দই যদি সাহিত্যিকের কল্পনার চাপে সামান্যার্থ ছাড়িয়ে যেতে থাকে, তা'হলে সমগ্র সাহিত্যকর্মটি মেরুদণ্ড-হীন হ'য়ে পড়ে, কেননা ভাষার তথ্যজ্ঞাপনশক্তিতে ও যুক্তিশৃঙ্খলেই যে কোনো ভাষা-প্রয়োগের মেরুদণ্ড। যে সৃজনী-চেতনা কবি থেকে পাঠকে সঞ্চারিত হচ্ছে তার স্রোতোপথ ভাষায়, সে স্রোত অবাধে চলতে হ'লে পাঠক যে-ভাষার সঙ্গে পরিচিত সে ভাষাতেই কবিকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে, সম্পূর্ণত না হোক প্রধানত। অপর পক্ষে, কবি যদি শুধু সামান্যার্থেই নিযুক্ত থাকেন, তাঁর শব্দপ্রয়োগ যদি আচমকা নূতন ইঙ্গিত, নূতন দ্যোতনা দিতে না পারে, তা'হলে শিল্পরসে অভাব থেকে যায়। শব্দের যে আভিধানিক অর্থে আমরা অভ্যস্ত, সহসা যখন সে-অর্থের পাশ কাটিয়ে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো শব্দটি অপ্রত্যাশিত দ্যুতিলাভ করে তখন পাঠকচিত্তে যে-বিস্ময়ের সঞ্চার হয় সে-বিস্ময় শিল্পসুখের অঙ্গ। এই বিস্ময়কর দ্যুতিতেই যে ভাষাশিল্পীর কল্পনার প্রকাশ সে-জ্ঞান আমরা কেবল কীট্‌স্, এডগার অ্যালান পো এবং এলিয়টের জবানিতেই পাই তা নয়, আমাদের সহজ দেশজ অভিজ্ঞতাতেও তার সমর্থন নিয়ত পাব। কবি যখন বলেন "তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার," তখন 'অন্ধকার' কথাটি শুধুই আলোহীনতা এ-অর্থে আমাদের চেতনায় সাড়া দেয় না, অন্ধকার অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করে, সে-মূর্তি যেন মূর্তির চেয়েও বেশি, কেননা তৃষ্ণাতুর হবার মতো প্রাণবত্তা তার আছে আর প্রাণসম্ভব সে-মূর্তির আভাসেই কবির সৃজনী-কল্পনার প্রকাশ। "সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস"—সংক্রামক

শব্দটির সামান্যার্থে কতকগুলি অসুস্থ অবস্থা সূচিত হয়, সুতরাং স্বাস্থ্যের বিশেষণ হিসাবে সংক্রামক কথাটি পাঠকচিত্তে খটকা জাগায়; অথচ এক লহমার চিন্তাতেই বুঝতে পারা যায় ছত্রটির সামগ্রিক পরিবেশে সংক্রামক স্বাস্থ্য উপযুক্ত কথা, বুঝতে পারা যায় এই বিশেষণটির সাহায্যে কবি তাঁর সূক্ষ্ম বিদ্রূপ আরও শাণিয়ে তুলেছেন। শব্দ ও শব্দসংযোজনার এ-অনভ্যস্ত রূপ সামান্য আভিধানিক অর্থ ছাড়িয়ে image বা বাক্‌প্রতিমার রূপগ্রহণ করেছে, এই শিল্পরূপ সম্ভোগেই আমাদের বিস্ময়াচ্ছন্ন আনন্দ নিহিত। এ-অনভ্যস্ত রূপ গ্রহণ করার ফলে পাঠকের চিত্তে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়: এক, শিল্পরূপ বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়; দুই, বুদ্ধি পথ খোলসা ক'রে দিলে পরে সে-অবারিত দ্বারে পাঠকের কল্পনাশক্তি কবির কল্পনাশক্তির সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করে। বুদ্ধি ও কল্পনার সামান্যার্থ ও অসামান্য জ্ঞাপনার এই সমন্বয়ে ভাষার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

(২)

তা'হলে দেখা যাচ্ছে শব্দের কাব্যার্থ তার শিল্পরূপে। বাক্‌প্রতিমার বিশ্লেষণ আধুনিক সমালোচনার অন্যতম মূল্যবান পদ্ধতি। বাক্‌প্রতিমার মহিমা আধুনিক সমালোচনার পূর্বেও অবশ্য বিদিত ছিল তবুও বাক্‌প্রতিমার অগণিত বিচিত্ররূপ সন্ধান, আর তার চেয়েও বড়ো কথা, বাক্‌প্রতিমার মাধ্যমে কবির মৌল সৃজনী প্রতিভার ইশারা খোঁজা, আধুনিক সমালোচনার বিশেষ লক্ষণ। সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায় যে হয়তো কোনো লেখক একই রচনায় অথবা সমকালীন রচনা-গুচ্ছে অথবা এমন কি তাঁর জীবনব্যাপী রচনায় কতকগুলি বিশেষ শব্দ বা সমার্থক শব্দের ব্যবহার করেছেন। বিশেষ শব্দের প্রতি এই আসক্তি আধুনিক সমালোচক সাগ্রহে বিচার করেন কারণ সমালোচকের হিসাবে শব্দগুলি, তাদের শিল্পরূপগুলি, লেখকের কোনো বিশেষ অনুভূতিকে নির্দেশ করার প্রয়াসী, সুতরাং বাক্‌প্রতিমাগুলির মর্ম গ্রহণ করতে পারলে সে-অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যাবে, অতএব সৃজনী-প্রতিভারও আংশিক সন্ধান পাওয়া যাবে। কবির গূঢ় অনুভূতি যেন শিল্প-মন্দিরের গর্ভকক্ষ, সমার্থক শব্দাবলী যেন তার চাবি। একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর

বন্দনা'র কয়েকটি কবিতায় কয়েকটি সমার্থক শব্দের পুনঃপৌনিক প্রয়োগ লক্ষ্য করছি :

দগ্ধ ; বহ্নিশিখা ; আক্রোশ ; ক্রূর ; অমঙ্গল ; অকল্যাণ ; অভিশাপ ; দস্যু ; পশু ; কীট ; বন্ধন ; অক্ষম ; দুর্বল ; নিঃসম্বল, ভঙ্গুর ; পঙ্গুতা, পঙ্কের কলঙ্কবারি।

"আমি শুষ্ক নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন
আমি হিংস্র, দুরন্ত পাশব।" —শাপভ্রষ্ট

দগ্ধ দিন ; তিক্ত হলাহল ; কান্নার জলধিমূলে ;
বহ্নির চুম্বন রাগে রঞ্জিত হয়েছে মহাকাল ; মৃত্যুর ম্লানিমা ;
প্রেতের নিঃশব্দ যাওয়া-আসা ; রক্তমাঝে নাগিনীর বিষজ্বালা।

—কালস্রোত

"সর্পসম কলঙ্কিত এই দেহ—প্রতি অঙ্গে
নেমেছে পাপের ছাপ। অশুচি, পঙ্কিল।
দুর্বল, ভঙ্গুর আমি, পঙ্গু অসহায়,
কৃপণ, কঠিন।"

কুৎসিত, কদর্য আমি, রুগ্ন মোর আঁখি ; আমি কুশ্রী ; সকল কলঙ্ক মোর ; অঙ্গের কলঙ্ক মোর ; মনের ম্লানিমা ; পঙ্ক-শয্যা ; কৃমিসম ; কীটসম ; হীনপ্রাণ।

—অমিতার প্রেম

কারাগার ; রুক্ষ দস্যুবেশ ; স্বেচ্ছাচার স্রোতে ;
তীব্র-তীক্ষ্ণ রূঢ় পরিহাস ; অবজ্ঞার কঠোর ভৎ'সনা ; আকণ্ঠ
পঙ্কের মাঝে ; লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছনার বীজাণুতে কলুষিত করিয়াছে
নিঃশ্বাসের বাতাস আমার ; অভিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশ ; ক্রূর
স্বার্থদৃষ্টি ; মূঢ় স্বার্থপর লোভ ; হীন হিংসাসর্প গুপ্ত আছে ;
কামনার কুৎসিত দংশন ; জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা ; পদে পদে
স্খলন-পতন ; আহত বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা ;
ডুবিয়া আছি কৃমি-ঘন পঙ্কের সাগরে ; ক্ষুধা-জীর্ণ, বিশীর্ণ
কঙ্কাল ; শিরায়-শিরায় যত সরীসৃপ তোলে শিহরণ।

—বন্দীর বন্দনা

যদি বলি এ-সব শব্দের পুনঃপৌনিক প্রয়োগ কবির যৌবনধর্মী অনুভূতির নিদর্শন, তা'হলে অবশ্য প্রচণ্ড কথা কিছু বলা হ'ল না, কেননা গ্রন্থে-উল্লিখিত রচনা-তারিখেই সে নিদর্শন বর্তমান, তবুও বাক্‌প্রতিমা-বিচারী সমালোচনায় এই যৌবনানুভূতির বিশিষ্ট রূপটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হ'তে পারে। এই শব্দাবলীর পুনরাবৃত্ত প্রয়োগে প্রমাণ হয় যে কবির অনুভূতি বিশেষ একটি মাত্র রূপ নেয়নি, মাত্র একটি বিশেষণের বা গুণের আশ্রয় নেয়নি বরং মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল বাক্‌প্রতিমার সাহায্যে বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডল রচনা করেছে। বাক্‌প্রতিমার মাধ্যমে পাঠক সে পরিমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারেন। উপরোক্ত কবিতা চারটির পুনরাবৃত্ত শব্দগুলি থেকে বুঝতে পারি কবিচিত্ত এখন প্রবৃত্তি-পরবশ, তীব্রভাবে দেহচেতন, আবার সেই সঙ্গে দেহোত্তীর্ণ শুভ ও সৌন্দর্যের আকাঙ্খায় ব্যাকুল আর সর্বোপরি দেহমগ্ন প্রবৃত্তিতে ও বিদেহী সৌন্দর্যস্পৃহায় অনুত্তরণীয় বিবোধ লক্ষ্য করার ফলে তাঁর অনুভূতি মর্মান্তিক দোটানায় বিক্ষুব্ধ। যে-পরিমাণে দেহ-চেতনা বিদেহী চেতনাকে ক্লিষ্ট করেছে সে পরিমাণে দেহ-চেতনা তাঁর পক্ষে কুশ্রী ও ক্লেশকর। (দেহ-চেতনার গ্লানিবোধের উৎস কোথায়, কোনো স্বাভাবিক দেহজ-বিকারে কিনা, অথবা সামাজিক, বা ধর্মীয় বা কোনো মানসিক অবরোধে কিনা, সে-সব আলোচনা আপাতত বাক্‌প্রতিমা আলোচনার পরিধির বাইরে।) এই কুশ্রীতাজ্ঞান, ক্লেশবোধ ও তজ্জনিত অন্তর্বিক্ষোভ নানা রকম বাক্‌প্রতিমায় প্রকাশ পেয়েছে : কারাগার, পঙ্ক, অন্ধকার, পশু, কীট-সরীসৃপ, ক্ষত, রোগ, কঙ্কাল, মৃত্যু, প্রেত ইত্যাদি। বাক্‌প্রতিমাগুলি ভাবানুষঙ্গে পরস্পর-সম্পৃক্ত, এদের সমবেত সাহায্যে কবির অনুভূতিমণ্ডলের নিকটে আমরা পৌঁছুতে পারি; সে পরিমণ্ডলের ইশারা পেতে পারি। কবির ভাবমণ্ডল যদি আরও সংহত হত, যদি নীহারিকা থেকে নক্ষত্রমণ্ডলে দানা বাঁধতে পারত, যদি শিল্পকায়ার সঙ্গে শিল্পভাবনার সাযুজ্য মিলত, উজ্জ্বল একটি মাত্র শিল্পরূপে যদি কবির ভাবনা পূর্ণ সঙ্গতি লাভ করত তা'হলে অবশ্য এতগুলি শব্দের ও তাদের পুনঃপৌনিক সমার্থক প্রয়োগের প্রয়োজন হ'ত না। একটি বাক্‌প্রতিমাতেই কাব্যার্থ রূপায়িত হ'ত। একটি মাত্র উজ্জ্বল বাক্‌প্রতিমার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগ কাব্যে আদৌ দুর্লভ নয় : ম্যাথিউ আর্নল্ডের 'ডোভার বীচ' কবিতায় উপলাস্তীর্ণ সৈকতের উপরে সমুদ্র সলিলের নিরন্তর যাওয়া-আসা ; সুধীন্দ্রনাথের 'উটপাখী'

অথবা বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার'। অনেক ক্ষেত্রে এ-উজ্জ্বল একক বাক্‌প্রতিমা কোনো পৌরাণিক কাহিনী বা ব্যক্তির স্মৃতি-অনুষঙ্গে নির্মিত, যেমন ইওরোপীয় পুরাণের ইউলিসিস্, ফাউস্ট, বা লুসিফার; বাঙলা কাব্যে রাবণ, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা বা মৈনাক। কিন্তু এমন বলা চলে না যে শিল্পরস একক বাক্‌প্রতিমা প্রয়োগেই সার্থক, নিয়ত পরিবর্তনশীল পরস্পর-সম্পৃক্ত প্রতিমায় নয়। যেহেতু চরম বিচারে শিল্পভাবনাপ্রকাশই শিল্পকর্মের উদ্দেশ্য, সেজন্য বাক্‌প্রতিমার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম চলে না। ভাবনা ও করণ-কৌশলের যে সঙ্গতি সার্থক শিল্পের লক্ষণ তা'তে দু'রকম বাক্‌প্রতিমা বর্তমান। অনেক উৎকৃষ্ট বাক্‌প্রতিমা স্বয়ং-সম্পূর্ণ না হ'য়ে অন্যান্য প্রতিমার অনুষঙ্গে নির্মিত হয়েছে, তার প্রমাণ শেক্‌স্‌পিয়র, শেলি, এলিয়টে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ ও জনকয়েক বাঙালী কবিতেও পাওয়া যায়। বস্তুত, আধুনিক সমালোচনায় এমনও বলা হ'য়ে থাকে যে সম্পৃক্ত বাক্‌প্রতিমায় আধুনিক কাব্যানুভূতির প্রকৃষ্ট প্রকাশ। এলিয়ট বলেছেন, It appears likely that poets in our civilization, as it exists at present, must be *difficult*. Our civilization comprehends great variety and complexity and this variety and complexity, playing upon a refined sensibility, must produce various and complex results, the poet must become more comprehensive, more allusive, more indirect, in order to force, to dislocate if necessary, language into his meaning. (এ-কথা সম্ভব মনে হয় যে সভ্যতার বর্তমান অবস্থায় কবিগণকে দুরূহ হতেই হবে। অনেক বৈচিত্র্য ও জটিলতার সংযোগে আমাদের সভ্যতা। এ-সভ্যতা সুকুমার সংবেদনাতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার পরিণামও জটিল ও বিচিত্র। কবিকে ক্রমশই বেশি পরিমাণে সর্বগ্রাহী হ'তে হবে, আরো উল্লেখপরায়ণ, আরো তির্যক, যার ফলে ভাষার উপরে জোর চাপিয়ে, দরকার হ'লে ভাষা দুমড়ে, ভাষাকে নিজের প্রত্যয়ানুগামী করতে হবে।)

এ উক্তির মধ্যে civilization, as it exists at present বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এলিয়ট বলছেন না যে কাব্য সর্বকালেই দুরূহ হবে, অথবা দুরূহতা সৎ-কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু যেহেতু কাব্যে কবিমানসের

প্রকাশ, আর কবিমানস সমকালীন সভ্যতায় পুষ্ট, সেজন্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্যে কাব্যের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক উভয়ই প্রভাবিত হবে। যদি বর্তমান সভ্যতা সত্যই বিচিত্র ও জটিল হয়ে থাকে, এত জটিল যে তার সূক্ষ্ম-গুণাবলী প্রকাশের ক্ষমতা ভাষার সামান্য সংজ্ঞায় পাওয়া যাবে না, অতএব ভাষা দুমড়ে, মুচড়ে, তা'কে ভাবের সহযোগী ক'রে নিতে হবে, তাহ'লে অবশ্য কাব্যের ভাষা দুরূহ হ'য়ে পড়বেই, অন্তত কিছুকালের জন্য, যতকাল পর্যন্ত না এই দুমড়ানো ভাষার অসামান্যতা পাঠকের কাছে সহজ সামান্য হয়ে আসে। নানা ঐতিহাসিক কারণে এ-শতকের ইওরোপীয় সাহিত্যে কী লেখক কী সমালোচক উভয়েই সাহিত্যিক রচনায় পরস্পর সম্পৃক্ত শিল্পরূপের ও ভাষার তির্যক ব্যঞ্জনার প্রয়োজন বোধ করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে এ-শতকের গোড়ায় ডান্ ও অন্যান্য সপ্তদশশতকী কবিদের যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার মূলে ছিল আধুনিক রসিকের তির্যকশৈলী-প্রীতি। ক্রমে এই প্রীতি রীতিমতো নবশৈলীশাস্ত্রে দাঁড়িয়ে গেল, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও নূতন দর্শনের সাহায্যে। যে ambiguity শব্দটিতে আমরা এতকাল রচনার অপকৃষ্টতা বুঝতাম, উইলিয়ম্ এম্প্সন্ তা'কেই সূক্ষ্ম কাব্যানুভূতি ও তৎতুল্য সূক্ষ্ম রচনাকৌশল ব'লে প্রচার করলেন। আমেরিকান সমালোচকদের হাতে এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি এতই জটিল, এত গুরুগম্ভীর হ'য়ে পড়েছে যে শেষ অবধি সংশয় জাগে এঁদের তত্ত্বপ্রিয়তার উত্তাপে সাহিত্যরস বিলকুল উবে গেছে কিনা। কাব্য-ভাষার দুরূহতা সম্বন্ধে এলিয়টের উক্তি অথবা শৈলী-বিশ্লেষণের আমেরিকান প্রণালী বাঙলা কাব্য সম্বন্ধে পুরোপুরি খাটে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। প্রধান কথা civilization as it exists at present ; সভ্যতার পরিস্থিতি ইওরোপে ও ভারতবর্ষে এক কিনা এ-বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আমাদের সভ্যতা দাঁড়িয়ে নেই, চলিষ্ণু, তীব্রবেগেই চলমান। আমাদের সভ্যতায় প্রচুর জটিলতা আছে, জটিলতা আরো বাড়ছে, হয়তো বাড়বে। তবুও বাঙালী সমাজ ও বাঙালী মানস ঠিক ইওরোপীয় পন্থায় খণ্ডিত, অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত, ব'লে মনে হয় না। অন্তত পক্ষে বাঙালী জীবনের স্থূল প্রাকৃতিক পরিবেশ তো ইওরোপীয় পরিবেশ থেকে পৃথক বটেই। এলিয়ট যে বলেছেন the poet must become, সে বাধ্য-বাধকতা বাঙালী কবিচিত্ত ও কাব্য সম্বন্ধে খাটে না। অতএব শৈলী-শাস্ত্রবিৎ

বাঙালী সমালোচকের পক্ষে অতি-ফ্যাশনেব্‌ল্ আমেরিকান বিশ্লেষণ-প্রণালী গ্রহণযোগ্য নয়। শৈলীশাস্ত্রে মনোযোগী হবার কালে তাঁকে অবহিত হ'তে হবে ঠিক কোন্ পদ্ধতিটি বাঙালী মানসের সঙ্গে, তথা বাঙালী কাব্যশৈলীর সঙ্গে সঙ্গত সে-বিষয়ে। আমার ধারণায়, যেহেতু বাঙালী কবিচিত্ত স্বভাবতই কল্পনাবিলাসী, যেহেতু বাঙলা ভাষার রূপতত্ত্ব (morphology), বিশেষত সমাসরীতি, সহজেই বাক্‌প্রতিমার অনুকূলে, সে জন্য বাক্‌প্রতিমা-চেতনায় বাঙলা সমালোচনায় সুফলপ্রসূ পদ্ধতি গড়ে' উঠতে পারে।

(৩)

বাক্‌প্রতিমার আলোচনায় আমরা প্রতীকের আলোচনায় পৌঁছই। দর্শনশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে যাবতীয় শব্দ কল্পার্থজ্ঞাপক; শব্দমাত্রেই, ভাষারূপমাত্রেই, চরম বিচারে, প্রতীকধর্মী। 'মাঠ', 'হাত', 'ফুল', যে কোনো শব্দ লিখলাম বা উচ্চারণ করলাম, সে শব্দটি তো বস্তুত স্বয়ং মাঠ বা হাত বা ফুল নয়, শব্দটি দিয়ে মাঠ বা হাত বা ফুলের ধারণা পাই, সুতরাং শব্দটি আসল বস্তুটির বাচনিক প্রতীক মাত্র। সভ্যতার প্রাচীন যুগে যখন লিপিকৌশলের প্রথম উদ্ভাবন হয়েছিল তখন লিপিগুলি ছিল রেখার সাহায্যে, রেখার প্রতীকে, বস্তুকে ধরার প্রয়াস। ভাষার এই আদিম প্রতীকতার ওপরে আরো এক ধরনের প্রতীকতা আছে যেখানে বাক্য জড়বস্তুর প্রতীক নয়, সেখানে বাক্যের প্রয়াস অ-ধরাকে ধরার জন্য। এখানে কোন স্থূল সত্তা নেই, আছে মনোগোচর বা অনুভূতিগোচর কোনো প্রত্যয় তাকে অনুভূতি-সাধ্য করার জন্যই বাক্যের ইশারা। নিচের ছত্রাবলী দু'টি লক্ষ্য করা যাক।

(১) নীলাঞ্জন ছায়া
প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জ শ্যাম বসন্ত
বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ।

(২) তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।

প্রথম দৃষ্টান্তে শব্দগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাত্র। শব্দের সাহায্যে আমাদের

মনোজগতে কতকগুলি বস্তুসম্পন্ন একটি চিত্রের উদ্ভব হয়, আর সে চিত্রের আভাসে কতকগুলি অনুভূতির সঞ্চার হয়। এ-দৃষ্টান্তে মূল বস্তু ও তার প্রতীকার্থক ভাষায় পূর্ণ সঙ্গতি বর্তমান। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে, ভাষার ইশারায় কবির প্রত্যয় সম্বন্ধে আমাদের চেতনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ওপারে তির্যক পথে অনুভূতির জগতে চলে গেছে। যে-কথা কবি বলেছেন তা' আমরা অনুভব করলাম কিন্তু তা' আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের আওতায় নয়, সে কথা আমরা বা কেউই অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করতে পারি না ঐ বিশেষ শব্দ-প্রতীক ছাড়া। পাঠকের চিত্তে যে-প্রতিক্রিয়া জন্মালো তার কোনো সুনির্দিষ্ট সীমানা নেই। এ-ধরনের প্রতীক বাক্‌প্রতিমা-নির্ভর। কিন্তু প্রতীকের তৃতীয় একটি স্তর আছে, সে-স্তরে আরো গূঢ় অভিজ্ঞা, আরো সূক্ষ্ম দ্যোতনা দীপ্তিমান, সে-ধরনের প্রতীকপন্থা ইওরোপীয় সাহিত্যে এক শতাব্দী যাবত চলেছে, আমাদের সাহিত্যে প্রাচীন কালে ছিল। প্রতীকবিচারী যে-সাহিত্যচিন্তা এই তৃতীয় স্তরের প্রতীক নিয়ে নিযুক্ত, পরবর্তী প্রস্তাবে তা'র আলোচনা হবে।

চতুর্থ প্রস্তাব ঃ প্রতীকবিচারী আলোচনা

(১)

প্রতীক বলতে আমরা কি বুঝব? নানা ঐতিহাসিক কারণে প্রতীক শব্দটি এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংজ্ঞায় প্রযুক্ত হয়েছে, শব্দটির সর্বজনসম্মত সংজ্ঞার্থের এমন অভাব ঘটেছে, আর সর্বোপরি, আধুনিক দর্শনে প্রতীকতত্ত্বের চিন্তা এতই দ্রুত বেড়ে চলেছে যে প্রতীকবিচারী সাহিত্যালোচকের পথ ফলত অত্যন্ত পিচ্ছিল ও বিঘ্নসঙ্কুল। উনিশ শতকে যখন এক ফরাসী লেখক-গোষ্ঠী প্রতীকবাদী বলে পরিচিত হতে লাগলেন, যে কাল থেকে প্রতীক-প্রয়োগ সাহিত্যশৈলীর শ্রদ্ধেয় রীতি হিসাবে মানা গেল, তখন সাধারণ্যে প্রতীক শব্দটির যে সংজ্ঞা প্রচলিত ও গ্রাহ্য ছিল, আজকাল ঠিক সে-সংজ্ঞায় নির্ভরশীল সাহিত্যালোচনা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় কেননা বিশ শতকে দেখা গেছে যে প্রতীক-প্রয়োগ সাহিত্যে ও শিল্পকলায় সীমাবদ্ধ নেই, গণিতে, বিজ্ঞানে,

রাজনীতিতে, সামাজিক প্রথায়, ধর্মাচরণে ও অধ্যাত্মবিদ্যায়, জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এর প্রভাব দৃশ্যমান। দু'চারজন দর্শনবিৎ এমনও বলেছেন যে মানুষের যাবতীয় আত্মপ্রকাশ মাত্রেই মূলত প্রতীকপন্থী।

প্রতীকতত্ত্বের যত বিভিন্ন ব্যাখ্যা হয়েছে কান্ট থেকে ওয়াইটহেড ও কাসিরের অবধি, সব ব্যাখ্যার সমন্বয় করতে গেলে সাহিত্যালোচক অচিরেই সাহিত্যের পথ ছেড়ে দর্শনের অনভ্যস্ত পথে গিয়ে বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়বেন। সে-সমন্বয়সাধনে দর্শনবিদেরা প্রতীকতত্ত্বের কোনো সর্বজনসম্মত সংজ্ঞায় পৌঁছতে পারেননি, আর যেহেতু প্রতীকবিচারী সমালোচনা আধুনিক সাহিত্যালোচনায় অতীব সুফলসম্ভব পদ্ধতি, সেজন্য এ আলোচনায় আমরা সিম্বলিজ্‌ম্ বা প্রতীকতত্ত্বের সূক্ষ্ম তর্কগুলি এড়িয়ে প্রশস্ত স্বীকৃতিতে আবদ্ধ থাকব, বিশেষত যে সব স্বীকৃতি খ্যাতনামা প্রতীকবিচারী সাহিত্যালোচকদের মধ্যে সহজে পাওয়া যায়।

তা'ছাড়া প্রতীকপন্থী সমালোচনা থেকে সংজ্ঞাবিভ্রম দূর করতে হ'লে প্রতীকতত্ত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, প্রতীকবিচারী সমালোচনার বৈশিষ্ট্য কি, তার সম্ভাবনা কতদূর— এসব প্রশ্নের উত্তরই বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়—সে কথায় পৌঁছবার পূর্বে আমাদের বোঝা দরকার যে সাহিত্যালোচনায় প্রতীক শব্দটি কোন্ সংজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত, আর এই সঙ্গতিজ্ঞান আসবে যখন শব্দার্থটির ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অন্তত মোটামুটি ধারণা থাকবে।

যদিও প্রতীক-প্রয়োগ ও প্রতীক সম্পর্কে ধারণা সমস্ত সংস্কৃতি ও সভ্যতাতেই অল্পবিস্তর পাওয়া যায় তবুও সাহিত্যে প্রতীক-প্রয়োগ সংক্রান্ত ঔৎসুক্য আমাদের মধ্যে সম্প্রতি জেগেছে ইংরেজি (তথা ইওরোপীয়) সাহিত্যের মাধ্যমেই। ইংরেজি সিম্বল (symbol) শব্দটি—বস্তুত যে কোনো ইওরোপীয় ভাষার এতদর্থক শব্দটি (ফরাসী—symbole, জার্মান—symbol ইতালীয়—simbolo, রুশ—simbol)—মূল গ্রীক শব্দ সুম্বোলোন্ (sumbolon) থেকে উদ্ভূত। গ্রীকেরা কোন্ অর্থে শব্দটির ব্যবহার করতেন? —কোনো দু'টি বস্তুর আকস্মিক সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষণ, যার পরিণামে সন্ধি। সেকালে দু'দল বণিক (অথবা যে কোনো পক্ষ ও প্রতিপক্ষ) যখন অনেক দরদস্তুরের পরে একটা বোঝাপড়ায় আসতেন, একটা চুক্তি অথবা শপথ অথবা

নিয়ম মেনে নিতেন নিজেদের কাজকারবারের আগামী সুবিধার জন্য, তখন তাঁরা তামার পাত (অথবা তৎতুল্য কোন মজবুত উপাদান) দু'টুকরো ক'রে একেক দল একেক টুকরো রাখতেন সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ। অতঃপর ভবিষ্যতে প্রয়োজন মতো টুকরোগুলিকে দেখিয়ে তাঁরা প্রীতির সম্পর্ক আবার ঝালিয়ে আবার নূতন করে ব্যবসা সম্পর্কে লিপ্ত হতেন। টুকরোগুলিকে বলা হত সুম্বোলোন্। ব্যাবিলনের ক্যারাভান পথে, আনাতোলিয়ার প্রস্তর-বিষম বাঁকা রাস্তায়, অথবা ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপসঙ্কুল বাণিজ্য পথে, সাইরাকিউজ, করিন্থ বা সালোনিকার ব্যস্ত বাজারে, যেখানেই অতঃপর এই বণিকদের সাক্ষাৎ হত, তাঁরা ব্যবহার করতেন তাঁদের নিদর্শনগুলিকে, পাথর বা তামার যে-টুকরোকে তাঁরা একদা অভিজ্ঞান ব'লে মেনে নিয়েছিলেন অনেক প্রারম্ভিক দরকষাকষির পরে, আজো সে-অভিজ্ঞানকে তাঁরা অবশ্যই মেনে নিতেন। তাঁদের কথার খেলাফ হত না। এ ভাবে সুম্বোলোন্ বা অভিজ্ঞান দ্রব্যটি মূল্যবান হ'য়ে উঠল কিন্তু এর মূল্য-প্রকৃতিতে র'য়ে গেল প্রচুর অসাধারণত্ব। দ্রব্যটির স্বকীয় মূল্যের সমতুল্য নয় ওর অভিজ্ঞানমূল্য। স্বকীয় মূল্যের উপরে তদতিরিক্ত কাল্পনিক মূল্য এতে আরোপ করা হ'য়েছে, আর এই কাল্পনিক আরোপিত মূল্যই এর অভিজ্ঞান মূল্য। দ্রব্যটির মামুলি বস্তুমূল্য উন্নীত হ'য়ে গেল পরাবস্তুমূল্যে। এই মূল্যান্তরের গোড়ায় যে ঘটনা ঘটেছে তা' মনে রাখলে এর মূল্যপ্রকৃতির অসাধারণত্ব বোঝা যাবে। সব ব্যবসায়িক দরদস্তুর অসম্মতিতে সুরু হ'য়ে সাঙ্গ হয় সম্মতিতে. সুতরাং এহেন দরদস্তুর থেকে যে-অভিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে তার মূল্য-প্রকৃতিতে একটা সহজাত বৈপরীত্য থাকবেই, তার মূল্যপ্রকৃতিতে থাকবে দ্বন্দ্বোদ্ভব মিলন, মিলন-পরিণামী বিরোধ।

প্রতীক শব্দটির পরবর্তী ইতিহাসে এর সংজ্ঞা আরো ব্যাপক হয়েছে, আরো গভীরতর পরাবস্তুমূল্য এতে আরোপিত হয়েছে। সুম্বোলোন্ প্রয়োগের এককালীন ব্যবসায়িক সূত্র হারিয়ে গেছে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, দার্শনিক অর্থে বহুল প্রয়োগের ফলে এর বাণিজ্যিক অভিধা আজ প্রায় বিস্মৃত, কিন্তু প্রতীকের আধুনিক মূল্যপ্রকৃতিতে এখনো এর আদিম বৈপরীত্য বর্তমান, অর্থাৎ, দ্বন্দ্বোদ্ভব মিলন, মিলন-পরিণামী বিরোধ। আমরা ক্রমশঃ দেখতে পাব যে সাহিত্যিক প্রতীকের মৌলধর্মে এই মিলন-পরিণামী বিরোধ বর্তমান।

ইতিহাসে দেখতে পাই প্রতীকের প্রকৃতি ক্রমশঃ সরতে লাগল তার আদিম প্রকৃতি থেকে। প্রাচীন গ্রীক বণিকেরা অভিজ্ঞান ব্যবহারের যে-রীতি চালু করলেন বাণিজ্য পন্থায়, ক্রমে সে-রীতি জীবনযাত্রার অন্যান্য ক্ষেত্রেও চলতে লাগল। কেবল বাণিজ্যে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রথায়, বিশেষত ধর্মাচরণে, নানা রকম অভিজ্ঞানের ব্যবহার হতে লাগল আর এই প্রয়োগ-বিস্তৃতির ফলে প্রতীকের অভিধা বদলে গেল অনেক পরিমাণে। গোড়াতে সুম্বোলোন্ ছিল একটা চুক্তির নিদর্শন, ক্রমে চুক্তির তাৎপর্য লোপ পেয়ে গেল, প্রধান হয়ে উঠল নিদর্শন বা চিহ্নসূচক অভিধা। এই নূতন অভিধা দ্রুত গতিতে বাড়ল খৃষ্টীয় ধর্মের প্রসারের সঙ্গে। খৃষ্টীয় ধর্ম প্রকাশ্যে আচরিত ধর্মের মর্যাদা সহজে লাভ করতে পারেনি। রোমে ত বটেই, এমন কি গ্রীসেরও অনেক অঞ্চলে খৃষ্টীয়ধর্ম বহুকাল পর্যন্ত ছিল গুপ্ত ধর্ম, খৃষ্টানের পক্ষে নিজকে খৃষ্টান ব'লে পরিচয় দেওয়া আদৌ নিরাপদ ছিল না। সুতরাং খৃষ্টানেরা নিজেদের মধ্যে গুপ্ত পরিচয়-সঙ্কেত ব্যবহার করতেন, আর এ-ভাবেই সুম্বোলোনের সঙ্কেতার্থ প্রধান হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু যেহেতু খৃষ্টানদের ধর্মাচরণ কেবল আচরণসর্বস্ব ছিল না, তাদের আচরণের পশ্চাতে ছিল ভক্তি ও মননমিশ্রিত প্রচণ্ড তাত্ত্বিকতা, সে জন্য তাঁরা যে সব চিহ্ন ও সঙ্কেত ব্যবহার করতে লাগলেন সেগুলি স্থূলবস্তু বা প্রথার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত রইল না, তারা নির্দেশ দিল বস্তুর অতীত নির্বস্তুক ধারণার। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। প্রাচীন খৃষ্টানেরা মৎস্য মূর্তিকে অতি পবিত্র ব'লে মানতেন কেননা গ্রীকভাষায় "যীশুখৃষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, মানবত্রাতা" এই কথার প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম অক্ষরগুলি একত্র সাজালে যে শব্দটি তৈরি হয় তার মানে মৎস্য। মৎস্যচিহ্ন তাহলে ধর্মাচরণের সঙ্কেত তো হলই, ধর্মমত ও তত্ত্বের প্রতীকও হয়ে উঠলো।

বস্তুত ধর্মেই প্রতীকপন্থার সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ। প্রতীকতত্ত্বের গোড়ায় সর্বদেশে সর্বচিন্তাশাস্ত্রে, ধর্মের অমেয় প্রভাব বর্তমান। প্রাগৈতিহাসিক কৌমগুলিতে প্রতীকের বহুব্যাপ্ত ব্যবহার প্রচলিত ছিল একথা অনুমান হয় এখনো যে সব আদিম সংস্কৃতি পৃথিবীতে টিঁকে আছে তাদের সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক আলোচনা থেকে। ভারতীয় আর্যরা অবশ্য প্রতীকচেতন ছিলেন, তাঁদেরও পূর্বে ছিলেন অ্যাসিরিয়া ও মিসরের লোকেরা। প্রতীক-প্রয়োগের যে-বিবর্তন

খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টোত্তর গ্রীসে লক্ষ্য করা যায় তার অনুরূপ মিসরে, ইরাণে, সিন্ধুতীরেও ঘটে থাকবে কিন্তু সে-ঘটনার কোনো ইতিবৃত্ত মজুদ নেই। তবুও একথা বলা সম্ভব যে যে-কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অল্পবিস্তর প্রতীক-প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী যেহেতু ইন্দ্রিয়োত্তর চেতনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করার সমস্যা, লোকায়তে বাঁধবার প্রয়াস, নির্বস্তুক তত্ত্বকে বস্তুনির্ভর ধারণাযোগ্য করার প্রশ্ন, সর্বপ্রথমে ধর্মাচরণেই দেখা দিয়েছিল, যাবতীয় আদি সংস্কৃতিগুলির ধর্মাচরণে। যখন থেকে ধর্মানুষ্ঠানে যুগপৎ অনুভূতি ও জ্ঞান, ভক্তি ও যুক্তি সংমিশ্রিত হ'ল, প্রতীকের বিস্তর প্রসার তখন থেকেই। প্রাচীন যুগের স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায়, সাহিত্যে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, প্রতীকের যে-অগণিত প্রয়োগ একেকটি সংস্কৃতিকে রূপৈশ্বর্যময় ক'রে তুলেছিল, আধুনিক সংস্কৃতিতেও তার কখনো সুপ্ত কখনো প্রকট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। স্বস্তিক চিহ্ন, পদ্ম, ধানের ছড়া, রথচক্র; রুটি ও সুরা, লিলি ফুল, স্থান ও উপলক্ষ বিশেষে কতকগুলি রঙের ব্যবহার (মৃতাশৌচ সূচনায় খৃষ্টানেরা কালো রঙ ব্যবহার করেন, হিন্দুরা সাদা রঙ); বাঙালী সধবার সিঁথের সিঁদুর, হাতের নোয়া, গ্রীক চার্চে বিশ্বাসী খৃষ্টানদের আইকন্, ক্রীস্‌মাস্ উপলক্ষে ইংরেজদের মিস্‌লটো গাছের ডালপাতা সাজানো—এহেন অসংখ্য প্রতীক আজো ছড়িয়ে আছে সমাজ-জীবনে। মহাযানী কাব্যের ভাষা প্রতীকসর্বস্ব, বাউলের গান ও শ্যামাসঙ্গীতও তাই। বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও স্থাপত্য, মধ্যযুগীয় খৃষ্টীয় চিত্রকলা প্রতীকপরায়ণ। সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতার দরুন একই প্রতীকবস্তুর অর্থবহতা দেশে দেশে পৃথক হতে পারে। বাঙলাভাষায় "ঘুঘু" কথাটির প্রতীকার্থ গৌরবজনক নয় ("তুমি তো দেখছি কম ঘুঘু নও") অথচ খৃষ্টীয় সংস্কৃতিতে ঘুঘু পাখী শান্তির দূত, এমন কি পরমাত্মারও প্রতীক (দান্তে রোসেটীর "ব্লেসেড ড্যামোজ়্‌ল্" কবিতার 'মিস্‌টিক ডাভ্" উল্লেখনীয়)। পারিবেশিক বিভিন্নতা ও অভিধাগত পার্থক্য যেমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আবার নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় তুল্যার্থক প্রতীকও মেলে বড় কম নয়। হোলির আমোদ (অন্তত যেদিন অবধি এ-আমোদ উৎপীড়নে পর্য্যবসিত হয়নি) ও মে-মাসের উৎসব একই ধরনের সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন, পশ্চিমের কাব্যে ও ভারতীয় কাব্যে উৎসব দু'টি প্রায় সমার্থক। সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া অনেক বস্তু অনেক দৃশ্য

আছে যে-বিষয়ে কাব্যানুভূতি পূর্বে ও পশ্চিমে সমতুল্য। দু'টি বিখ্যাত কবিতার অংশ ধরা যাক :

(১) When I behold, upon the night's starr'd face
Huge cloudy symbols of a high romance.

(২) অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা
চোখের মতো ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা।

উদ্ধৃত অংশ দুটি সমান্তরাল নয়, সমমূল্য। নক্ষত্রের আবেদন দুই কবির কাছে দু'রকম শিল্পরূপে সংমূর্ত বটে কিন্তু যে-সৃজনী দৃষ্টির আশীর্বাদে বস্তুর রূপান্তর হয়ে যায় পরাবস্তুতে, যে সংকেত-সন্ধানী কল্পনায় নক্ষত্র শুধু আকাশের সৌরপিণ্ড হয়ে থাকে না, দূরপ্রসারী ধারণার ইশারা দেয়, সে-দৃষ্টি ও সে-কল্পনা উভয় কবিতেই সমতুল্য, সমগোত্রীয়।

আপাতত আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে সুম্বোলোন কথাটির অভিধা-বিবর্তনে ধর্মানুষ্ঠানের ও ধর্মমতের অংশ প্রবল, আর এই প্রাবল্যের কারণ যে ধর্মবিৎ নিয়ত এমন বস্তু এমন আকার খুঁজে বার করার চেষ্টায় ছিলেন যার সাহায্যে পরাবস্তুর সংকেত পাওয়া যেতে পারে। ধর্মবিদের উদ্দেশ্য ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীতের সমন্বয় সাধন, বাক্যের মধ্যে অনির্বচনীয়ের আকৃতিলাভ, সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান। গোড়ায় প্রতীক ছিল নিদর্শনমাত্র, এখন প্রতীক হ'য়ে উঠল অব্যয় ধারণার ইঙ্গিতসম্পন্ন। অভিজ্ঞানের অন্তর্লীন তাৎপর্য সম্বন্ধে মানুষ কবে থেকে সচেতন হ'ল সঠিক বলা সম্ভব নয়—হয়তো ইতিহাসের শুরু থেকেই—কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খৃষ্টধর্মের প্রচণ্ড প্রয়োজনে ইওরোপীয় মানব নিদর্শনের শাদামাটা অর্থ পেরিয়ে পৌছলো প্রতীকের গভীর স্তরে। প্রতীকবস্তু এখন অপর যে-বস্তুর অভিজ্ঞান, যার ধারণাজ্ঞাপক, সে-বস্তু কেবল বস্তুময় নয়, ভাবঘনও বটে, প্রতীক-বস্তুর মাধ্যমে আমরা এক ভাবমণ্ডলে পৌঁছই, আর এ-ভাবমণ্ডলে যুগপৎ মনন ও অনুভাবন দুই-ই সক্রিয়।

প্রতীকবিচারী সাহিত্যালোচনায় প্রতীকে ও চিহ্নে, প্রতীকে ও সাধারণ বাক্‌প্রতিমায় প্রভেদ সম্বন্ধে অবহিত হ'তে হবে নতুবা সমালোচক শিথিল অভিধার চোরাবালিতে আপনাকে তো হারাবেনই, তাঁর আলোচনার পদ্ধতিও বিভ্রান্ত হবে।

(২)

চিহ্ন বা সংকেত আমাদের চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে। গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি, সামনে দেখলাম লালবাতি জ্বলছে, লালবাতির সংকেত হ'ল সোজা রাস্তা আপাতত বন্ধ, যতক্ষণ লালবাতি জ্বলছে এগিয়ো না। অথবা দেখলাম রাস্তার পাশে একটি ফলকে ধাবমান বালকের ছবি, এ-ও পথচারী নিয়ন্ত্রণের এক সংকেত। কাগজে কয়েকটি রেখা আঁকলাম, আকৃতিটা দাঁড়াল "ক", আকৃতির রেখাগুলি একটি বিশেষ ধ্বনির চিহ্ন। ছুটি সংখ্যার মাঝখানে একেকবার একেকটি চিহ্ন আঁকলাম: ৯+৩, ৯−৩, ৯×৩, ৯÷৩, সংখ্যা ছুটি পুনরাবৃত্ত হচ্ছে কিন্তু চিহ্ন বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে। মন্দিরগৃহে গিয়ে দেখলাম প্রস্তর মূর্তির হাতের আঙুলগুলি একটি বিশেষ ভঙ্গীতে দেখানো হয়েছে, করমুদ্রার বিশিষ্ট চিহ্ন দেখে বুঝলাম এ মূর্তি অবলোকিতেশ্বরের। সাম্প্রতিক দর্শনবিদেরা পুনঃপুনঃ বলছেন যে এ-সব substitutional signs বা বদলা চিহ্ন কখনো প্রতীকপর্যায়ী নয়, কেননা এসব চিহ্নে অনেকটা খামখেয়াল অনুসারে এক বস্তুতে অপর বস্তু বোঝানো হচ্ছে, উভয় বস্তুর কোনো গভীর আত্মিক সম্পর্ক নেই। দর্শনবিৎ এর্নেষ্ট্ কাসিরের বলেন যে যাবতীয় শুদ্ধ প্রতীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তুতে কিছু না কিছু কায়িক সাদৃশ্য থাকবে, অবশ্য যে-পরিমাণে নিরাকার কল্পনাকে কায়িক মূর্তি দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব ততটাই। একটি অপরটির নকল নয় কিন্তু একের মধ্যে অপরের আভাস মেলে। শিল্পকলার উপাদানে প্রভেদ থাকার দরুন এই সাদৃশ্যের স্বরূপীকরণে প্রভেদ থেকে যাবে, অর্থাৎ একই মৌল সাদৃশ্যের ভাবনা চিত্রশিল্পীর উপাদানে যে-মূর্তি গ্রহণ করছে ভাষা-শিল্পীর অথবা ভাস্কর্য-শিল্পীর উপাদানে তা করছে না।

• বলা যেতে পারে যে প্রতীক মাত্রেই এক রকমের চিহ্ন কিন্তু চিহ্ন মাত্রেই প্রতীক নয়। চিহ্ন দু'রকমের: the merely designatory sign and the really significative sign, এক শ্রেণীর চিহ্নে ঋজু প্রত্যক্ষ নির্দেশ, অপর শ্রেণীর চিহ্নে গভীর ভাবব্যঞ্জনার তির্যক ইঙ্গিত।

প্রত্যক্ষ নির্দেশবাহক চিহ্ন নিয়ে সাহিত্যালোচকের কারবার কম কেননা প্রত্যক্ষ চিহ্ন স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রশিল্পে যত প্রচুর পরিমাণে প্রকট ভাষাশিল্পে ততটা নয়।

কিন্তু সাহিত্যালোচকের সঙ্কট শুরু হয় যখন তাঁকে বাক্‌প্রতিমায় ও প্রতীকে প্রভেদ বিচার করতে হয়। এক হিসাবে বাক্‌প্রতিমা ও প্রতীক সমপর্যায়ী। ভাষাপ্রয়োগের প্রকার দু'টি : referential, উল্লেখী বা নির্দেশী, এবং emotive, আবেগবান বা অনুভবী। ইংরেজি ভাষায় প্রকার দু'টির নানা নামকরণ হয়েছে : denotation, connotation (লজিক পুস্তকের সুপরিচিত নামকরণ) : statement, suggestion (পেটার ও অন্যান্য অনেকে); direct, oblique (অধ্যাপক টিলিয়ার্ড) ; referential, emotive (আইভর রিচার্ড্‌স্‌, যদিও রিচার্ড্‌স্‌ তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থে প্রকাশ প্রণালীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন)। চরম বিচারে এই বিভিন্ন নামকরণে একই তারতম্য বোঝায়, যে-তারতম্য ভারতীয় ন্যায় ও অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যক্তার্থ এবং বক্রোক্তি নামক দ্বৈততায় সুস্পষ্ট। উক্তিমাত্রেই (বাচনিক হোক অথবা আচরণিক) হয় পরোক্ষ নয়তো প্রত্যক্ষ অর্থজ্ঞাপন করে। তা'র তাৎপর্য হয় তো স্পষ্ট— যে কথাটি বলা হয়েছে ঠিক তা-ই—নয়তো তা'র বক্র ভঙ্গিমায় ইশারা পাওয়া যাবে কোনো তির্যক অভিধার। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে ব্যক্তার্থ বা বিশেষাভিধান বা ঋজু প্রত্যক্ষ উক্তি বিজ্ঞানরীতি সম্মত, আর জাত্যর্থ বা সামান্যাভিধান বা তির্যক পরোক্ষ উক্তি শিল্পরীতি সম্মত। বিজ্ঞানে চাই উক্তি ও বক্তব্যের পূর্ণ সঙ্গতি, অপর পক্ষে কাব্যের দ্যোতনা নিয়ত উক্তির সীমানালঙ্ঘী। দ্বর্থ্য বা বহুলার্থ উক্তি বিজ্ঞানে অচল, কাব্যে আদরণীয়। বস্তুত ইংরেজ সমালোচক উইলিয়ম এম্‌প্‌সন্‌ সাত রকম বক্রোক্তির বিশ্লেষণ করেছেন, কাশ্মীরি আলঙ্কারিকদের কাছে তিনি সাতের কয়েকগুণ বেশি বক্রোক্তি প্রণালী শিখতে পারতেন।

বক্রোক্তির প্রণালী সাত না সাতাত্তর সেটা আলঙ্কারিক বিশ্লেষণের প্রশ্ন, প্রতীকবিচারী সমালোচনায় সে-প্রশ্ন অবান্তর। এ-সমালোচনায় বিচার্য, বাক্যার্থের প্রধান স্তর কয়টি? এ-বিষয়েও মতভেদ প্রচুর কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে আমার নিজের ধারণা ও অভিজ্ঞতার নির্ভরে, এর্নে্‌স্ট্‌ কাসিরের ও উইলবর আর্বানের অনুসরণে, আমি মানি যে ভাষা প্রয়োগের তিনটি স্তর বিদ্যমান।

প্রথম স্তরে সরল স্পষ্ট ব্যক্তার্থ নিয়ে কারবার। যদি বলি "ভোর", "রোদ", "ধান", "ক্ষেত", "মাঠ", "ঘাস", তা'হলে কয়েকটি বিশেষ বস্তুই

বুঝব, অন্য কিছু বুঝবার উপায় নেই, যদি বলি "কার্তিকের ক্ষেতে ভোরের রোদ পড়েছে", তা'হলেও সুস্পষ্ট সুমিত অর্থ-সম্পন্ন কথা-ই বলা হ'ল। কিন্তু কবি লিখলেন,

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে'
অলস গেঁয়োর মত এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে ;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার।

সঙ্গে সঙ্গে "ভোর" "রোদ" ইত্যাদি সরল ব্যক্তার্থ সম্পন্ন কথা কয়টির অর্থ বেড়ে গেল আশ্চর্য রকমে, পাঠক শুধু কয়েকটি বস্তুই বুঝলেন না, তাঁর বোধ পৌঁছল অনুভূতির গভীরতর স্তরে। আরো কয়েকটী ছত্র লক্ষ্য করা যাক :

(১) When to the sessions of sweet silent thought
(২) Silent silver nights and darks undreamt of
(৩) আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ
(৪) শিশিরের মতো ঘুম ঝ'রে পড়ে নিশীথের আকাশের তলে
(৫) নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।

ভাষা প্রয়োগের কোন্ গুণ, কোন্ স্তরের গুণ, এই ছত্র কয়টিতে পেলাম? পেলাম হৃদয়াবেগ-সঞ্চারী গুণ, যাকে ইংরেজ লেখক বলেছেন emotive quality ; ভাষা-প্রয়োগের এই দ্বিতীয় স্তরে ভাষা কেবল নামার্থ ব্যক্ত করে না, নামার্থের সঙ্গে জাগায় ইন্দ্রিয়সংবেদী কল্পনা, অনুভূতির দোলা।

কিন্তু ভাষা-প্রয়োগে আরো এক স্তরের শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কবি লিখলেন :

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া, আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা
মেলাবেন।

"হাওয়া", "বাড়ি", "দরজা". আর "তিনি" (যে-ই হন্ না কেন্) কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম নয়, এরা আবেগ-সঞ্চারী শব্দ। বাক্যার্থের প্রথম স্তর থেকে আমরা দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছেছি, কিন্তু সে-স্তরেও আবদ্ধ না থেকে তৃতীয় স্তরে, আরো সূক্ষ্ম সংগুপ্ত স্তরে পৌঁছই যখন বুঝতে পারি যে "হাওয়া", "বাড়ি", "দরজা" এসব শব্দের অভিধায় অধ্যারোপ হয়েছে, অর্থাৎ এক বস্তুতে অপর বস্তুর কল্পনা করা হয়েছে। ছত্র কয়টির মুখ্য অভিধায় ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়ি আর ভাঙা দরজার একটা রূপ আমাদের চেতনায় জাগ্রত হয় বটে কিন্তু একথা বুঝতেও সময় লাগে না যে শব্দকয়টি একটা বৃহত্তর ভাবের প্রতিকল্প, তারা আরো সূক্ষ্ম অথচ আরো হৃদয়গ্রাহী কাব্যবস্তুর suggestion বা অভিভাব আমাদের কাছে উপস্থিত করে, সুতরাং শব্দকয়টি তথা সমগ্র স্তবকটি প্রতীকধর্মী। ভাষা প্রয়োগের এই তৃতীয় স্তরে, প্রতীকের স্তরে, ভাষার আবেগসঞ্চারী গুণের সঙ্গে সংযুক্ত হয় মনন-দ্যোতক গুণ। ঋজু বচনে যে মনন-দ্যোতনা সম্ভব ছিল না—কেননা সীমার বন্ধনে অসীমকে বাঁধা যায় না—তা সম্ভব হল তির্যক ভঙ্গীতে, অধ্যারোপিত বাক্যের প্রতীকী অভিভাবে। সামান্য বাক্‌প্রতিমার সঙ্গে প্রতীকের মস্ত প্রভেদ এখানে। বাক্‌প্রতিমায় দ্বিস্তর আবেগসম্পূর্ণ প্রকাশভঙ্গী: প্রতীকে ত্রিস্তর প্রকাশভঙ্গী, আবেগ ও মননের সাযুজ্যে সে সমৃদ্ধ, যে-আবেগ ও যে-মনন ঋজুভাষার নিগড়ে ধরা দেয় না।

জীবনানন্দ দাশ ও অমিয় চক্রবর্তী থেকে যে দু'টি কাব্যাংশ উপরে উদ্ধৃত হয়েছে—"শুয়েছে ভোরের রোদ", "মেলাবেন তিনি"—সে দু'টিতে আবেগ-সঞ্চারী গুণের উদ্ভব যে-পরিমাণে তাদের বাক্‌প্রতিমায়, সে-পরিমাণেই তাদের প্রবহমান সুরে। একটিতে সুরের গতি মন্থর, অলস, প্রায় বিবশ। অপরটিতে "মেলাবেন" কথাটির প্রথম ও দ্বিতীয় প্রয়োগের মাঝখানে তিনটি সংক্ষিপ্ত খণ্ডবাক্যের সমাবেশ। তাতে একপক্ষে সুর যেমন চূর্ণিত দ্রুতধাবী শিশু-তরঙ্গের মতো উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, অপর পক্ষে "আর" কথাটিকে দ্বিতীয় ছত্রের সুষ্ঠু বাক্যবন্ধ থেকে প্রথম ছত্রে সরিয়ে নিয়ে আসার ফলে ও "হাওয়া" "আর" এ-দু'টি তুল্য স্বরধ্বনির সমাবেশের ফলে সুর গড়িয়ে পড়েছে দ্বিতীয় ছত্রে। সঙ্গে মিলেছে প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রের শাদাসিধে মিল ("আর"—"বাড়িটার")। সমস্ত জড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ কয়েকটির তরঙ্গ-চূর্ণগুলি এক প্রবহমান স্রোতে

বাঁধা পড়েছে। ছত্র কয়টিতে যেন সুরের যুগপৎ দু'টি গতি ; একটি vertical, ঊর্ধ্বরেখ (ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে), অপরটী horizontal, ক্ষিতিজরেখ (তরঙ্গগুলি সম্মুখগামী)। জীবনানন্দ-র ছত্র কয়টি বাক্‌প্রতিমায় ও সুরবৈভবে সম্পূর্ণ, আর কিছু করার প্রয়াস কবির ছিল না, অতএব ছত্র কয়টির প্রকাশভঙ্গী দ্বিস্তর মাত্র। অমিয় চক্রবর্তীর ছত্র কয়টির বাক্‌প্রতিমায় ভাবাদর্শের ইঙ্গিত বর্তমান, অতএব এ ক্ষেত্রে রচনাভঙ্গী প্রতীকপন্থী।

(৩)

প্রতীক বলতে শিল্পালোচনায় তা'হলে কী বুঝলাম ? বুঝলাম যে বহুস্তরী ভাবাদর্শের ইঙ্গিতসম্পন্ন বাক্‌প্রতিমায় প্রতীকের প্রকাশ। বিশেষ একটি বা দু'য়েকটি ভাবের প্রতিভূ যে বাক্‌প্রতিমা তাকে প্রতীক বলা চলে না, সেটি রূপক। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের নির্ঝর প্রতীক নয়, রূপক। উদাহরণ দেখা যাক :

(১) যে-ভয় জীবনে ফণিমনসার বন।
(২) মৈনাক, সৈনিক হও
(৩) পাষাণ ফেটে আকাশে ফোটে আশার রংমশাল
কর্মখর দ্বিপ্রহর দীপ্ত হ'লো ;
কবি-কিশোর, শক্তি তোমার মুক্ত করো,
বৃহন্নলা, ছিন্ন করো ছদ্মবেশ।

এ সব উদ্ধৃতির কোনোটিই প্রতীক নয়, রূপক মাত্র, কেননা A symbol, like a metaphor, does not stand for a 'thing' or for an idea : it is a focus of relationships। অনেক ধারণা, অনেক অভিজ্ঞা, অনেক ইন্দ্রিয় সংবেদনা ও অনুভূতি যেন কালক্রমে কবির সৃজনীচিত্তে সংগোপনে থিতিয়ে গিয়ে যে শিল্পরূপ ধারণ করেছে তাকেই বলতে পারি প্রতীক। ইব্‌সেন্‌-এর "পোর্‌ গিণ্ট্‌"-এর কথা স্মরণ করুন, সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য যেখানে প্যোর্‌ পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে আর নিজ মনে বলছে :

Now, my dear Peer, you're not an emperor, you're an onion, I'm going to peel you. (*Takes an onion and peels it layer by layer.*) There's the untidy outer husk ; that's the shipwrecked

man on the wreck of the boat ; next layer's the Passenger, thin and skinny—Next we come to the gold digger himself ; the pith of it's gone—some one's seen to that...Are we never coming to the kernel ? (*Pulls all that is left to pieces*) There isn't one ! To the innermost bit it's nothing but layers, smaller and smaller. Nature's a joker...Life's an uncommonly odd contraption ; it plays an underhand game with us ; if you try to catch hold of it, it eludes you, and you get what you didn't expect—or nothing ! পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ভিতরের শাঁস বার করার চেষ্টা হল, কিছু বেরল না, পেঁয়াজ খোসা-সর্বস্ব সব্জি, বহু ব্যক্তিরূপসম্পন্ন মানুষের সত্তা-ও তেমনি অন্তঃসার শূন্য। খোসা ছাড়া পেঁয়াজ নেই, দৃশ্যমান ব্যক্তিরূপ ছাড়াও মানুষের সত্তা নেই। কিন্তু কোন্ সে আদর্শ-সত্তা যা খুঁজে বেড়াই আমরা, আর ব্যক্তিরূপগুলি কি স্বতন্ত্র না ওতপ্রোত জড়িত, যদি জড়িত হয় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী ?—এ সব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর ইব্‌সেনের প্রতীকে নেই, তাদের ইঙ্গিত আছে। প্রতীকটি এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র ভাবাদর্শ আমাদের সামনে উপস্থিত করছে না, প্রতীকের শিল্পরূপে মিশে গেছে অনেক স্তরের ভাবনা, প্রতীকটি যেন বহু ধারণার নাভিকেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথেও জটিল ও পরস্পরসম্পৃক্ত একাধিক ভাবাদর্শ মিলে মূর্ত হয়েছে 'অচলায়তনে'র ও 'ডাকঘরে'র কেন্দ্রীয় ভাবনায়।

যেহেতু প্রতীক হচ্ছে a focus of relationships, বহু সম্পর্কের সংযোগ-কেন্দ্র, সেজন্য কোনো শুদ্ধ প্রতীকেরই সর্বজনসম্মত নিঃসংশয় ভাবার্থ ব্যাখ্যা চলে না। ইয়েট্‌স্ নিজের একটি কবিতা সম্বন্ধে বলেছিলেন, the poem has always meant a great deal to me, though, as is the way with symbolic poems, it has not always meant quite the same thing.

আঁদ্রে জিদ্ তাঁর জার্নালের এক জায়গায় লিখেছেন, In uncertain dreams are already sketched, not vaguely, the great figures of eternity ; জিদ্-এর উক্তিতে uncertain ও vaguely শব্দ দুইটি লক্ষণীয়। সার্থক প্রতীকী কবির চিত্তে যে সব শাশ্বত ভাবনা মুহুর্মুহু আন্দোলিত হচ্ছে

সেগুলি এমন বাক্‌প্রতিমায় সমাবেশিত হয় যার সীমানা অনির্ধারিত অথচ যার স্বরূপ অভিজ্ঞতাসাধ্য। এ যেন সমুদ্রবক্ষ, তার উপরিতল নিয়ত অস্থির অথচ তার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি। শেক্‌স্‌পিয়রের 'অ্যান্টনি ও ক্লিওপাট্রা' নাটকে পরাস্ত অ্যান্টনি সহচর ঈরস্‌কে বলছেন: আকাশে সদা পরিবর্তনশীল মেঘের খেলা দেখেছ কি? তা'র আকৃতি বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। যে-আকৃতি এখন দেখছ তা'র ধারণা তোমার মনে সুস্পষ্ট হওয়ার আগেই সে-আকৃতি যেন গলে' গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই সে-বিগলিত উপাদানে তৈরি হ'ল নূতন আকৃতি।—একথা অ্যান্টনি বলেছিলেন অনিশ্চয় মানব জীবন সম্বন্ধে, বিশেষত নিজ জীবন সম্বন্ধে, কিন্তু এই উৎকৃষ্ট বাক্‌প্রতিমায় আমরা অনায়াসে প্রতীকের স্বরূপ সন্ধান করতে পারি। জীবন কোনো অবিনশ্বর, অচঞ্চল, প্রস্তরদৃঢ় অভিজ্ঞতা নয়, জীবন যেন মেঘের বহু বিচিত্র প্রতিচ্ছবি, কখনো তরুলতা, কখনো ড্রাগন, কখনো গিরিশৃঙ্গ, কখনো সৌধচূড়া—এই পরিবর্তনশীলতার কথা বলছেন অ্যান্টনি। প্রতীকের কোনো সুনির্ধারিত, অবিসংবাদিত ব্যাখ্যা হতে পারে না। যেমন পেঁয়াজের খোসার প্রতিটি স্তরেই পেঁয়াজ, তেমন বহুধাবাসম্পৃক্ত প্রতীকের যে কোনো একটি ধারণাতেই প্রতীকের মর্মার্থ গ্রাহ্য হতে পারে আর সেজন্যই প্রতীক ব্যাখ্যায় সমালোচকে সমালোচকে মতানৈক্য। ব্লেইক ও ইয়েট্‌সের ভাষ্যকারগণ একমত হয়েছেন এমন দেখা যায় না। স্মরণ আছে আমার ছাত্রাবস্থায় স্বর্গত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'চয়নিকা' পড়াবার কালে "সোনার তরী'র দশ বারোটি ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছিলেন। সে কালে এই ব্যাখ্যাবাহুল্যে অসুখী বোধ করেছিলাম, আমার তরুণচিত্ত তখন চেয়েছিল নির্দিষ্ট ভাবার্থ। আজ বুঝতে পারি ঐ ব্যাখ্যাগুলির সব কয়টিই "সোনার তরী"র প্রতীকে অন্তর্লীন, ব্যাখ্যাগুলির আপাতবিরোধ আসলে একই সৃজনী-শক্তির নাভিকেন্দ্রে সম্মিলিত।

অজিত দত্ত-র "খাণ্ডব দাহন" মহাভারতীয় কাহিনী থেকে প্রতীক খুঁজে পেয়েছে। খুশি হয়, পাঠক মনে করতে পারেন পৌরাণিক কাহিনীতেই কবিতাটির অভিধা সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু পাঠক আরো এগিয়ে যেতে পারেন অভিধাসন্ধানে। তখন কালান্তক দাবানল উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে প্রতীকার্থে, যে-প্রতীক দিয়ে বুঝতে পারি চিরন্তন দহ্যমান সংসারী মানবের জীবন, বুঝতে

পারি আধুনিক সভ্যতা, হয়তো বুঝতে পারি বিভক্ত বঙ্গের সর্বনাশা আগুন যাতে—

নগণ্য জীবন-লীলা হয়ে যাক নিঃশেষে নির্মূল,
জীবনের অবশিষ্ট চিহ্ন থাক এক মুঠো ছাই,

* * *

তবু যত বহ্নি জ্বলে, অগ্নিশিখা ঘেরে চারিভিতে
তত মোরা মাঠে-ঘাটে নীড়-বাঁধা খড়-কুটা খুঁজি।

প্রতীকী সাহিত্যে বহু সম্পর্কের সংযোগ কেন্দ্র একথা স্মরণ রাখলে আমাদের সাহিত্য সম্ভোগ যুগপৎ তীক্ষ্ণতর ও প্রশস্ততর হবে। সে-সম্ভোগে অনুভূতি ও মনন মিলবে গঙ্গাযমুনার অনির্ণেয় মিলন রেখার মতো, তাতে থাকবে বহু ভাব-সম্পৃক্তির প্রত্যাশা, পাঠকের চিত্ত একটি মাত্র ব্যক্তার্থের নিগড়ে আবদ্ধ থাকবে না। কয়েকটি ছত্র লক্ষ্য করছি :

(১) জন সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?

(২) এ কি এল যুগান্তর! নব অবতার কোন্! কার আগমনী!
এ যে দস্যুদল!
সুভদ্রা আমার!
লুব্ধ যাযাবর! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী।

(৩) তাল তাল সোনা উত্তম উত্তর : ছুঁড়ে তো মারা যায় না ?
গলিতে গলিতে মেশাই রোদ্দুরে, দাঁড়ের ময়নাকে দিই বায়না
গান শোনায় বনের ; চোখে আছে, আমার চাল্‌সের চোখেও,
গাঁয়ে গঙ্গার উপর
শুভ্র ধাপ, তেতুল গাছের ঝিলমিল্, প্রাণের ছাঁদ মেলাই রূপোর
চন্দ্রহারে, দোলাই কানের দুলে, আমার উত্তর মণিতে বাঁধি।

(৪) কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে
নক্ষত্রের থেকে আরো নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
আরো বড় বিষয়ের হাতে
সে সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কি এক গভীর সুসময় !
মকরক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন :
—তবুও তা পৃথিবীর নয় ;
এখন গভীর রাত হে কালপুরুষ,
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

(৫) তবুও ভোরের বেলা বারবার ইতিহাসে সঞ্চারিত হয়ে
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হয়ে,—
যদি না সূর্যাস্তে ফের হয়ে যায় সোনালি হেঁয়ালি।

উপরের প্রতিটি উদ্ধৃতিতে একাধিক ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমালোচকের বিশ্লেষণ প্রযুক্ত হবে পৃথক ভাবগুলির স্বতন্ত্র স্বরূপে, তারপরে সমালোচক বিচার করবেন কি ভাবে ভাবগুলি কেন্দ্রীকৃত হ'ল। কোল্‌রিজ্ বলেছেন,

A symbol is characterized by the translucence of the special in the individual, or of the general in the special, or of the universal in the general ; above all by the translucence of the eternal through and in the temporal It always partakes of the reality which it renders intelligible ; and while it enunciates the whole, abides itself as a living part in that unity of which it is the representative....It is very possible that the general may be working unconsciously in the writer's mind during the construction of the symbol

বিশেষার্থের মধ্যে বৃহত্তর ব্যপ্তার্থ, অনিত্যের মধ্যে নিত্য, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি কি ভাবে সংমিশ্রিত হ'য়ে সমগ্র সাহিত্যে প্রোজ্জ্বল হয়, একের দীপ্তিতে অপরে উদ্ভাসিত হয়, প্রতীকবিচারী সমালোচনা সে-বিশ্লেষণে নিযুক্ত।

(৪)

প্রতীক বিচারে আরো দু'টি বিষয় স্মর্তব্য। সাহিত্যে প্রতীক দু'ভাবে প্রযুক্ত হ'তে পারে। কাব্যের প্রতীকগুলি বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে, অর্থাৎ প্রতিটি সৃষ্টি-কর্মে আলাদা আলাদা প্রতীক তাৎক্ষণিক সৃষ্টির জন্যই উদ্ভাবিত হ'তে পারে, কবিতার পরে কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকগুলি সমশৃঙ্খলিত না-ও হ'তে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতীক-পরায়ণতা কবির পক্ষে সাময়িক আঙ্গিক অবলম্বন মাত্র। কবিকর্মে তাঁর যে বিশেষ একটি "মূড্" এসেছে সে'টি অ ধরাকে ধরার চেষ্টায় ঋজু ভাষা ছেড়ে তির্যক ভাষা অবলম্বন করল আর এই চেষ্টার ফলে সেই তির্যক ভাবগুলি কোনো একটি প্রতীকের নাভিমূলে কেন্দ্রীভূত হ'ল। কবির অভ্যস্ত চিন্তাধারা প্রতীকী না-ও হ'তে পারে, বিশেষ প্রয়োজনে তিনি প্রতীকের শরণাপন্ন হয়েছেন। এহেন তাৎক্ষণিক প্রতীক, আমার বিবেচনায়, আধুনিক বাঙলা কাব্যে প্রচুর। পক্ষান্তরে কোনো কোনো কবির সমগ্র চিন্তাধারা, মূল সৃজনী শক্তিই প্রতীকপন্থী, তাঁদের বিশ্ববীক্ষা প্রতীকোদ্ভাসিত, প্রতীক অবলম্বন ছাড়া তাঁরা চিন্তায় অভ্যস্ত নন। প্রতীকধর্মী বিশ্ববীক্ষা সকল কবির মধ্যে দেখা যায় না, বস্তুত প্রতীকী চিন্তা এ যুগের সংক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত জীবনযাত্রার বিশেষ প্রতিভাস, অবদমিত চিত্তবৃত্তি ও বীতনিষ্ঠ চিন্তনের উর্ণজাল এড়াবার উৎকৃষ্ট উপায়। এ যুগের ইওরোপে আলেকজাণ্ডার ব্লক, স্টেফান গিয়র্গ, পল ভালেরি, ইয়েট্‌স্ প্রভৃতি যে কয়েকজন কবি প্রতীক-পথে চলেছেন তাঁদের কাব্যের সুন্দর বিশ্লেষণ ইংরেজ সমালোচক স্যর মরিস বাওরা-র পুস্তকে পাওয়া যায়। এহেন সার্বিক প্রতীকতা কোনো বঙ্গীয় কবির মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয় না যদিও জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে প্রতীক পথে বহুদূরগামী। প্রতীকবিচারী সমালোচক অবশ্য তাৎক্ষণিক প্রতীকতা ও সার্বিক প্রতীকতায় তারতম্য করবেন।

দ্বিতীয় স্মর্তব্য বিষয় যে প্রতীকের প্রকৃতিতে যেন আমদরবার ও খাসদরবার দু'টি দরবার আছে। প্রতীকটি হতে পারে নেহাতই কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতায় সম্বন্ধ, অপরের চিত্তে তার কোনো সরাসরি আবেদন অনুপস্থিত। এরকম private symbol, খাসমহলী প্রতীক, আধুনিক সাহিত্যে (বিশেষত কাব্যে) প্রচুর, এমনকি বলা চলতে পারে খাসমহলী প্রতীক ছাড়া আধুনিক কাব্যে প্রতীক নেই। রিল্‌কে বা ভেরহায়রেন যত প্রতীকের ব্যবহার

করেছেন তার সবই তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। সে-প্রতীকের ইঙ্গিত অনুধাবন করতে হ'লে কবির শিল্পব্যক্তিত্ব ছাডা সাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যে-কালে কবির সঙ্গে পরিবেশের বিচ্ছেদ ঘটেনি, কবির ব্যক্তিজীবন ও পারিবেশিক জীবন ছিল সঙ্গত, সে-কালে পরিবেশের সাধারণ ধারণা ও প্রত্যয়গুলিতেই কবি শক্তিশালী প্রতীকের উপকরণ পেতে পারতেন। তাঁর নিজস্ব প্রত্যয় ও পারিবেশিক প্রত্যয়ে কোনো ব্যবধান বড একটা থাকত না বলেই তাঁর প্রতীকগুলি সরাসরি পাঠক চিত্তে প্রবেশ করত। বৌদ্ধ দোঁহা, ষোডশ শতকী বৈষ্ণব কাব্য ও পরবর্তী কালের শ্যামাসঙ্গীত অজস্র প্রতীকে সমৃদ্ধ কিন্তু সে প্রতীক public symbol, খাসমহলী প্রতীক, সে-মহলের প্রশস্ত দ্বারপথে যে কোনো পাঠক অল্পায়াসে প্রবেশ করতে পাবেন। প্রতীকপ্রকৃতির এই দ্বৈততা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশমাত্র, এবং সন্ধানী সমালোচকের কর্তব্য দ্বৈততার হেতু বিশ্লেষণ করা কিন্তু সর্বোপরি সমালোচকের কর্তব্য প্রতীক বিশ্লেষণের সাহায্যে কাব্যের সৃষ্টিমূলে প্রবেশের প্রয়াস কেননা শিল্পজাত মায়াবী গোপন কক্ষের উৎকৃষ্ট সন্ধান সবচেয়ে ভালো মিলবে প্রতীক বিচারে।

পঞ্চম প্রস্তাব : মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা

(১)

আজ থেকে একশো বছরেরও আগে জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ লক্ষ্য করেছিলেন যে আধুনিক সাহিত্য—আধুনিক সাহিত্য বলতে তিনি বুঝতেন ফরাসী বিপ্লবোত্তর সংস্কৃতি ও সাহিত্য—আশ্চর্যরকমে আত্মসচেতন। বাস্তবিক এত তীক্ষ্ম আত্মসচেতনতা ইতিহাসের অন্য কোনো যুগেই মানবচিত্তকে এমন অনিবার্যভাবে আচ্ছাদন করেছিল বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণকান্তের উইলে" 'সু' ও 'কু'র অবতারণা করেছিলেন বটে কিন্তু ভালো ও মন্দর দোটানা বিশেষভাবে আধুনিক নয়, মানবচিত্তে ও শিল্পে সে-দোটানা অতি প্রাচীন-কাল থেকেই প্রকট। স্বতন্ত্ররূপে ভালো ও মন্দ নয়, বরং বলা চলে যে সৎ ও অসতের, অসৎ ও সতের এককালীন প্রকাশেই আধুনিক আত্মসচেতনতার বৈশিষ্ট্য। বরং আরো বলা চলে যে যা' সৎ নয় অসৎও নয় এমন

নির্বিশেষের সঙ্গে সমতুল্য নির্বিশেষের সমপ্রকাশেই আধুনিক আত্মসচেতনতা সবচেয়ে বেশি প্রকট। একদা কবি গাইতে পেরেছিলেন 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু নয়ন না তিরপিত ভেল'। লক্ষ যুগের কথা ছেড়েই দিলাম, আত্মসচেতন আধুনিক কবি মাত্র একটি প্রণয়মদির রজনীর অবসানে বলেন :

Last night, ah yesternight, bewixt her lips and mine
There fell thy shadow, Cynara ! thy breath was shed
Upon my soul between the kisess and the wine ;
And I was desolate and sick of an old passion,
Yea, I was desolate and bowed my head.

অনুভূতি যখন বহুব্যাপ্ত বহুস্তরী হয়, মানবচিত্ত যখন অবৈকল্যে বঞ্চিত হয়ে খণ্ডিত প্রতীতির সমষ্টিতে পরিণত হয়, শিল্পীর শিল্পচেতনা যখন নিজের বহুধা-বিভক্ত চিত্তবৃত্তিগুলিকে শিল্পায়িত করার প্রয়াস পায় তখন তাঁর শিল্প আত্মসচেতন হ'তে বাধ্য। এই বহুব্যাপ্তির অর্থে, বহুধা-বিভাগের অর্থে শিল্প বিশেষভাবে আত্মসচেতন হ'তে আরম্ভ করে উনিশ শতকের শেষার্ধে। শুধু শিল্পীচিত্তই নয় বস্তুত সাধারণভাবে সমগ্র মানবচিত্তই আত্মসচেতন হ'য়ে উঠল ঐ সময়টাতে। আত্মসচেতনতার এই প্রবল প্রসারের পেছনে নানাবিধ ঐতিহাসিক কারণ অবশ্যই ছিল কিন্তু বর্তমান আলোচনায় সে সব কারণের চেয়েও বেশি দ্রষ্টব্য মনস্তত্ত্ববিদ্যার, মনোবিদ্যার ('সাইকলজি') দ্রুত বিস্তৃতি ও প্রভাব। সাইকলজি বা মনোবিদ্যা অবশ্য উনিশ শতকের সৃষ্টি নয় কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে উনিশ শতকেই এ-বিদ্যা নিজ মাহাত্ম্যে বিজ্ঞান বলে পরিচিত হ'ল। আর যেদিন থেকে বিশেষভাবে মনোবিদ্যার চর্চা শুরু হ'ল প্রায় সেদিন থেকেই মনোবিৎ ও শিল্পী মেনে নিলেন যে এ-বিদ্যার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ঘনিষ্ঠ তো হবেই কেননা একই আত্মসচেতনতা-ব্যাপ্তি থেকে আধুনিক শিল্প ও আধুনিক মনোবিদ্যা উদ্ভূত।

আধুনিক শিল্পের যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করি, এর অনন্যতা ও নবত্ব যদি আমাদের দৃষ্টিসাধ্য হয় তাহলে একথা বোধ হয় অগ্রাহ্য হবে না যে মানব চেতনা সম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৌতূহল আধুনিক শিল্পের প্রধান বিষয়বস্তু, মনোবিশ্লেষণের অনেক বৈজ্ঞানিক প্রণালী আধুনিক শিল্পের বহু-অবলম্বিত আঙ্গিক। উনিশ শতকের শেষাংশে ও বিশ শতকের এতাবৎ কয়েকটি

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী মানবচিত্তকে (তথা, শিল্পীচিত্তকে) প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। এইকালে সিনেমা, রেডিয়ো প্রভৃতি কতকগুলি যন্ত্রের প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সমাজের ও শিল্পের আচরণে, কিন্তু এ-সমস্ত যন্ত্র ও এ-সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীও মনোবিদ্যাচর্চার ও মনোবিশ্লেষণের এলাকার বাইরে নয়। শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী হ'তে পারে ক্যাথলিক অথবা তান্ত্রিক, কম্যুনিস্ট অথবা ভূদানপন্থী ; শিল্প প্রধানত চিত্রধর্মী হ'তে পারে অথবা গীতিধর্মী, হ'তে পারে বর্ণনাপ্রবণ অথবা কথোপকথনসর্বস্ব, কিন্তু মনোবিদ্যার সর্বপ্রসারী প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে না আধুনিক শিল্পের কোনো শাখাই।

শিল্পের উপরে মনোবিদ্যার অভিঘাত কয়েকদিক থেকেই আমাদের লক্ষ্য-সাধ্য। (১) মনোবিদ্যার কোনো কোনো তত্ত্বের সাহায্যে আমরা বিচার করতে পারি কোন্ মূল চিত্তবৃত্তি থেকে শিল্পীর সৃজনীপ্রতিভা উৎসারিত হ'য়ে থাকে। (২) শিল্পের আঙ্গিকে স্রষ্টার অবচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশগুলির বিশ্লেষণ ক'রে আমরা শিল্পীজীবন, শিল্পী চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। (৩) শিল্পের ইমেজ বা প্রতিমাগুলি মনোবিদ্যাগ্রাহ্য ব্যাখ্যার সাহায্যে বুঝতে পারি। (৪) শিল্পী স্বয়ং হয়তো মনঃসমীক্ষণের কোনো কোনো পদ্ধতি চতুর সতর্কতায় নিজ শিল্পে প্রয়োগ করেছেন, সে প্রয়োগে আমাদের রসসম্ভোগ বাড়তে পারে, মনে হ'তে পারে শিল্প বেশি পরিমাণে রিয়ালিস্টিক। (৫) সমালোচক হিসাবে আমরা মনঃসমীক্ষণের কতকগুলি পদ্ধতি শিল্পবিচারে প্রয়োগ করতে পারি।

শিল্পের উপরে মনোবিদ্যার আরো কয়েকপ্রকার অভিঘাত অসম্ভব নয়, তবে এই কয়টিই আমার লক্ষ্যগোচর হয়েছে, আর অন্য কোনও অভিঘাত থাকলে তা হয়তো উপরোক্ত প্রকার কয়টির অন্তর্ভুক্তই হবে। এ-অভিঘাতের প্রকারগুলি আসলে তিনটি শ্রেণীতে পড়ে। মনোবিদ্যার সাহায্যে আমরা সৃজনী প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে পারি। মনোবিদ্যা থেকে সাহায্য পেতে পারেন শিল্পী, কী শিল্পবিষয় নির্বাচনে কী শিল্পের প্রকরণে। তৃতীয়ত, মনোবিদ্যার বিশ্লেষণপদ্ধতি অবলম্বনে শিল্পসমালোচকের আলোচনাপদ্ধতি সমৃদ্ধতর হতে পারে। বর্তমান আলোচনায় এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত অভিঘাতই প্রাসঙ্গিক তবে অন্য শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য নিতান্ত অবান্তর না-ও হতে পারে।

আধুনিক মনোবিৎ শিল্পীকে অ-সামান্য মনুষ্য বলেই জ্ঞান করেছেন। শিল্পীর সম্বিৎ অ-সামান্য সম্বিৎ, সুতরাং মনঃসমীক্ষণের আওতায় এসে পড়ে। শিল্পীর সম্বিৎ যে-অবস্থায় সৃজনপ্রবণ হয় সে-অবস্থা—মনঃসমীক্ষকের বিচারে —একপ্রকার নিউরসিস্। ফ্রয়েড এই চিত্তবিকারের বর্ণনা দিয়েছেন :

The artist is originally a man who turns from reality because he cannot come to terms with the demand for the renunciation of the instinctual satisfaction as it is first made, and who then in phantasy-life allows full play to his erotic and ambitious wishes. But he finds a way of return from this world of phantasy back to reality ; with his special gifts, he moulds his phantasies into a new kind of reality, and men concede them a justification as valuable reflections of actual life. Thus by a certain path he actually becomes the hero, king, creator, favourite he desired to be, without the circuitous path of creating real alterations to the outer world.

—*The Relation of the Poet to Day-dreaming.*

উদ্ধৃতাংশের ভাবার্থ এ রকম : মানুষের সহজ প্রবৃত্তিজাত যে সব আদিম আকাঙ্ক্ষা বাস্তবজীবনে চরিতার্থ হ'তে পারে না সেগুলিকে কালক্রমে ত্যাগ করতেই হয়। শিল্পীর পক্ষে এই ত্যাগ দুঃসাধ্য, অতএব যে-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবজীবনে পূর্ণ হয়নি শিল্পী তাকে চরিতার্থ করেন আপন phantasy-তে, কল্পনালোকে [যাকে গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছেন 'মনোলৌল্য']। কিন্তু এই মনোলৌল্য থেকে জড়জীবনে ফিরে আসারও একটা পথ খুঁজে বার করেন শিল্পী। যে-বিশেষ অন্তঃশক্তিতে তিনি শিল্পী, সে-শক্তির প্রয়োগে তিনি কল্পনাগুলিকে এক নূতন বাস্তবতায় রূপায়িত করেন, আর অপর লোকে তারিফ ক'রে বলতে থাকেন যে শিল্পীর বাস্তবতা জড়জগতের বাস্তবতারই অনুরূপ। এমনি ক'রে শিল্পী হ'য়ে পড়েন নায়ক, নৃপতি, স্রষ্টা ইত্যাদি, যা তিনি হ'তে চেয়েছিলেন অথচ হ'তে পারেননি, কেননা বাস্তবিক এ-রকম হ'তে হ'লে বাইরের জড়জগতে অনেক সুকঠিন পরিবর্তন সাধন করতে হ'ত।

শিল্পের এই ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার অতীব সুষ্ঠু সমর্থন পাওয়া যায় জীবনানন্দ-র কয়েকটি ছত্রে :

মরমের যত তৃষ্ণা আছে,—
তারি খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে
তোমরা চলিয়া আস,—
তোমরা চলিয়া আস সব !—
ভুলে যাও পৃথিবীর ঐ ব্যথা—ব্যাঘাত—বাস্তবে।···
সকল সময়
স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তরে,—
পরস্পরে যারা হাত ধরে
নিরালা ঢেউয়ের পাশে-পাশে,—
গোধূলির অস্পষ্ট আকাশে
যাহাদের আকাঙ্ক্ষার জন্ম—মৃত্যু,—সব,—
পৃথিবীর দিন আর রাত্রির রব
শোনে না তাহারা !
দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি,—
তবে ঐ পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
লিখিতে যেও না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা।—

উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয় !
পৃথিবীর পুরানো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার,—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয় !

শিল্পপ্রকৃতির এ-ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী বটে কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যার চেয়ে এর গ্রাহ্যতা বেশি নয়। এ-ব্যাখ্যা সব রকম শিল্প সম্বন্ধে খাটে না. এর প্রয়োগপরিধি সঙ্কীর্ণ। সর্বোপরি. ফ্রয়েড শিল্পের মৌল সৃজনীশক্তি সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। With his special gifts (যে-বিশেষ অন্তঃশক্তিতে তিনি শিল্পী) এই কথা কয়টিতে শিল্পীর সৃজনীশক্তির উল্লেখ মাত্র করেছেন বটে, সে-সৃজনীশক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেননি। অতএব ইস্‌থেটিক্‌স্‌-শাস্ত্রে ফ্রয়েডের এ-ব্যাখ্যা উঁচু পর্যায়ে পড়ে না, সমালোচনার পদ্ধতিতে এ-ব্যাপারের প্রয়োগযোগ্যতা খুবই সীমাবদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্যে বহু লেখক মনঃসমীক্ষণের কোনো কোনো পদ্ধতি নিজ নিজ শিল্পে প্রয়োগ করেছেন, সে-প্রয়োগে অভিনবত্ব যে-পরিমাণে. সার্থকতা তার চেয়ে ন্যূন নয়। ইওরোপীয় শিল্পে যাকে stream of consciousness বলা হয়েছে, সেই সম্বিৎপ্রবাহকে শিল্পে ধরে' রাখার সফল প্রয়াস বাঙলা সাহিত্যেও দুর্লভ নয়। একদা জীবনের বহিরঙ্গই ছিল শিল্পের বিষয়বস্তু। যে-স্থূল জড়কর্ম, যে-বহির্জীবন ছিল সকল মানুষেরই দৃষ্টিসাধ্য, শ্রুতিসাধ্য ও স্পর্শসাধ্য, সে-জীবন প্রকাশ করতেই শিল্পী ব্যস্ত থাকতেন। এই বহির্জীবনের ভিত্তিতে যতখানি অন্তর্জীবন, যতগুলি মনোবৃত্তি সৌধায়িত করা সম্ভব তা তাঁরা করতেন কিন্তু শিল্পে এমন কোনো অন্তরঙ্গের স্থান ছিলনা যা বহিরঙ্গবর্জিত। আজ মনোবিদ্যার প্রচণ্ড অভিঘাতের ফলে যাবতীয় শিল্প ক্রমেই অধিক পরিমাণে অন্তর্জীবনে আশ্রয় নিচ্ছে। আধুনিক ধারণায় মানবসত্তার প্রকৃত পরিচয় স্থূল ঘটনায় নয়, প্রকৃত পরিচয় মনোবৃত্তির প্রবাহী ধারায়। অতএব এই প্রবাহী ধারা আধুনিক শিল্পের বিষয়বস্তু। এই কারণেই টলস্টয়ের গল্পে পাতার পরে পাতায় কোনো স্থূল ঘটনা ঘটছে না, আমরা শুধু জানতে পারি জনৈক মুমূর্ষু ব্যক্তির সম্বিতে কত ভাবনা যাচ্ছে আর আসছে। এই কারণেই প্রুস্তের উপন্যাসে শতাধিক পৃষ্ঠার বর্ণনায় একটি মাত্র স্থূল কার্যই পাওয়া যায়—জনৈক ব্যক্তি প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠলেন, গায়ের আড়মোড়া ভাঙলেন আর জানালা দিয়ে নিচে রাস্তার দিকে তাকালেন। এই কারণেই মেটারলিঙ্কের নাটকে স্ত্রীপুরুষ মুখোমুখি বসে' নিরুত্তেজ দীর্ঘ কথোপকথনে নিযুক্ত থাকতে পারেন। আর এই কারণেই এ-যুগে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের মন্থরগতি উপন্যাসগুলির ও লরেন্স স্টার্নের খামখেয়ালি উপন্যাসের কদর বেড়ে গেছে।

(৩)

আধুনিক শিল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকরণই মনোবিদ্যা থেকে আহৃত। চিত্রশিল্পে ইম্‌প্রেশানিজম্‌ ও একস্‌প্রেশানিজম্‌, চিত্রশিল্পে ও সাহিত্যে সুরিয়ালিজ্‌ম্‌ মনোবিদ্যার কাছে অশেষভাবে ঋণী। যদি শুধু সাহিত্যের কথা চিন্তা করি তাহলে মনে পড়বে আধুনিক নাটকে একাধিক দৃশ্যের বা ঘটনার সমকালীন অবতারণা, স্বগতোক্তির অকৃপণ প্রয়োগ, কয়েকটি চরিত্র-প্রণালী। মনে পড়বে আধুনিক উপন্যাসের নিবিড় অন্তর্মু‘খীনতা, কাহিনীর অনবরুদ্ধ প্রবাহ, ঘনীভূত চরিত্রণ। মনোবিদ্যা থেকেই আমরা পেয়েছি Internal Monologue ("মৌন স্বগতোক্তি" ?), যার প্রভূত প্রয়োগ দেখতে পাই আজকালকার উপন্যাসে, নাটকে, জীবন-চরিতে, কাব্যে, কী চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে, কী একাধিক অনুভূতির যুগপৎ অভিব্যক্তিতে।

মনে পড়ে,—শোনো,—মনে পড়ে
নবমী ঝরিয়া গেছে নদীর শিয়রে,—
(পদ্মা—ভাগীরথী—মেঘনা—কোন্‌ নদী যে সে'—
সে সব জানি কি আমি !—হয়তো বা তোমাদের দেশে
সেই নদী আজ আর নাই,—
আমি তবু তার পাড়ে আজো তো দাঁড়াই !)

—জীবনানন্দ দাশ, "পরস্পর"

পাশাপাশি দু'টি কণ্ঠস্বর বিদ্যমান: একটি উচ্চকিত, শ্রোতার উদ্দেশে নিবেদিত, অপরটি অনুচ্চারিত, অথচ দু'টি স্বরে মিলেছে সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশের জন্য, একটি স্বর আলগোছে মিলে গেছে অপরটির সঙ্গে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক:

আলো-ভরা বড়ো রাস্তা, লোক-ভরা, কোলাহল-চলাচল-ভরা—
(দু'জনায় গল্প জমিয়াছে !)
অনেক স্রোতের মতো দিকে-দিকে গর্জিছে ট্র্যাফিক,
ঝরিছে অজস্র আলো, মোটারের, দোকানের, ইলেকট্রিকের—
(বোবা ওরা, বোকা ওরা, স্তব্ধতায় মুখোমুখি বসে ছিলো ওরা,
আমরা অনেক কথা বলি,
আমরা অনেক কথা শুনি,

আলোটা সিঁড়িতে রেখে গল্প করি—গল্প করি আমরা দু'জন।)

—বুদ্ধদেব বসু, "অন্ধকার সিঁড়ি"

এখানে দু'টি সুরে মিলে একীভূত হয়নি, তা'রা আলাদা রয়ে গেছে, আর তেমনটি রাখাই কবির উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। একটি সুর শুধু বর্ণনা করে যাচ্ছে: ছেলেটি ও মেয়েটি যতক্ষণ ঘরে ছিল, ছিল নীরব আড়ষ্ট; এখন প্রত্যাসন্ন বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তটিতে, সদর রাস্তার আলো চলাচল কোলাহলের সন্নিকটে এসে জমল তাদের গল্প। এ-বর্ণনার মাঝখান দিয়ে কেটে বেরিয়েছে একটি মন্তব্য, সে-মন্তব্য ছেলেটির নিজেরই সম্বন্ধে অথচ সে যেন একটা নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য। ছেলেটি যেন তার আধঘণ্টা আগের সত্তাকে দূর থেকে বিচারকের দৃষ্টিতে দেখছে—"বোবা ওরা, বোকা ওরা"—কেননা সেই আগের নীরব সত্তার তুলনায় এখন "আমরা অনেক কথা বলি, আমরা অনেক কথা শুনি"। ছেলেটির আত্মসমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে মৌন স্বগতোক্তিতে। সাহিত্যের প্রকরণ হিসাবে মৌন স্বগতোক্তি আধুনিক সাহিত্যে অতীব মূল্যবান আর এ-প্রকরণের উৎস মনোবিদ্যায়।

(৩)

যাকে বলে ভাবানুষঙ্গ—association of ideas—তা'র তত্ত্ব একটা নতুন কিছু নয়, আঠারো শতকে হার্টলে ও হিউম এ-তত্ত্বটি ইংল্যাণ্ডে চালু করেছিলেন আর এ-তত্ত্বে বিশ্বাস নিয়ে ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ তাঁর "প্রিলিউড" কাব্য লিখতে বসেছিলেন, কিন্তু সাহিত্য কর্মের প্রকরণ হিসাবে ভাবানুষঙ্গের প্রয়োগ সুরু হয় আধুনিক মনোবিদ্যার যুগেই। ভাবানুষঙ্গের দু'টি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাক:

পাহাড়তলীতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে,
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

—রবীন্দ্রনাথ, "শিশুতীর্থ"

মৃতরাক্ষস, বুকচাপা দুঃস্বপ্ন, আর ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তিনটি বাক্‌প্রতিমাই এক ভাবানুষঙ্গের সূত্রে অনুস্যূত, তিনটিতেই মৃত্যু ও ধ্বংসের বিকার সূচিত হচ্ছে।

ছত্র কয়টির কাঠামো তর্কের বা যুক্তির বাঁধুনিতে নয়, ভাবানুষঙ্গে সম্পৃক্ত অনুভূতিতে। এই কবিতাতেই নিচের ছত্র কয়টি মেলে :

তাতে একত্রে মিলেচে পরশ্রীকাতরের কানাকানি,
কুৎসিত জনশ্রুতি, অবজ্ঞার কর্কশ হাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্চে,
মশালের আলোর ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।

এখানেও উপমা দু'টি ভাবানুষঙ্গে মিলেছে। পরশ্রীকাতরতা, জনশ্রুতি ও অবজ্ঞার অন্যতম ভাণ্ডার ইতিহাসে। পরশ্রীকাতরতা, জনশ্রুতি ও অবজ্ঞায় মণ্ডিত হয়ে ঐতিহাসিক নরনারী (অথবা তাদেরই সমতুল্য কাব্যোক্ত মানুষেরা) বিকৃতদর্শন হয়ে পড়েছে। এমন কথা বলা যায় যে উপমা মাত্রেই ভাবানুষঙ্গের দৃষ্টান্ত কিন্তু সেটা উপমার আপাতবিচার মাত্র। প্রধানত ভাবানুষঙ্গ থেকে যে-উপমা উদ্ভূত তা'র লজিক্যাল বাঁধুনি ক্ষীণ, প্রবল তা'র ভাবসমৃদ্ধি আর সে জন্যেই আধুনিক রোমান্টিক কাব্যে ভাবানুষঙ্গ নিয়ত-প্রযুক্ত প্রকরণ। আধুনিক কাব্যের উচ্চারণে যে ঠাস-বুননো বাঁধুনি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় সে-বাঁধুনির জন্য ভাবানুষঙ্গ অনেক পরিমাণে দায়ী। ভাবানুষঙ্গ উপমাতে যেমন পাওয়া যায় তেমনি বাক্‌ধ্বনিতে, পুনরাবৃত্ত বাক্‌প্রতিমায় বা উল্লেখ, বিশেষ শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারেও পাওয়া যায়।

আর কত লাল সাড়ী আর নরম বুক, আর টেরী-কাটা মসৃণ মানুষ,
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী!

—সমর সেন, "নাগরিক"

ছত্রকয়টিতে "আর" শব্দটি পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হওয়াতে স্পষ্টতই ভাবানুষঙ্গের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। "লাল সাড়ী", "নরম বুক", "টেরী-কাটা মসৃণ মানুষ" ও "মহানগরী"-র অনুষঙ্গ আদৌ দুর্বোধ্য নয়। অন্য কয়েকটি তুলনীয় ছত্র উদ্ধৃত করা যাক :

বড়োবাজারের উপল উপকূলে

জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক্
আর দীর্ঘশ্বাস
বড়োবাবুর গঞ্জনায়
বড়ো সাহেবের কটা চোখের ব্যঞ্জনায়
দাম্পত্যমিলনের শ্রান্ত সম্ভাবনায়
অপত্যাধিক্যের অনুশোচনায়

—বিষ্ণু দে, "টপ্পা-ঠুংরি"

উদ্ধৃত এ-অংশেও ভাবানুষঙ্গের সহায়ক হিসাবে "আর" শব্দটি পুনঃপ্রযুক্ত হয়েছে, বড়োবাজার বড়োবাবু ও বড়োসাহেবের "বড়ো" শব্দটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে, তা'ছাড়া গঞ্জনায়-ব্যঞ্জনায়-সম্ভাবনায়-অনুশোচনায় এ-চারিটি শব্দের অনুপ্রাসে ভাবানুষঙ্গ নিবিড়তর হয়েছে। এক্ষেত্রেও ভাবানুষঙ্গ স্বচ্ছ ও সরল, এর করণকৌশলে যদি বা কিঞ্চিৎ নবত্ব আছে, মহত্ত্ব কিছু নেই, বরং বলা যায় এ কৌশল খানিকটা বালসুলভ। পক্ষান্তরে যে-ভাবানুষঙ্গ পুনরাবৃত্ত বাক্প্রতিমার উপরে অথবা উল্লেখের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে-ভাবানুষঙ্গ হৃদয়ঙ্গম হওয়া সতর্ক চিন্তাসাপেক্ষ কেন না তা'র গড়নে কবিকৃতি অনেক বেশি জটিল ও কুশলী আর তা'র রেশ থেকে যায় পাঠকের স্মৃতিতে দীর্ঘকাল। এহেন জটিল ভাবানুষঙ্গের দৃষ্টান্ত আধুনিক শ্রেষ্ঠ ইংরেজি কবিতায় প্রচুর মেলে, আধুনিক বাঙলা কাব্যেও দুর্লভ নয়। বিষ্ণু দে-র "ওফেলিয়া" ও "ক্রেসিডা" এ-দু'টি কবিতায় বাক্প্রতিমার ও উল্লেখের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। "ক্রেসিডা" কবিতাটির ভাবকেন্দ্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন কবিবন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত "চোরাবালি" কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায়। যদিচ সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন যে কবিতা মাত্রেই অনির্বচনীয় আর উৎকৃষ্ট কাব্যের মর্মোদ্ঘাটন তাঁর অভিপ্রেত নয় তথাপি সুধীন্দ্রনাথের দ্যোতনা-সমৃদ্ধ সংক্ষিপ্তসারের উপরে নির্ভর ক'রে কেউ যদি কবিতাটির মর্মোদ্ঘাটন নয়, তা'র ভাব-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন, তা'হলে এ-কবিতাটিতে ভাবানুষঙ্গের গুরুত্ব তিনি অবশ্য বুঝতে পারবেন। পাঠক সর্বক্ষেত্রে বিষ্ণু দে-র অনুষঙ্গ-প্রয়োগে ও উল্লেখ-কৌশলে প্রবেশ না-ও করতে

পারেন (আমি পারিনি বলেই আমার আশঙ্কা হচ্ছে) কিন্তু কয়েকটি অনুষঙ্গ ও উল্লেখ নিশ্চয় তাঁকে হাতছানি দেবে আরো এগিয়ে যাবার জন্য। কবিতার কোনো কোনো স্তবকে স্বৈরিণী ক্রেসিডার ও অন্যত্র অমর রূপবতী হেলেনের উল্লেখগুলি অসংলগ্ন নয় ; ক্রেসিডার থমকানো চোখে বরাভয় চমকায়, তা'র আশ্লেষের পরিণাম মহারাজ দক্ষের ক্রতু ধ্বংসের সঙ্গে তুলনীয় (৪ স্তবক) ; তা'র বাক্যের পরিমণ্ডলে ভিড়-করা মেঘের ঠেলাঠেলি, ঈশান বিষাণ ও দিশাহারা বজ্র (৮ স্তবক) ; তা'র প্রভাবে যে বিভ্রম জন্মে, বৈতরণীর পারে এসে জনহীন তপ্তমরুর ক্লান্ত আঁধারে, কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলায়, সে-বিভ্রম-মোচনার্থে খুঁজতে হয় প্যাণ্ডারুসকে (২ ও ৯ স্তবক)। [ট্রয়লুাস ও ক্রেসিডার প্রণয়ে দূতের কাজ করেছিল প্যাণ্ডারুস—একথা এ-কাহিনীর সমস্ত কথক মেনেছেন বোকাচ্চ্যো থেকে শেক্‌স্‌পিয়র অবধি]। ক্রেসিডা তা'হলে প্রাচীনাগত রূপকথার "রূপসী সর্বনাশী" (The Fatal Woman)--তা'র প্রণয় অলাতচক্রে চংক্রমণ (১৫ স্তবক) ; তা'র মরণমায়া (২০), তা'র উদ্বায়ুকারী প্রভাব (২১), আজো ট্রয়লুাস-এর স্মরণে শিহরণ আনে—"স্মরণে তোমার হানে আজো তরবারি" (২৪)। ক্রেসিডা-কাহিনীর উল্লেখে হেলেন কী ক'রে এলো ? সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সংক্ষিপ্তসারে সে বিষয়ে কিছু বলেননি, আমার অনুমান হয় ক্রেসিডা-কাহিনীর সঙ্গে হেলেন-কাহিনী সংমিশ্রিত ক'রে বিষ্ণু দে আমাদের চিত্তে "রূপসী সর্বনাশী"র রূপকবোধ দৃঢ়তর করেছেন। একে তো ক্রেসিডা ও হেলেন বাঁধা পড়েছেন একই ধ্বংসলীলার আবর্তে। তা'ছাড়া দু'জনেই প্রথম প্রণয়ঘাতিনী। আর হেলেন তো লোকললামভূতা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা যাঁর জন্য জলেছিল ইলিয়মের আকাশচুম্বী সৌধরাজি! ক্রেসিডার রূপ সম্বন্ধে বোকাচ্চ্যো, চসর্, হেন্‌রিসন্, শেকস্‌পিয়র লিখেছেন অল্পবিস্তর কিন্তু হোমর সে বিষয়ে নির্বাক। তথাপি এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে যাঁর জন্যে রাজকুমার ট্রয়লুাস ও বীর ডাইওমিড্ উভয়েই হৃদয় হারালেন তাঁর রূপও তুচ্ছ নয়। হেলেন ও ক্রেসিডা উভয়েই পরমাসুন্দরী, উভয়েই লোকসংহারের শোকসম্ভারের কারণ। বিষ্ণু দে আমাদের চিত্তে প্রশ্ন জাগাচ্ছেন, "ট্রয়ের প্রাচীর ভঙ্গুর কেন ?" পটভূমিতে দুই রূপসী সর্বনাশী, তা'র সামনে (কবিতাটির যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি) মথিত হৃদয়ের প্রতীকরূপে রজনীগন্ধার উল্লেখ (৬ স্তবক ও ১৮), স্তব্ধতার উল্লেখ (১৬, ২৩ স্তবক)।

এ-কবিতায় ভাবানুষঙ্গের যে-অনুমান আমি উপরে পেশ করেছি তা' যদি ত্রুটিপূর্ণও হয়, যদিও আরো অনেক সূক্ষ্ম-ভাবানুষঙ্গের উল্লেখ আমি করিনি কেননা এ-কবিতার বিশদ বিশ্লেষণ আপাতত আমার মূল কর্ম নয়, তবুও আমার কথাটি থেকে যায় যে আধুনিক কাব্যের প্রকরণ হিসাবে ভাবানুষঙ্গের প্রয়োগ অতি মূল্যবান, কোনো কোনো বাঙলা কবিতায় এ-প্রকরণের সার্থকতা রীতিমতো বিস্ময়কর। যিনি আধুনিক কবিতার নিষ্ঠাবান সমালোচনায় নিযুক্ত হ'তে চান (অথবা আধুনিক কথাসাহিত্যের ও নাটকের) তিনি ভাবানুষঙ্গের প্রয়োগ সম্বন্ধে অবজ্ঞাসম্পন্ন হ'তে পারেন না। ভাবানুষঙ্গের সযত্ন অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, আধুনিক সাহিত্যালোচনার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

(৫)

এই সঙ্গে একথাও বলা দরকার যে ভাবানুষঙ্গ মাত্রেই সার্থক শিল্প নয়। কবি যদি ভাবানুষঙ্গ প্রয়োগ ক'রে থাকেন তা'হলে বুঝতে হবে তিনি মনোবিদ্যার শিল্প-সম্ভাবনায় প্রত্যয়ী কিন্তু তা' থেকে এমন প্রমাণ হবে না যে তাঁর নিজের প্রয়োগও সফল। বিষ্ণু দে-র যে-কবিতাটির সংক্ষিপ্ত সদ্বিধ আলোচনা উপরে করেছি সেটির কথাই ধরা যাক। সবিনয়ে স্বীকার করব যে কবিতাটির কোনো কোনো অংশে যদিও আমি অভিভূত হয়ে'ছ, অন্য কতকগুলি অংশে যদিও অসমৃদ্ধ ঔৎসুক্য বোধ করেছি, কবিতাটির সামগ্রিক কোনো প্যাটার্ন বা ছক আমার বোধগম্য হয়নি আর সেজন্য আমার রসোপলব্ধি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ("সমালোচনার পদ্ধতি"-শীর্ষক প্রস্তাব কয়টিতে আমি এতাবৎ সযত্নে আমার ব্যক্তিগত মত ও প্রতিক্রিয়া পরিহার করেই চলেছি কিন্তু যে-বিশেষ কথাটি সম্প্রতি বলতে চাচ্ছি তা'র জন্য রূঢ় উত্তম পুরুষের অবতারণা করতেই হচ্ছে।) সম্ভবত এ-কাব্যপাঠে আমার সে-পারদর্শিতা নেই যার উল্লেখ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁর ভূমিকায়। পারদর্শিতার সে-অভাব পাঠকের পক্ষেই শোকাবহ কেন না তদ্দরুন তাঁর সঙ্গে কবির "হৃদয়সংবেদ্য সহযোগ" ঘটল না (কথাটি উক্ত ভূমিকা থেকে নেওয়া) আর সেজন্য "সৌন্দর্য কোন্ ছার, সত্যসন্ধানও পণ্ডশ্রম"। বস্তুত কাব্যের communication theoryতে এই হৃদয়সংবেদ্য সহযোগ আসল কথা।

কাব্যের দুরূহতা সম্বন্ধে যে-অভিযোগ পিচ্ছিল রসনায় বহুকথিত, সে-অভিযোগের মূল্য অনুসন্ধানে প্রায় সর্বত্রই আমরা পৌঁছব পাঠকের আলস্যে বা অজ্ঞতায়। হৃদয়সংবেদ্য সহযোগ যে হেতু উভয়পক্ষীয় দায়িত্ব, কবিতার রস গ্রহণের জন্য পাঠককেই বেশি অগ্রসর হ'তে হবে বৈ কি! বিশেষত যখন কাব্যে কোনো নূতন প্রকরণের প্রবর্তনা হয়, পাঠককে তখন বিশেষ ক'রে সমীহিত হ'তে হবে। নূতন চশমা পবার সুড়সুড়িতে যেমন কিছুকাল অভ্যস্ত হ'য়ে চশমাটির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়, এ-প্রকরণের সঙ্গেও নিজের সংবেদনা তেমনি মানাতে হবে। সহযোগের দায়িত্ব সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত কবার পবেও একটা কথা থেকে যায় যে কবিও নিরঙ্কুশ নন. নূতন প্রকবণেব প্রবর্তনায় নিযুক্ত হয়েছেন বলেই সে-প্রবর্তনা কৃতকার্য হয়েছে এমন মনে করাব কারণ নেই! যতই ব'লি না কেন, চবম বিচারে কবিতাটি প্রকরণ নয়, বিষয়বস্তুও নয়, প্রতীক ভাবানুষঙ্গ অলঙ্কার ছন্দ কোনোটাবই সমার্থক নয়। এ সমস্ত ও আরো অনেক উপকরণ কবিতার উপাদান মাত্র। যতগুলি উপাদানের সমষ্টিতে কবিতাটি গড়ে উঠেছে, সেগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তার উপরে একটি সামগ্রিক সত্তা, একটা প্যাটার্ণ বা ছক থাকা চাই, সে-প্যাটার্ণটিই কবিতা কেননা সে-সামগ্রিক শিল্পসত্তায় কবিব তাৎক্ষণিক আপন সত্তা সমুদ্ভাসিত। মিল্‌টন্ চেযেছিলেন মহাকাব্য লিখতে আর সে-মহাকাব্যের সামগ্রিক প্যাটার্ণ এঁকে তোলার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল হাজার হাজার ছত্রের। এলিয়ট যদি ৪৩৩ ছত্রে আধুনিক মহাকাব্য লিখতে পারেন আর বিষ্ণু দে পারেন ৮৪ ছত্রে, তা'হলে ছত্রস্বল্পতার জন্য আপত্তি তো করব না ববঞ্চ তাঁদের সাহসিক নবত্ব সন্ধানে চমৎকৃত হব। কিন্তু সেই সঙ্গে জানতে চাইব এই হ্রস্বীকৃত রচনায় কাব্যের প্যাটার্ণ বিদ্যমান কিনা।

আমার দ্বিধাসঙ্কুল বিবেচনায় বিষ্ণু দে-র "ক্রেসিডা"তে কাব্যের সামগ্রিক প্যাটার্ণ নেই, আছে অংশ বিশেষের ও উপাদান বিশেষের ঔজ্জ্বল্য। আভাস আছে যে ক্রেসিডা-কাহিনীর বহু পর্যায়ী ইতিহাস সম্বন্ধে কবি ওয়াকিবহাল, প্রমাণ আছে যে এ কাহিনীতে কবি পেয়েছেন প্রেমজনিত ট্র্যাজেডির একটি বিশেষ ব্যাখ্যা। কবিতাটিতে আছে প্রতীক, অনুষঙ্গ, উল্লেখ, আছে একাধিক ভাবের সম্পৃক্তি, আছে ভাব ও ভাষার এমন সংক্ষেপীকরণ যেন কবি বাক্যের গোষ্পদে মহাকাব্যের ভাবরাজির আকাশ দর্শন করেছেন। এহেন

সংক্ষেপীকরণ, উল্লেখপ্রবণতা, প্রতীক অনুষঙ্গ ও ভাবের সংগ্রন্থন আধুনিক ইওরোপীয় কাব্যের প্রচলিত প্রকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিষ্ণু দে হয়তো এসব প্রকরণের আদর্শ পেয়েছেন এলিয়টের কাব্যে এমন মনে করা কষ্ট-কল্পনা না-ও হতে পারে। আধুনিক প্রকরণ ও সনাতন প্রকরণে মস্ত প্রভেদ যে সনাতন প্রকরণে ভাবসমুচ্চয় একটা বহিরঙ্গ লজিক দ্বারা গ্রথিত থাকত, কবিতার এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের প্রকাশ্য সংযোগ সম্পর্ক থাকত। আধুনিক প্রকরণে সে-সংযোগ ও সম্পর্ক আদৌ প্রকাশ্য নয়, ভাবসমুচ্চয়ের প্রবাহে কোনো বহিরঙ্গ যুক্তির শৃঙ্খলা প্রায়ই থাকে না, সে-শৃঙ্খলা সংবেদী পাঠক কল্পনা ক'রে নেন প্রতীক উল্লেখ অনুষঙ্গের ইঙ্গিতে। এ-জন্যই আধুনিক কাব্যে অনুষঙ্গ মূল্যবান। বিষ্ণু দে-র "ক্রেসিডা"তে, আমার বিচারে, প্রকরণগুলি উপস্থিত কিন্তু তা'রা এত হ্রস্ব, এত ক্ষীণ (প্রায় অদৃশ্য) সংযোগ সম্পর্ক তাদের, ভাবানুষঙ্গ প্রবহমানতার ও সঙ্গতির এত অভাব যে কবিতার আলাদা অংশগুলি আলাদা-ই রয়ে গেছে, কবির সৃজনীপ্রতিভা কোনো সুঠাম প্যাটার্নে রূপায়িত হয়নি। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রকরণগুলি যেন "চকিত চাতুরীর" শরণ নিয়েই ক্ষান্ত।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোবিদ্যা থেকে আহৃত ভাবানুষঙ্গ আধুনিক সাহিত্যিকের ও সমালোচকের পক্ষে মূল্যবান প্রকরণ বটে কিন্তু তার মূল্য সর্বত্রগ্রাহ্য নয়। ভাবানুষঙ্গ অসার্থক, যেমন কিনা প্রতীক ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতি অন্য যে কোনো প্রকরণই অসার্থক, যদি না সে-প্রকরণ একটা সুষম সমগ্রতায় মিশে যেতে পারে।

স্বভাবকবি

ঋষি বাল্মীকি কোন্ সূত্রে অকস্মাৎ কাব্যোচ্চারণে উদ্দীপিত হয়েছিলেন সে-কাহিনী ভারতীয় সমাজে সুবিদিত। যিনি পূর্বে কবিতা রচনা করেন নি, তিনি হ'লেন কবি, হ'লেন দৈব প্রেরণায়। কবি বাল্মীকির উপাখ্যান কাব্য-প্রকৃতির এক চমৎকার রূপক, সে-রূপকের মর্মার্থ হচ্ছে যে কাব্যের উৎপত্তি দিব্য প্রেরণায়, সে-প্রেরণা বুদ্ধি যুক্তি তর্কের ওপারে, তা'র কৃপায় মানুষ অসামান্য সংবেদনা অনুভূতি ও জ্ঞান লাভ করে সহজ পন্থায়, intuition বা স্বজ্ঞার শক্তিতে। জীবনের গভীরতম মহত্তম সত্য কবির উপলব্ধিসাধ্য হয়, দ্রষ্টার কাছে উদ্ভাসিত হয়। যিনি বচনপটু নন, তিনি হন উৎকৃষ্ট ভাষাকুশলী, যাঁর সুরজ্ঞান সীমিত, তাঁর সূক্ষ্ম ছন্দকৌশলে চমৎকৃত হ'তে হয়, নিরালোক তথ্যও উজ্জ্বল স্বচ্ছতা লাভ করে দৈব প্রেরণায়। সেজন্যই ভারতীয় ঐতিহ্যে কাব্য ও দর্শন, কবি ও দ্রষ্টা সমার্থক। কাব্যোৎপত্তির এ-মতবাদ—অর্থাৎ কাব্যের উদ্ভব দিব্য প্রেরণায়, অবিশ্লেষণীয় স্বজ্ঞায়, এই প্রত্যয়—সব প্রাচীন সাহিত্যেই অল্পবিস্তর প্রচলিত। আমাদের দেশে বাল্মীকির উপাখ্যান, ইহুদী সাহিত্যে "পোয়েট" ও "প্রফেট" শব্দ দুইটির সমার্থ, গ্রীসে সোক্রেটিসের সবিস্ময় প্রশ্ন—কেন কবিরা স্বীয় কাব্যের ব্যাখ্যায় অপারগ—এ-সবই কাব্যোৎপত্তি সম্বন্ধে একটি বিশেষ মতবাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে-মতবাদের প্রধান কথা যে কবিত্বশক্তি দিব্য প্রেরণায় উৎপন্ন, আর কবিতা থেকে যে জ্ঞান আমরা পাই তা প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়াধিগম্য জ্ঞানের চেয়ে মহত্তর। লক্ষ্য করা দরকার যে কোনো দেশেই খাঁটি দিব্য-প্রেরণাবাদ একাধিপত্য ভোগ করে নি। ভারতীয় ঐতিহ্যে কাব্যোৎপত্তি স্বজ্ঞাজনিত ব'লেই মানা হয়েছে অথচ সে-সঙ্গে রস ও অলঙ্কারের এমন নিয়মকানুন বাঁধা হয়েছে যাতে কুশলী লেখকের পক্ষে (তিনি স্বভাবকবি না-ও হতে পারেন) মোটামুটি কবিকৃতিত্ব অর্জন করা অসম্ভব নয়, তেমনি ইওরোপীয় ইতিহাসেও Poeta nascitur non fit (কবিরা জন্মান, গড়ে' পিটে' প্রস্তুত হন না) এ-মতের সঙ্গে অপর মতও সুপ্রচলিত, Poeta nascitur et fit (কবিরা জন্মান, গড়ে' পিটে' প্রস্তুতও হন)। দুটি মতেরই প্রচণ্ড প্রভাব সাহিত্য-সমালোচনার সর্বত্র লক্ষ্য করি। ইংরেজ কবি পোপ্ সম্বন্ধে এককালে ধারণা প্রচলিত ছিল

(অতিশয় ভুল ধারণা) যে তাঁর কবিত্বশক্তি আদৌ স্বভাবজ ছিল না, তাঁর কাব্য কৃত্রিম ও যান্ত্রিক। শেক্‌স্‌পিয়রকে বলা হ'ত প্রকৃতির দুলাল। সমালোচকেরা বলেন শেলির কাব্যবাণী নির্ঝ'রের মতো স্বতঃ-উৎসারিত। টেনিসন্‌ নিজের কবিতার সঙ্গে তুলনা করতেন নির্মনা পাখির গানের। বাঙালী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস সম্বন্ধে "স্বভাবকবি" বিশেষণটি সর্বদা প্রযুক্ত।

স্বভাবকবি না শেখানো-কবি, কবিত্বশক্তি শিক্ষানির্ভর না জন্মগত সংস্কার এ-তর্কের ইতিহাস দীর্ঘ এবং আজ পর্যন্ত অমীমাংসিত। বস্তুত এ-তর্ক বহুব্যাপক দার্শনিক তর্কেরই অংশ, যে-তর্কের বিচার্য সমস্যা—সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ কোন্‌ পথে হয়, "ইন্‌টিউশন্‌" অথবা "ইন্‌টেলেক্ট"-এর পথে, স্বজ্ঞার পথে, না বুদ্ধির পথে? জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের দ্বৈততা কেবল ধর্মমতেই নয় কাব্যবিচারেও প্রবল। কাব্যের উদ্ভব অতিলৌকিক না বুদ্ধি-সাপেক্ষ এ-প্রশ্ন এতই প্রাচীন যে এর ঐতিহাসিক আরম্ভ খুঁজে পাওয়া দায়। বাল্মীকির উপাখ্যান অতিলৌকিক উদ্ভবের রূপক আর সে-উদ্ভবে বিশ্বাস আমাদের দেশে কোনোকালেই অগ্রাহ্য হয় নি। আলঙ্কারিকেরা প্রকৃতপক্ষে কতটা গ্রাহ্য করতেন জানি না, তাঁদের মেধাপ্রবল চিন্তাধারা যে অতিলৌকিক প্রত্যয়ের খুব অনুকূল ছিল এমন মনে হয় না, কিন্তু তাঁরা কখনো অতিলৌকিক কাব্যধারণার বিরুদ্ধে যান নি, সম্ভবত এজন্যে যে তাঁরা মানতেন রসাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদেরই দোসর। ইওরোপে প্রথমাবধিই কাব্যের দু'টি ব্যাখ্যাই প্রচলিত। প্রাচীন গ্রীসে আরিস্‌টট্‌ল্‌ চেষ্টা করেছিলেন কাব্যতত্ত্ব যুক্তিবহ করার জন্য, সে-চেষ্টায় তিনি প্রভূত পরিমাণে সফলকামও হয়েছিলেন। কিন্তু আরিস্‌টট্‌ল্‌-এর গুরু প্লেটোর মতগুলি অন্তত পরোক্ষভাবে অতিলৌকিক ব্যাখ্যার পরিপোষক। প্লেটো Idea বা আদর্শ মানতেন, সে-আদর্শের ধারণায় কতগুলি শাশ্বত ভাবের মূলরূপ, তা'রা আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দ্বারা সীমিত নয়, তা'রা অবিনশ্বর আত্মার মতোই প্রাক্‌পার্থিব। প্লেটো ভাবতেন যে কোনো পার্থিবপ্রপঞ্চ অবিনশ্বর আদর্শের সঠিক প্রতিরূপ হ'তে পারে না, আর বিশেষ ক'রে শিল্পের মাধ্যমে সে-আদর্শের প্রতিরূপ ধরার চেষ্টা বড়ই দুর্বল চেষ্টা। এ-বিশ্বাসেই প্লেটো তাঁর আদর্শ রাজ্য থেকে হোমার ও অন্যান্য কবিদের নির্বাসিত ক'রেছিলেন। কিন্তু স্বয়ং কবিহৃদয়বান হ'য়ে প্লেটো নিজের এ-মত পুরোপুরি মানেন নি। তাই তিনি এ-ও বললেন যে সচরাচর যে-কাব্য

সর্বত্র দেখা যায় তা'ছাড়া অন্য এক রকম কাব্যও হ'তে পারে—Inspired বা দিব্যপ্রেরণাময় কাব্য—যার বিষয়বস্তু পার্থিব প্রপঞ্চ নয় বরং শাশ্বত আদর্শ, আর সে-আদর্শের প্রতিরূপ এ-কাব্যে সম্ভব হয় কেননা কবির দিব্যপ্রেরণা আদৌ ইন্দ্রিয়পরবশ নয়, অবিনশ্বর আত্মার চিরন্তন দেহোত্তর উপলব্ধি। প্লেটোর এ-মতবাদ তাঁর দর্শনে খুব প্রাধান্যলাভ করে নি, কিন্তু পরবর্তী কালে বহু প্লেটো-পন্থী দার্শনিক (বিশেষত, প্লটাইনাস্) কাব্যের এই অলৌকিক ও অতিলৌকিক ব্যাখ্যার অনেক ভাষ্য প্রস্তুত করেছিলেন। বস্তুত এমন কথা বলা নেহাৎ অন্যায় হবে না যে ইওরোপের অন্য বহু দার্শনিক মতবাদের মতোই নন্দনতত্ত্বেও দু'টি মাত্র মূল ধারা আছে—প্লেটোর ধারা ও আরিস্‌টট্‌ল্-এর ধারা। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব প্লেটোর কাব্যতত্ত্বের সমগোত্রীয় এবং ইওরোপীয় সংস্কৃতিতে আজ পর্যন্ত দু'টি ধারাই সমভাবে চলমান, প্লেটোর অতিলৌকিক মতবাদ ও আরিস্‌টট্‌ল্-এর যুক্তিবাদ। ইওরোপের মধ্যযুগে সন্ত টমাস অ্যাকোয়ায়নাস্ খ্রীষ্টধর্মের অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে আরিস্‌টট্‌ল্-এর ন্যায়শাস্ত্র মিলিয়ে যে ক্যাথলিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছিলেন সে-তত্ত্বের কুক্ষিগত হয়েছিল সমগ্র খ্রীষ্টানী কাব্যচিন্তা, আর যতকাল খ্রীষ্টীয় সমাজে ক্যাথলিক গির্জার একাধিপত্য ছিল ততকাল পর্যন্ত সে-কাব্যচিন্তা একাধিপত্য করেছিল সে-সমাজে। ইওরোপের রেনেসাঁস যুগে এলো যুক্তিপ্রাধান্য, ইহলোকমন্যতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবসামর্থ্যে অপার বিশ্বাস। যাকে সেক্যুলারিজ্‌ম্ বলি তার সূত্রপাত মার্টিন্ লূথারের বিদ্রোহে। সতেরো শতক থেকে চেষ্টা হ'তে থাকল যাতে দর্শনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কাব্যদর্শনেও যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক তথ্যনিষ্ঠার প্রয়োগ হয়। কাব্যে দিব্যপ্রেরণার তত্ত্ব পিছু হটতে লাগল ক্রমশঃ, এগিয়ে এলো হব্‌স্ ও লক্-এর যুক্তিনিষ্ঠ বিচারপরায়ণতা, বোআলো ড্রাইডেন ও ডক্টর জন্‌সন্-এর স্বচ্ছ বাস্তবপন্থী সমালোচনা। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে জ্ঞান-অর্জনের মার্গ হিসাবে প্রধানত দুটি পন্থা গণ্য হয়েছে—বুদ্ধির পথ ও স্বজ্ঞার পথ। কোনো যুগে বা সংস্কৃতিতে বুদ্ধি পেয়েছে প্রাধান্য, অন্যত্র প্রবল হয়েছে স্বজ্ঞা। আবার এ-ও দেখা গেছে যে স্বজ্ঞার পথটি (যাকে এক হিসাবে ভক্তিযোগ বলতে পারি) যদিও বা কোনো কোনো কালে পরম সত্যপন্থা ব'লে স্বীকৃত হয়েছে তবুও এক'দিকে স্বজ্ঞাপন্থী মনোভঙ্গীতে ও

অন্যদিকে সংস্কারবদ্ধ, অজ্ঞতাপরায়ণ অথবা অসম্যকজ্ঞানপরায়ণ চিন্তাধারায় এবং প্রশ্নলেশহীন বিশ্বাসে ভেদরেখা অনেক সময়ই নিতান্ত ক্ষীণ। যাকে বলি স্বজ্ঞা, হয়তো দেখা গেল তা অন্ধ সংস্কার মাত্র। যাকে মানলাম ঐশী শক্তি বলে, তা' হয়তো আসলে ভেল্‌কিবাজি, ম্যাজিক মাত্র। যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা নির্মনা সংস্কারের ও চিন্তাভীরু বিশ্বাসের পরাজয়—সে-পথেই চিরকাল সভ্যতার অগ্রগতি, অতএব কাব্যতত্ত্বেরও। আঠারো শতকের পরেও কাব্যতত্ত্বে বুদ্ধিযোগ ও ভক্তিযোগের দ্বন্দ্ব চলেছে। বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির প্রসার যতই বাড়ছে, যত সুগঠিত হচ্ছে যুক্তিবাদ, স্বজ্ঞাবাদও সে-পরিমাণে নানা উপায়ে স্বপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখার চেষ্টায় নিযুক্ত। প্রাচীন কাব্যতত্ত্বের দিব্যপ্রেরণাবাদ আজকাল খুব গ্রাহ্য নয়, কেউই এমন কথা মানবেন না যে কবি কবিতা রচনা করেন ঐশীপ্রভাবে, তবুও দিব্যপ্রেরণাবাদ মূলত এক প্রকারের স্বজ্ঞাবাদ, আর স্বজ্ঞাবাদ আজ পর্যন্ত প্রবল।

যুক্তিবিমুখ, স্বজ্ঞানিষ্ঠ কাব্যতত্ত্বের তিনটি প্রধান পর্যায় উনিশ শতক থেকে আজ অবধি ইওরোপীয় সাহিত্যে প্রকট হয়েছে। এর প্রত্যেকটিতেই একমাত্র স্বভাবকাব্যই সৎকাব্য ব'লে পরিগণিত হয়েছে, বিশ্বাস করা হয়েছে যে কাব্য এক অবিশ্লেষণীয় শক্তির স্বতঃ-উৎসারিত বিকাশ, জগতের পরম সত্য প্রণিহিত হয় কাব্যের মাধ্যমে (যুক্তির বা বিজ্ঞানের নয়), অতএব কবিকল্পনাসমুত্থ জ্ঞান আসলে পরাজ্ঞান।

ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বকে প্রথম পর্যায়ের কাব্যতত্ত্বের প্রতিনিধি হিসাবে ধরা যায়। ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ ও কোল্‌রিজ থেকে প্রবর্তিত এ-তত্ত্বের মূল কথা: কাব্যভাবনার স্বতঃউৎসারী শক্তি কবিকল্পনার সমন্বয়ী প্রতিভা। কবিতা বুদ্ধিময় নয়, অনুভূতিলীন, যে-অনুভূতিতে উদ্ভাসিত হয় "দি লাইট্ দ্যাট্ নেভার ওয়জ্ অন্ ল্যাণ্ড অর্ সী"—যে-দিব্যালোক কোনোকালে স্থলে-জলে প্রতিভাত হয় নি। রোমান্টিক তত্ত্বের এই অতিলৌকিক ধারণা কত প্রবল ছিল তা' বোঝা যাবে জন্ স্টুয়ার্ট মিল্-এর উক্তিতে। শিশুকাল থেকে মিল্ যে-ভাবে বুদ্ধিপন্থায় শিক্ষিত হয়েছিলেন তা'র তুলনা মেলা ভার, অথচ মিল্‌ও তাঁর আত্মজীবনীতে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে জ্ঞানের বাহন হিসাবে কাব্য অমূল্য, কেননা, স্বভাবের সাহায্য ব্যতীত সূক্ষ্ম জ্ঞান মানুষের বোধগম্য হয় না। রোমান্টিক কবিদের কিছুকাল পরে ফ্রান্সে এক শিল্পী-

গোষ্ঠীর আবির্ভাব হ'ল—জেরার্দ দ্য ন্যর্ভাল, শার্ল বোদেলেয়র, আর্থার র‍্যাঁবো, স্তেফান মালার্মে প্রমুখ কবিগণ। বলা যায় যে এঁরা নবতম স্বজ্ঞাবাদী গোষ্ঠীর পথিকৃৎ, যে-গোষ্ঠীর অন্তর্গত আজকের সুরিয়ালিস্ট্ কবিগণ। লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল, যে ফরাসী সংস্কৃতি ও শিল্পের ঐতিহ্য প্রধানত বুদ্ধি ও সংযম-মণ্ডিত, সে-ফরাসী সাহিত্যেই উদ্ভূত হ'ল আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবিরোধী স্বজ্ঞাপন্থী শিল্পতত্ত্ব। উনিশ শতকের সিম্বলিস্ট্ কবি ও বিশ শতকের সুরিয়ালিস্ট্ কবি যতটা গভীরভাবে অতিলৌকিক কাব্যপ্রচারী, প্রাচীন কোনো কবিগোষ্ঠী ততটা ছিলেন কিনা সন্দেহ।

জেরার্দ দ্য ন্যর্ভাল ছিলেন অদ্ভুত মানুষ, না সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ না অপ্রকৃতিস্থ, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মাঝামাঝি যেন কোনো এক আলো-আঁধারি মনোজগতে বাস করতেন আর তাঁর সে-অপার্থিব দৃষ্টি দিয়ে কবিতার পরে কবিতা লিখতেন। বোদেলেয়র ভাবতেন ইন্দ্রিয়বেদ্য জগতের ওপারে যে-পরাজগৎ তাকে দর্শনসাধ্য করাই শিল্পীর পরম উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়বেদ্য জগতের নশ্বর বস্তুগুলি আসলে পরাজগতের অবিনশ্বর সৌন্দর্যের প্রতীক, আর একমাত্র কবিকল্পনায় সে-প্রতীক ধরা পড়ে। অথচ প্রতীক ও প্রতীকিত সত্যের সম্পর্ক এমন অদ্ভুত যে মানুষের সাধারণ বিবেচনায় হয়তো সে-সম্পর্ক উদ্ভট মনে হবে। উদ্ভট মনে হোক বা না হোক, কবিকল্পনা প্রতীকিত সত্যের সম্পর্ক অনেকভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবে, সমপর্যায়ী এক প্রতীকের বদলে প্রয়োগ করবে অন্য প্রতীক, স্বজ্ঞার বলে প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করবে কাব্যের আকুতি, সাধারণ জ্ঞানের ভাবানুষঙ্গ হয়তো একেবারে বিপর্যস্ত হ'য়ে যাবে কবিকল্পনার প্রতীকী অনুষঙ্গে।

কাব্য যে মস্তিষ্কচালনার ফল নয়, সহজ নিশ্চিন্ত বোধের ফল, এ-তত্ত্ব বোদেলেয়রের পূর্বে কোনো কাব্যতাত্ত্বিক এত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন নি। আর্থার র‍্যাঁবো কবি হিসাবে স্বতন্ত্রপন্থী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাব্যচিন্তাধারায় বোদেলেয়রের প্রভাব প্রবল। তাঁরও একান্ত কামনা ছিল মামুলি জগতের নিষ্প্রাণ অভিজ্ঞতাগুলিকে ভেঙে চুরে গূঢ় অদৃশ্য জগতের সম্মুখীন হওয়া। এ-কামনা পূরণের চেষ্টায় র‍্যাঁবো দুমড়ে দিয়েছিলেন প্রচলিত কাব্যের ইন্দ্রিয়-সংবেদনা। তাঁর কাব্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি যেন প্রকৃতিস্থ নেই, অ-ধরাকে ধরার দুঃসাধ্য চেষ্টায় সে-অনুভূতি উদ্দাম,

অস্থির। মালার্মের প্রধান চিন্তনীয় ছিল কাব্যের ভাষা। কাব্যের বিষয়গত প্রাণ নিয়ে বোদেলেয়র বা র‍্যাঁবোর মতো মালার্মে ব্যস্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু ভাষার প্রতি অভাবিতপূর্ব শক্তি আরোপ ক'রে তিনি ভাষা সম্বন্ধে এক নূতন অতীন্দ্রিয়বাদ প্রচলন করলেন, আর অন্তিম বিচারে তাঁর কাব্যতত্ত্বও যুক্তিবিরাগী স্বভাবকাব্যের সমর্থক।

স্বভাবকাব্যের এই ক্রমবর্ধমান প্রচার, কাব্যতত্ত্বে স্বজ্ঞার প্রভাবে যুক্তির অপসরণ, দৃশ্যমান জগতের চেয়ে অদৃশ্য জগৎকে বড় মনে করা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান ছেড়ে দিয়ে অতীন্দ্রিয় প্রত্যয়ের অভিসারী হওয়া—সিম্বলিস্‌ট্‌দের এহেন চিন্তা অনেক ইওরোপীয় সমালোচকের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। খুব সহজেই বলা যায় (বলা হয়েছেও) যে এঁরা আসলে জগৎভীরু সংসার-পালানো আত্মপরবশ কাপুরুষ, এঁদের কাব্যে কাব্যের মহত্তম উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব অবহেলিত হয়েছে, ধনতন্ত্রী সমাজের অবশ্যম্ভাবী আত্মবিরোধের পরিণাম এঁদের রচনা। বস্তুত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে অথবা সমাজবিদের দৃষ্টিতে অথবা ধর্মশাস্ত্রীর দৃষ্টিতে ফরাসী সিম্বলিস্‌ট্‌ কাব্য শোচনীয় মনে হবার সঙ্গত কারণ আছে, এমন কি সাহিত্যিকের দৃষ্টিতেও (আমার মতো যুক্তিবাদী সাহিত্যপাঠকের দৃষ্টিতে নিশ্চয়) এ-কাব্যতত্ত্ব বহুলাংশে অগ্রাহ্য হ'তে পারে। কিন্তু একথাও মানতে হবে যে স্বজ্ঞা (intuition) বা সহজ বোধকে যদি কাব্য-সৃষ্টির উৎস বলে' মনে করি তা হ'লে ক্রমে ক্রমে আমরা সিম্বলিস্‌ট্‌ কাব্যতত্ত্বে পৌঁছব অবধারিত।

স্বজ্ঞাবাদী কাব্যতত্ত্বের পূর্ণ পরিণতি সিম্বলিস্‌ট্‌ কাব্যেও নয়, তা'র জন্য আসতে হয় বিশ শতকী সুরিয়ালিস্‌ট্‌ কাব্যে। ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ নূতনভাবে স্বজ্ঞার মাহাত্ম্য প্রচার করলেন। ইতিমধ্যে মনোবিকলন-শাস্ত্রের উদ্ভব হল। আর ইওরোপীয় সভ্যতা যেন অভ্যাসবদ্ধ মামুলিয়ানায় হ'য়ে উঠ্‌ল ক্লিষ্ট, নীরক্ত, নিষ্প্রাণ। কোনো কোনো শিল্পীগোষ্ঠী মনে করলেন অনভ্যস্ত পথে চলা শৈল্পিক সততার নিঃসংশয় লক্ষণ। পাব্‌লো পিকাসো ও গিওম্‌ অ্যাপোলিনেয়ার, দুজন শক্তিশালী শিল্পী নূতন ক'রে শিল্পের চরম উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন, কাব্যে অ-ধরা সত্য ব্যক্ত করার প্রয়াসে নিযুক্ত হলেন। অ্যাপোলিনেয়ার ১৯১৭ সনে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, তা'র শিরোনামায় একটি শব্দ ব্যবহৃত হ'য়েছিল—সুরিয়ালিস্‌ট্‌—সে-শব্দটি থেকে

নূতন কবি-গোষ্ঠীর নামকরণ হ'ল যখন ১৯২৪-এ আঁদ্রে ব্রেতঁ একটি প্রচার-পত্রিকা প্রকাশ করলেন। আল্‌ফ্রে জারি, অ্যাপোলিনেয়ার, জঁা ককতো, আঁদ্রে ব্রেতঁ, পোল এলুয়ার প্রভৃতি লেখক সুরিয়ালিস্‌ট্‌ শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুরিয়ালিস্‌ট্‌ কাব্যতত্ত্বে কাব্যের উৎস যুক্তি নয়, সহজ বোধ, কাব্যের উদ্দেশ্য স্বপ্নাসাধ্য নিগূঢ় সত্যের প্রকাশ, কাব্যের প্রকরণ সব কিছু যাতে অতি-অভ্যস্ত সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রকরণগুলি পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সুরিয়ালিস্‌ট্‌ শিল্প সেজন্য কোনো কোনো সময় চণ্ডপন্থী—দেহে না হোক মনে তো বটেই।

ঋষি বাল্মীকির স্বতঃউৎসারিত শ্লোক থেকে সুরিয়ালিস্‌ট্‌ কাব্য পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে স্বভাবকাব্যতত্ত্ব; অথচ বাল্মীকি বা প্লেটো, প্লটাইনাস বা সেণ্ট টমাস ক্যব্যতত্ত্বের এমন পরিণতির কথা ভেবেছিলেন কিনা সন্দেহ। আধুনিক স্বপ্নাবাদী কাব্যে নিশ্চিত প্রত্যয় নেই, আত্মস্থ শক্তি নেই, সাধারণ বা অসাধারণ কোনো বুদ্ধির লীলা নেই, শিল্পী স্বীয় সামাজিক ব্যক্তিত্বের চেয়ে ঐকান্তিক ব্যক্তিত্বই বড় মনে করেন। বাংলা সাহিত্যে সুরিয়ালিস্‌ট্‌ কেউ আছেন ব'লে জানি না. সিম্বলিস্‌ট্‌ও (পুরো ফরাসী অর্থে) কেউ বোধ হয় নেই। কিন্তু যেহেতু অধুনা ইওরোপীয় কাব্যপ্রীতি বেড়েছে, র‍ঁ্যাবো বা বোদেলেয়র বা রিল্‌কে প্রভৃতির কবিতার তর্জমা হচ্ছে, সেহেতু এসব কবির কাব্যতত্ত্বের পশ্চাৎপট সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান

(১)

'এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে'। মানে, রাজনীতির হাওয়া লেগেছে চাঁদের গায়ে। তাতে কাব্যের কোনো প্রচণ্ড লোকসান হয়নি বরং কাব্যপ্রতীকের ভাণ্ডারে দুয়েকটি নতুন সম্পদ জমেছে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের হাওয়া লেগে কাব্যের কিছু বিপদ ঘটছে বৈকি! স্মরণ করুন রবর্ট ব্রাউনিং 'ওয়ান্ ওঅর্ড মোর্' কবিতার শেষে স্ত্রীর উদ্দেশে কী ভাবে প্রেম নিবেদন করেছিলেন :

This to you—yourself my moon of poets !
Ah, but that's the world's side—there's the wonder—
Thus they see you, praise you, think they know you !
There, in turn I stand with them and praise you.

* * * *

But the best is when I glide from out them,
Cross a step or two of dubious twilight,
Come out on the other side, the novel
Silent silver lights and darks undreamed of,
Where I hush and bless myself with silence.

আধুনিক কবির পক্ষে এমন আশ্চর্য ছত্র রচনা করা আর সম্ভব নয় কেননা সাম্প্রতিক বিজ্ঞানপ্রত্যয়ে তাঁর কাব্যপ্রত্যয় আহত হয়েছে। এই অতুলনীয় ছত্র কয়টির শিল্পরূপ শুরু হয়েছে এইভাবে। কবিপ্রিয়া যশস্বিনী কবি, অন্য কবিরা যেন নক্ষত্র মাত্র, তাঁদের মাঝখানে কবিপ্রিয়া যেন চাঁদ। এ কথা বলার পরে ব্রাউনিংয়ের কল্পনা আরো এগিয়ে গেল। চাঁদের সঙ্গে যশস্বিনী কবির একটি চমৎকার সাযুজ্য পাওয়া গেল। সবাই জানেন চাঁদের মাত্র একটি গোলার্ধ পৃথিবীর লোকের দর্শনসাধ্য, অন্য গোলার্ধ আমরা দেখতে পাই না। যশস্বিনী কবির ব্যক্তিত্বেরও যেন তেমনি দু'টি অংশ। তাঁর যশোমণ্ডিত কবিস্বরূপ যেন তাঁর ব্যক্তিত্বের আমদরবার, সেই কবিস্বরূপ যেন চাঁদের সর্বজনদৃষ্ট দিক। কবির অন্য সব গুণগ্রাহীর মতো ব্রাউনিংও চাঁদের এই দিক দেখে মুগ্ধ, কিন্তু এলিজাবেথ ব্যারেটের অন্তরঙ্গ প্রেমময়ী

ব্যক্তিত্ব কেবল তাঁর প্রেমিক ব্রাউনিংয়ের জন্যই, সে-ব্যক্তিত্বের খাস দরবারে শুধু ব্রাউনিংয়েরই আসন।

আজকের দিনে ব্রাউনিং কি এমন ছত্র লিখতে পারতেন? না কি বুদ্ধদেব বসু ব্রাউনিংয়ের অপ্রচ্ছন্ন অনুকরণে এমন ছত্র আবারও লিখবেন?

এ কি চাঁদেরই বিপরীত মুখ, গ্যালিলিওর অজ্ঞাত,
রবীন্দ্রনাথেরও অজ্ঞাত?

('নতুন পাতা')

চাঁদের মুখফেরানো দিক তো আর মানুষের অজ্ঞাত নয়! রুশ বৈজ্ঞানিকগণ কি সেই অ-দেখা দিকের ফটোচিত্র তৈরি করেন নি? ক্রমশ: এমন তো হবে যখন সে-অদেখা দিক অ-দেখা যদিও থাকে, অজ্ঞাত নিশ্চয় থাকবে না, আর অজ্ঞাত না থাকলে, অনবলোকিত নিভৃতের নিবিড় অন্তরঙ্গতা যদি তার হারিয়ে যায়, তাহ'লে ব্রাউনিংয়ের বাক্প্রতিমার যাথার্থ্য সাঙ্গ হবে না কি?

কাব্যপ্রত্যয়ের উপরে আধুনিক বিজ্ঞানের বিপ্লবী, প্রায় বিধ্বংসী অভিসংঘাত যে কতটা গুরুতর তা' বুঝতে পেরেছিলেন বলেই কীট্স্ বলেছিলেন:

Do not all charms fly
At the mere touch of cold philosophy?
There was an awful rainbow once in heaven:
We know her woof, her texture; she is given
In the dull catalogue of common things,
Philosophy will clip an angel's wings,
Conquer all mysteries by rule and line,
Empty the haunted air, and gnomed mine—
Unweave a rainbow.

(*Lamia*, II, 229-3‍`)

এ-ছত্রগুলির তর্জমা করা আমার সাধ্য নয় কিন্তু এখানে মূল বক্তব্য যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিচারের ফলে আকাশ ও পাতাল থেকে অন্তর্হিত হয়েছে যক্ষ, রক্ষ, কিন্নরগণ, জগতের যাবতীয় জ্ঞানাতীত রহস্য স্তূপীকৃত হয়েছে মামুলি ঘটনার নিঃ।.বগ তালিকায়, হারিয়ে গেছে আকাশের মহান

ইন্দ্রধনু, জীবনের মোহময় রূপ উবে গেছে বিজ্ঞানের শীতল ছোঁওয়া লেগে। (কীট্‌স্ এখানে ফিলসফি বলতে বুঝেছেন বিজ্ঞান। এককালে ফিলসফি ছিল দু'রকমের, natural philosophy অর্থাৎ আজ যাকে আমরা natural sciences বলি, সেই পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অধ্যয়ন, বিচার ও চিন্তন। আর ছিল moral philosophy অর্থাৎ যাকে আজকাল আমরা বলি philosophy, দর্শনশাস্ত্র। বিজ্ঞান অর্থে philosophy কথাটির প্রয়োগ বহু পুরাতন। বাঙলায় যাকে বলি স্পর্শমণি, পরশপাথর, ইংরেজিতে তাকে বলা হ'ত Philosopher's Stone, দার্শনিকেরা ব্যবহার করতেন বলে নয়, বরং বৈজ্ঞানিকেরা সে-পাথর নিয়ে কাজ করতেন সেজন্য। অবশ্য বৈজ্ঞানিক বলতে তখনকার দিনের আধা জাদুকর যে সব পণ্ডিতকে বোঝাতো। কীট্‌স্ philosophy বলতে বিজ্ঞান বুঝেছিলেন তার আরো প্রমাণ পাই যখন পড়ি যে কীট্‌স্ ও চার্ল্‌স্ ল্যাম্ একদা সাব্যস্ত করেছিলেন যে Newton had destroyed all the poetry of the rainbow by reducing it to the prismatic colours, অর্থাৎ ইন্দ্রধনুর বর্ণালী মৌলিক বর্ণে বিশ্লেষিত করে নিউটন্ তার কাব্যগুণ নষ্ট করেছেন। এ ছাড়া, কীট্‌সের বন্ধু ও এককালীন গুরু লী হাণ্ট্ এই ছত্র কয়টি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা' থেকেও প্রমাণ হয় যে ফিলসফি বলতে কীট্‌স্ বুঝেছিলেন বিজ্ঞান।)

কীট্‌স্ দেখতে পেয়েছিলেন বিজ্ঞানে ও শিল্পে বৈপরীত্য। শিল্প charming, ইন্দ্রজালবিস্তারী, মোহময় তা'র রূপ, তাতে চিত্তে আবেগ জন্মে। অপরপক্ষে, বিজ্ঞানের তুহিনশীতল স্পর্শে কাব্যের ও শিল্পের মোহন রূপ অন্তর্হিত হয়। কীট্‌সের তুলনায় অনেক নিরেস কবি ছিলেন ক্যাম্‌বেল, তিনিও 'রেইন্ বো' অর্থাৎ ইন্দ্রধনু শীর্ষক কবিতায় অনুরূপ কথা বলেছেন :

Triumphal arch that fills the sky
When storms prepare to part,
I ask not proud Philosophy
To teach me what thou art.

* * *

When Science from Creation's face
Enchantment's veil withdraws,
What lovely visions yield their place
To cold material laws!

আসন্ন ঝটিকার পথে নির্মিত হয়েছে ইন্দ্রধনুর বিজয়-তোরণ, তার স্তুতি গেয়েছেন কবি আর সেই সঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে বিজ্ঞানের জড়জাগতিক কানুনের ফলে কত অপরূপ দৃশ্য আজ হারিয়ে গেছে, সঙ্কুচিত হয়েছে জাদুর আবরণ! বিজ্ঞান ও শিল্প-কল্পনার বৈষম্য সম্বন্ধে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন ওয়র্ডস্বোয়র্থ। এক প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি বলছেন যে খাঁটি বিপরীত হচ্ছে Poetry and Matter of Fact and Science, অর্থাৎ কাব্য একদিকে, অন্যদিকে প্রত্যক্ষের ও বিজ্ঞানের তথ্য। তাঁর "প্রিলিয়ুড" নামক বিখ্যাত আত্মজৈবনিক কাব্যগ্রন্থের একাদশ সর্গে বলছেন :

There comes a time when Reason, not the grand
And simple Reason, but that humbler power
Which carries on its no inglorious work
By logic and minute analysis
Is of all Idols that which pleases most
The growing mind.

এই ধরনের তারতম্যই করেছিলেন পরবর্তী যুগের কবি টেনিসন্ :

Who loves not Knowledge? Who shall rail
Against her beauty? May she mix
With men and prosper! Who shall fix
Her pillars? Let her work prevail.

* * * *

Let her know her place;
She is the second, not the first.
A higher hand must make her mild,

If all be not in vain ; and guide
Her footsteps, moving side by side
With Wisdom, like the younger child :
For she is earthly of the mind,
But wisdom heavenly of the soul.

(*In Memoriam*, CXIV)

দুই কবি-ই তারতম্য করেছেন দু'রকম অন্তঃশক্তিতে, একটি মহৎ ও অমিতপ্রভব, অপরটি সীমায়িত ক্ষুদ্রবিচারী। ওয়র্ডস্বোয়র্থ বলছেন 'রীজ্‌ন্‌' বা চিৎশক্তির একটা দিক আছে সেটি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তঃশক্তি, সে-শক্তি আসলে সৃষ্টিশীল প্রতিভা, মানুষের পক্ষে তা' এক দেবোপম সম্পদ। কিন্তু 'রীজ্‌ন্‌' বলতে অন্য রকম চিৎশক্তিও বোঝা যায়, সেটি মানুষের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা, বিজ্ঞানে ও ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতা। এই দ্বিতীয়োক্ত শক্তিকে ওয়র্ডস্বোয়র্থ তুচ্ছ করছেন না কিন্তু বিনা দ্বিধায় বলছেন যে সৃজনী-প্রতিভার তুলনায় এ হীনশক্তি। টেনিসন্‌ যে উঁচু শক্তি 'উইস্‌ডম্‌' (প্রজ্ঞা) ও হীন শক্তি 'ন্‌লেজ্‌' (জ্ঞান, বোধ হয় বিজ্ঞান বলাই ভালো) এ-দু'য়ের মধ্যে তারতম্য করেছেন তার ভেতরে খানিকটা অপার্থিব ঐশ্বরিক শক্তি, ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি ও জাগতিক ব্যাপারে জ্ঞান, এ-দু'য়ের তারতম্য নিহিত বটে, কিন্তু এই অপার্থিব অন্তর্দৃষ্টিও বস্তুত সৃষ্টিশীল প্রতিভাশালী শৈল্পিক কল্পনার নিকটগোত্র। অর্থাৎ কীট্‌স্‌, ল্যাম্‌, ক্যাম্‌বেল্‌, ওয়র্ডস্বোয়র্থের মতো টেনিসন্‌ও অনুভব করেছিলেন যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে কাব্যের সমন্বয়ী কল্পনার কোথাও একটা সংঘর্ষ বিদ্যমান।

(২)

অথচ বিজ্ঞানে ও কাব্যে এমন কোনো বৈপরীত্যের ধারণা চিরকালই কিছু ছিল না। বিজ্ঞান বলতে যদি বুঝি পদার্থজগতের তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণপন্থী সম্যক জ্ঞান, তা'হলে তেমন জ্ঞান নিয়ে মানুষ ব্যাপৃত থেকেছে অতি পুরাতন কাল থেকেই আর যদিও কোনো কোনো জড়জাগতিক জ্ঞান হয়তো গোড়ায় গোড়ায় মানুষের অভ্যস্ত ধারণা ও অভ্যস্ত অনুভূতিগুলিকে পীড়া দিয়েও থাকে, তবুও অচিরেই এইসব নতন জ্ঞান ও ধারণা অনতিআয়াসে মিশে

গেছে শিল্পীর সমন্বয়ী প্রতিভার সঙ্গে। এমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই যে প্রাক্-আধুনিক ইতিহাসে কবিচিত্ত ক্লিষ্ট হয়েছে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ধারণার নিষ্পেষণে। বিজ্ঞান বা পদার্থজগতের জ্ঞান প্রাচীন কবির কল্পনাশক্তিকে খর্ব করেনি কখনো, যদিও হয়তো অনেক সময়ই সে-শক্তিকে উদ্দীপিতও করেনি। ইওরোপীয় সাহিত্যে লুক্রেশিয়স্ ও দান্তের কাব্যে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তা স্বচ্ছন্দে স্থান পেয়েছে, কাব্যে ও বিজ্ঞানে কোনো সংঘাত হয়নি। ইংরেজ কবি চসর্ ও মিল্‌টন্ সমসাময়িক কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন, কোনো কোনো চিন্তায় তাঁদের কবিকল্পনা উৎসাহ পেয়েছিল। (স্মরণ করুন "প্যারাডাইস্ লস্‌ট্" মহাকাব্যে গ্যালিলিওর টেলিস্‌কোপ্ নিয়ে কী সুন্দর উপমা প্রস্তুত করেছেন মিল্‌টন্!) ভারতীয় কাব্যের প্রাচীনতম যুগেও সাযুজ্য ছিল কাব্যে ও বিজ্ঞানে, তৎকালীন বিজ্ঞানে। ঐতরেয়োপনিষদে (যথা, ১।১।১, ২।১।২, ২।১।৩) ও প্রশ্নোপনিষদে (৩।৬, ৩।৭) জন্ম ব্যাপারের ও মানবদেহে নাড়ীসমূহের যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তৎকালীন জ্ঞানের ভিত্তিতে সে সব সূক্তগুলি কাব্যগুণমণ্ডিত। মহাভারত তো সে যুগের যাবতীয় দার্শনিক সামাজিক বৈজ্ঞানিক ধারণার অগাধ ভাণ্ডার বিশেষ। কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী নয়, কীট্‌সের প্রশ্নসত্ত্বেও। বিরোধিতার সপক্ষে কোনো যুক্তি নেই। বিজ্ঞান মানে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি ও পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের কতকগুলি উপায়। আধুনিককালে এ সব পদ্ধতি ও উপায় সংখ্যায় বেড়েছে, তাদের কার্যপ্রণালীও জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, কিন্তু সুপ্রাচীন কালেও বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম মানুষের অজ্ঞাত ছিল না। বাঙলার প্রাচীন কাব্যে—খনা ও ডাকের বচনে, কাহ্ন পাদের চর্যাশ্লোকে—তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ধারণার (যত ভুল ও অযথার্থ হোক না কেন সে সব ধারণা) কাব্যীভূত প্রকাশ হয়েছে বৈ কি! এহেন কাব্যীভূত প্রকাশ যে সম্ভব হয়েছে, বাঙলা কাব্যে অথবা অন্যান্য বহু কাব্যে, তার কারণ স্বচ্ছ। সেকালে জ্ঞানের জাতিভেদ ছিল না। এটি বৈজ্ঞানিক ওটি অবৈজ্ঞানিক, এটি ন্যাচ্‌রল্ ওটি নয়, কোনো জ্ঞানের গ্রাহ্যতা ও প্রামাণ্যতা বেশি অন্য জ্ঞানের কম, এমন কোনো তারতম্য কেউ মানতেন না। তা'ছাড়া যদিচ এক চিন্তায় ও অপর চিন্তায় প্রচণ্ড প্রভেদ হতে পারত,

যেমন প্রশ্ন উঠতে পারত জগৎকারণের পরম সত্য কী সে বিষয়ে (অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনে, বৈশেষিক দর্শনে বা অন্যান্য দর্শনে আলাদা আলাদা সিদ্ধান্তের যে-অবতারণা) তবুও জ্ঞানার্জনের পন্থা সকলেরই ছিল এক ধরনের ও মানবিক চৈতন্য সর্ব দর্শনেই তুলামূল্য। সাংখ্যবাদী বা বৈদান্তিক কেউ-ই যার যার চিন্তার ফলে নিজ নিজ সাংসারিক আবেগ ও অনুভূতিগুলি থেকে ভ্রষ্ট হননি। অর্থাৎ সবারই জীবনাদর্শে ও জীবন পদ্ধতিতে সঙ্গতি ছিল, তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে, মনীষায় ও অনুভূতিতে ছিল সাযুজ্য। সুতরাং কাব্যে বা শিল্পে যে-মানস রূপায়িত হয়েছে সে-মানস একটি সুডৌল, সর্বাঙ্গসুষম, সংতুলিত, integrated ও homogeneous মানস, আধুনিককালের শতধাবিচ্ছিন্ন সংক্ষুব্ধ সংগ্রামবিক্ষত শিল্পমানস নয়। এমন কথা বলছি না যে সেকালের শিল্পীমানস অবশ্যই একালের শিল্পীমানসের তুলনায় মহত্তর ছিল। (এ হেন সামান্যোক্তি নিতান্ত স্থূল একদেশদর্শিতার পরিচায়ক, সুতরাং সদ্বিবেকী সমালোচকের পক্ষে সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য।) আমার প্রতিপাদ্য যে সাহিত্যের ইতিহাসে বহুযুগ যাবত বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ে ও শিল্পায়নী কল্পনায় কোনো বৈপরীত্য বা সংঘাত বিদ্যমান ছিল না। যিনি বিজ্ঞানচর্চা করতেন শিল্পের পথ তাঁর কাছেও সুগম ছিল, যিনি ছিলেন শিল্পী তিনি বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে নিজ শিল্পভাবনার কোনো দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হননি। সেকালের সৃষ্টিশীল মানস ছিল balanced, সংতুলিত। রোমক নাট্যকার টেরেন্স্ বলেছিলেন : সমগ্র মানবতাই কাব্যের এলাকায় পড়ে। যে-বিষয় মানুষ সংক্রান্ত তা' কখনও কাব্যের জগতে ভিন্‌দেশী হ'তে পারে না। বিজ্ঞানে মানবিক জীবনের একটি অংশ প্রোজ্জ্বল, অতএব বিজ্ঞানে ও কাব্যে কোনো ভয়াবহ বিপরীত-ধর্মিতা সম্ভব নয় আর সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে তেমন কোনো বৈষম্য প্রকাশিত হয়নি। সে-বৈষম্য আধুনিক সাহিত্যেরই বিকার।

(৩)

কাব্যভাবনার সঙ্গে বিজ্ঞানের বৈষম্য শুরু কবে থেকে? এ-বৈষম্য ইওরোপীয় সাহিত্যে দেখা দেয় সতেরো শতকে, উনিশ শতকে তা'র মর্মন্তুদ রূপ প্রতিভাত কিন্তু তবুও তখন অবধি কাব্যে ও বিজ্ঞানে কোনো অলঙ্ঘ্য

বিচ্ছেদ দেখা দেয়নি, আর আজ বিশ শতকে সে-বৈষম্যের ফলে যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা'তে হয়তো অনতিদূর ভবিষ্যতে এ-দু'য়ের গতিপথ একেবারেই ভিন্ন হ'য়ে পড়বে। আশঙ্কা হয় সে-ভিন্নতা কাব্যের পক্ষেই মারাত্মক হবে।

বিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞায় কয়েকটি লক্ষণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিয়ত আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে। বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্য, তথ্যনির্ভর সত্য, পরীক্ষাসাধ্য সত্য, কোনো বিশেষজনের বা বিশেষ দেশকালের সত্য নয়, য়ুনিভার্সল্ বা সার্বিক সত্য, এমন কোনো মতবাদ বা তত্ত্ব নয় যা শুধু পরম্পরাপরবশ। বাপ-দাদা বলে' এসেছেন বা করে এসেছেন সেজন্যই কোনো নিয়ম সত্য, অথবা গুরু থেকে শিষ্যে, শিষ্য থেকে প্রশিষ্যে চলে এসেছে বলেই কোনো মতবাদ অভ্রান্ত, অথবা স্বর্গত মেঘনাদ সাহা যে-মনোবৃত্তি সম্বন্ধে ঠাট্টা করেছিলেন 'সমস্তই ব্যাদে আছে', তেমন মনোবৃত্তিতে কোনো অপৌরুষেয় গ্রন্থের আপ্তবাক্যকেই ধ্রুব ব'লে মানা, সে-পন্থা বিজ্ঞানের নয়। বিজ্ঞানের 'সিল্-সিলাহ্' অথবা পরম্পরা ভুল থেকে কম ভুলে, অজ্ঞাত ও অসাধ্য থেকে কম অসাধ্যে ও কম অজ্ঞাতে পৌঁছবার এবং অবশেষে নিঃসংশয় প্রমাণ ও পরীক্ষাসাধ্য সত্যে পৌঁছবার ক্লেশময় দুরূহ নিরলস প্রয়াস। বৈজ্ঞানিক সত্য স্বকীয় অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কোনো গূঢ় অনিকেত ব্যাপার নয়, রুদ্ধদ্বার গৃহে গুগ্গুল ধূপের ধোঁয়ায় আধিদৈবিক মায়ায় ও প্রেরণায় সে-সত্য উদ্ভাসিত হয় না, সে-সত্য গণিতের তর্কে ধরা পড়ে, ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-যন্ত্রে তার সিদ্ধি। বিজ্ঞানের এ-রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সতেরো শতকের ইওরোপে—টাইকো ব্রাহে, কোপার্নিকাস্, কেপ্লার, রবর্ট বয়ল্, গ্যালিলেও, নিউটনের ইওরোপে। এতকাল সত্য ও মিথ্যা ছিল দার্শনিক তত্ত্বে নিহিত, এখন থেকে সত্য মানে হ'ল বৈজ্ঞানিক সত্য, অন্য সব কিছু কপোলকল্পনা। বেকন্ বললেন, সবার উপরে dry light of reason, যুক্তির অনার্দ্র আলোক, সে-আলোক নৈর্ব্যক্তিক, সে-আলোকে ব্যক্তিবিশেষের সেন্টিমেন্ট বা আবেগের স্যাঁতসেঁতে রামধনু খেলে না। এই সত্যনিষ্ঠ, পরীক্ষাপ্রমাণতথ্যনিষ্ঠ, নির্মম তন্ময় জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত হ'লেন সতেরো শতক থেকে শত সহস্র বিজ্ঞানকর্মী আর এই আবেগ-অনার্দ্র নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে মানুষের চিন্তাধারা যে কী পরিমাণে বদলে' গেল তা'র একটি সুন্দর উদাহরণ পাই অধ্যাপক বেসিল্ উইলির গ্রন্থের ("দি সেভেন্টিন্থ্

সেঞ্চুরী ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড") প্রথম পরিচ্ছেদে যেখানে motion বা গতি সম্পর্কে মধ্যযুগীয় সন্ত টমাস্ অাকোয়ানাস্ এবং সতেরো শতকী গ্যালিলেওর প্রত্যয়ের প্রভেদ বর্ণিত হয়েছে। সতেরো শতকের পূর্বে বিজ্ঞানকর্মীর যে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, স্বতন্ত্র জ্ঞান লক্ষ্য ছিল, এমন বলা যায় না কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞানকর্মী নিজ কর্মের উদ্দেশ্য ও মূল্য সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় অবহিত হলেন, আর যেহেতু সত্যানুসন্ধিৎসাই তাঁর কাম্য সেজন্য বিজ্ঞান-বহির্ভূত অন্য সব জ্ঞানপন্থাকেই তিনি মনে করলেন কপোলকল্পনা। এযুগে ফ্রান্‌সিস্ অস্‌বর্ণ নামক জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন (১৬০৬ খৃষ্টাব্দে) যে ছেলে যেন গণিত ও বটানি ভালোমতো অধ্যয়ন করেন কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রচলিত বিদ্যাগুলি but Lumber and Formes অর্থাৎ গুদোমঠাসা মাল আর বাঁধিগৎ মাত্র। যাকে আজকাল বলা হয় empirical truth, পরীক্ষানির্ভর ইন্দ্রিয়গোচর সত্য, সে-সত্যের সপক্ষে তুচ্ছ হ'ল অতীন্দ্রিয় সত্যের উপলব্ধি, আর তা'র ফলে যেমন বিজ্ঞানের কল্যাণে টেক্‌নলজি দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগল, দ্রব্যোৎপাদনপদ্ধতি হ'তে থাকল দক্ষ থেকে দক্ষতর, তেমনি জীবন-যাত্রার মান উন্নত হ'তে থাকল আর অসংখ্য বিষয়ে মানুষের ঘর গেরস্থালী হ'য়ে উঠল স্বচ্ছন্দ নিরাপদ। সাধারণ মানুষেরও চিন্তার কাঠামো খানিকটা বদলালো। আমরা কথায় কথায় দোহাই দিতে লাগলাম scientific point of view-এর, scientific outlook-এর, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর। আপ্তবাক্যে আস্থা শিথিল হ'তে হ'তে কবে যেন একেবারেই উবে গেল, ভক্তিমার্গের বদলে যুক্তিবাদ প্রবল হ'ল জীবনে।

এই যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান খারিজ করে ইন্দ্রিয়গম্য তথ্যপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানকে মহত্তর মূল্য দেওয়া গেল তার পরিণাম হ'ল গভীর ও দূরপ্রসারী। এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ঘায়েল হ'ল মানব-সভ্যতার দু'টি প্রধান অঙ্গ—ধর্ম ও কাব্য দু'য়েরই মূল ভিত্তি 'ইন্‌ট্যুশন্'-এ, স্বজ্ঞায়, যুক্তির অতীত বোধিতে। ধর্মের ও কাব্যের সিদ্ধি যুক্তিতে আবদ্ধ নয়, যুক্তির সীমানার বাইরে উজ্জ্বল কল্পনা ও অনুভূতির তুরীয় শক্তিতে এরা সার্থক। অন্তিম বিচারে এদের প্রতীতি অলৌকিক, অন্তত লোকাতীত। সতেরো শতকে যখন ফরাসী দার্শনিক দেকার্ৎ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নূতন দর্শন প্রস্তুত করলেন তখন দৃঢ়ভাবে

বললেন যে একমাত্র তাকেই সত্য বলা যাবে যা' গাণিতিক তর্কশৃঙ্খলায় পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা করা যায়। বেস্‌ল্‌ উইলি লিখছেন : After Descartes, poets were inevitably writing with the sense that their constructions were *not true* and this feeling robbed their work of essential seriousness (দেকার্তের পর থেকে কবিদের লেখায় এই অনতিক্রম্য ধারণা প্রকাশ পেতে থাকলো যে তাঁদের রচনা সত্য নয়, অনৃত-ভাষণ মাত্র, আর এ-ধারণার ফলে তাঁদের কাব্যের গাম্ভীর্য নষ্ট হ'য়ে গেল।) সমসাময়িক ইংরেজ দার্শনিক লক্‌ বললেন যে কাব্য থেকে আমরা পাই কেবল pleasant pictures and agreeable visions (মনোহর চিত্র আর নয়ন-তৃপ্তিদায়ক ছায়াদৃশ্য) অথচ এসব চিত্র আসলে সত্যে ও যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, অতএব অলীক, আষাঢে গল্প মাত্র। কবিতা খুব সারবান পদার্থ কিছু নয়, ক্ষণিকের খেলনা, আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী। যুক্তিবাদী দার্শনিকদের এবম্বিধ বিচারের বোধহয় চরম উক্তি মিলবে উনিশ শতকের গোড়ায় লেখা বিখ্যাত ইউটিলিটেরিয়ান (উপযোগবাদী) দার্শনিক জেরেমি বেন্থামের "র‍্যাশনাল্‌ অব্‌ রিওঅর্ড" গ্রন্থে :

It is not proper to regard the arts and sciences of amusement as destitute of utility ; on the contrary, there is nothing the utility of which is more incontestable. To what shall the character of utility be ascribed, if not to that which is a source of pleasure ? All that can be alleged in diminution of their utility is, that it is limited to the excitement of pleasure : they cannot disperse the clouds of grief or of misfortune. They are useless to those who are not pleased with them : they are useful only to those who take pleasure in them.

Prejudice apart, the game of push-pin is of equal value with the arts and sciences of music and poetry. If the game of push-pin furnish more pleasure, it is more valuable than either...Indeed, between poetry and truth there is a natural opposition : false morals, fictitious nature. The poet always

stands in need of something false...Truth, exactitude of every kind, is fatal to poetry."

[এমন মনে করা সঙ্গত হবে না যে আমোদদায়ক শিল্পগুলি নিতান্তই উপযোগরহিত। বরঞ্চ অন্য কোনো ব্যাপারেই এমন নিঃসংশয় উপযোগ পাওয়া যায় না। যে বস্তু প্রমোদের উৎস তাকেই যদি উপযোগসম্পন্ন মনে না করি তা'হলে করব কাকে? যদি বলতে হয় যে এদের (শিল্পগুলির) উপযোগ কিছু ক্ষুণ্ণ তা'হলে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে এই উপযোগ কেবল প্রমোদ-উত্তেজনাতেই সীমাবদ্ধ; শিল্প দ্বারা দুঃখের বা দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ অপসরণ করা যায় না। যাঁরা শিল্পে খুশি না হন তাঁদের পক্ষে শিল্প নির্মূল্য, যাঁরা শিল্পে খুশি হন তাঁদের পক্ষে এর উপযোগিতা সক্রিয়।

কোনো রকম অসূয়াপরবশ না হ'য়েও বলা যেতে পারে যে সঙ্গীত ও কাব্যকলা এবং পুশ্‌পিন্‌ নামক খেলা সমমূল্য। যদি পুশ্‌পিন খেলায় বেশি প্রমোদ লাভ হয় তা'হলে সে-খেলা সঙ্গীত ও কাব্যের চেয়ে অধিক মূল্যবান। বস্তুত কাব্যে ও সত্যে এক স্বাভাবিক বিদ্বেষ বর্তমান। কাব্যের নীতি মিথ্যা, প্রকৃতি অলীক। কবির পক্ষে সব সময়ই মিথ্যার প্রয়োজন। সত্য এবং যথার্থ সব কিছুই কাব্যের পক্ষে মারাত্মক।]

বেস্থামের কথা বড়ই রূঢ়, কবিতা লক্ষ্মী যদি শিউরে ওঠেন আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু কবিতার লাঞ্ছনা ইতিপূর্বেও কয়েকবার ঘটেছে। প্লেটোর আদর্শ রাজ্যে কবিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল, তার কারণ নিতান্তই দার্শনিক বটে কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে প্লেটোর যুক্তিতেও কাব্যের কারবার অলীক বস্তু ও অনৃতভাষণ নিয়েই। কয়েক শতাব্দী পরে সেন্ট্‌ অগস্টিন্‌ কাব্যবিরোধী হয়েছিলেন নিছক নৈতিকতার যুক্তিতে। কিন্তু লক্‌ থেকে বেন্থাম অবধি যে কাব্যতত্ত্ব প্রচারিত হ'ল, বলা যে হ'ল কাব্যের কোনো বিশেষ মূল্য নেই, কাব্য একটা হাল্‌কা ব্যসন মাত্র, এমন গুরুতর আঘাত কাব্যলক্ষ্মী কখনো পাননি, আর সে-আঘাত থেকে যে আদৌ আরোগ্য লাভ করেছেন এমন কোনো লক্ষণ আমি অন্তত দেখতে পাচ্ছি না। এ-প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমি মন্তব্য পেশ করেছি যে সতেরো শতকের পূর্বে শিল্পভাবনায় ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় কোনো আবশ্যিক বিরোধ ছিল না। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি অ্যানাটমি জানতেন, নারীদেহের অপরূপ সুষমাও

জানতেন। বিরোধ শুরু হয় সতেরো শতকে আর তার পর থেকে শিল্প-ভাবনায় ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান সৃষ্টি হতে লাগল তাকেই (ফরাসী লেখক রেমি দ্য গুর্ম'র একটি বাক্‌ভঙ্গী প্রয়োগ করে') টি এস্‌ এলিয়ট বললেন dissociation of sensibility, সংবেদনার ব্যবচ্ছেদ। এলিয়ট বলছেন যে সতেরো শতকের কবিদের (পশ্চিম ইওরোপীয়, বিশেষত ইংরেজ কবিদের) এমন এক অন্তঃশক্তি ছিল যার ফলে তাঁরা সর্বজাতীয় অভিজ্ঞতা পরিপাক করে ফেলতে পারতেন, তাঁদের বুদ্ধিতে ও অনুভূতিতে কোনো বিরোধ থাকত না, সুতরাং তাঁদের শিল্পক্রিয়ার সঙ্গে তাঁদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার কোনো ব্যবচ্ছেদ ঘটত না। শিল্পসৃষ্টিকারী সর্বভুক সেই অগ্নিবৈশ্বানরের শক্তি সতেরো শতক থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, আজ ইওরোপে দান্তে ও শেক্‌স্‌পিয়রের মতো শিল্পী পাওয়া যায় না যাঁদের সৃজনী-প্রতিভায় সে-বৈশ্বানর শক্তি বিদ্যমান।

(৪)

কাব্যের এই প্রচণ্ড সংকট সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কীট্‌স্‌, ওয়র্ড্‌স্বোয়র্থ টেনিসন্‌ প্রমুখ উনিশশতকী কবিগণ। শুধু অবহিত ছিলেন না, এ-সংকটের সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন। বস্তুত উনিশ শতকী ইওরোপীয় কাব্যতত্ত্বের মস্ত বড়ো ধারায় দেখতে পাই কাব্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হ'ল কী ভাবে? কাব্যবিরোধীদের প্রধান অভিযোগ ছিল যে কাব্যের কারবার মিথ্যা নিয়ে, সত্য মানে তথ্যের ও যুক্তির সত্য, তা'ছাড়া অন্য কোনো সত্য নেই। উনিশ শতকী কাব্যতাত্ত্বিক বললেন, তা নয়, তথ্যের ও যুক্তির সত্য তো ক্ষণিকের সত্য, আংশিক সত্য, স্থানকালপাত্র সাপেক্ষ সত্য। তার চেয়ে মহত্তর সত্য নিরবধিকালে নিঃসীম কল্পরাজ্যে বিচরণ করে, পরাজগতের সেই চির-অম্লান সত্য নিয়েই কবির কারবার। কাব্যের সত্যে ও তথ্যের সত্যে প্রভেদ বিশাল।

কিন্তু পরাজগতের সত্য কবির সাধ্যায়ত্ত হয় কী ভাবে? গোড়ায় এ নিয়ে কিছু অপরিচ্ছন্ন চিন্তা দেখা দিয়েছিল কিন্তু ক্রমে কাব্যতাত্ত্বিক মাত্রেই মানতে লাগলেন যে কবির, শিল্পীর একটা বিশেষ অসামান্য অন্তঃশক্তি আছে, সে-অন্তঃশক্তি মামুলি যুক্তির চেয়ে অনেক অনেক গভীরতর মহত্তর উজ্জলতর

শক্তি, সে-অন্তঃশক্তিকে বলা হবে কল্পনাশক্তি, ইম্যাজিনেশন্, যাকে গ্রীকরা বলতেন ফ্যান্টাসিয়া আর সংস্কৃত দার্শনিক বলতেন প্রতিভা। ওয়র্ডস্বোয়র্থ-কোল্‌রিজ্-রস্‌কিন এই কল্পনাশক্তির বর্ণনা করলেন। শেলিং-শ্লেগেল্-নোভালিস্-কাণ্ট বিশ্বাস করলেন যে সাধারণ যুক্তিবাদের তুলনায় এই প্রতিভাবাদ অনেক বেশি গ্রাহ্য। কবি-প্রতিভায় লোকের প্রত্যয় যে কত বেশি ফিরে আসতে লাগল তার চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে জন্ স্টুয়র্ট মিল্-এর উক্তিতে। মিল্ ছিলেন বেন্থামের আত্মিক উত্তরাধিকারী অথচ তিনিই তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন যে কাব্য সম্বন্ধে বেন্থামী সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নয়। বেন্থামবাদ বা উপযোগবাদে মনে করা হয়েছে যে মানুষ কেবল যুক্তিপরায়ণ, মানুষ যে আবেগ ও অনুভূতির জটিল পিণ্ড সে কথা মানা হয়নি আর এই অস্বীকরণের ফলে বেন্থামবাদে মস্ত ত্রুটি থেকে গেছে—এই কথা বললেন মিল্। মিল্ আরো বললেন যুক্তিতে যেমন সত্যের মার্গ, স্বজ্ঞা বা কল্পনাও তেমনি সত্যপন্থী। কাব্যে এই স্বজ্ঞাবান কল্পনার প্রকাশ, অতএব কাব্যকে অবহেলা করলে সুসমঞ্জস সত্যে পৌঁছনো যায় না।

ইতিপূর্বেই ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিরা শিল্পকল্পনায় পেয়েছিলেন পরম সত্যের সন্ধান। এখন কাণ্ট ও মিল্-এর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ তার্কিকদের সিদ্ধান্তের ফলে শিল্পকল্পনার হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

শিল্পকল্পনার গৌরব পুনরুজ্জীবিত ও প্রচারিত হ'ল বটে কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হ'ল কি? কাব্যের ও বিজ্ঞানের, স্বজ্ঞার ও জ্ঞানের, কল্পনার ও বুদ্ধির যে-বিচ্ছেদ ও বিরোধ জন্মেছিল, অখণ্ড সত্যের যে-দ্বৈততা শুরু হয়েছিল, যে-ব্যবচ্ছিন্ন সংবেদনায় সতেরো শতক থেকে কবিগণ পীড়িত হচ্ছিলেন, সে-বিচ্ছেদ বিরোধ দ্বৈততার কোনো সুরাহা তো হ'ল না! সতেরো শতকী কবির বুদ্ধিগম্য প্রত্যয়ে ও সহজ অনুভূতিতে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনা ছিল না, সতেরো শতকের পর থেকে আজ অবধি ক্রমেই এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিমথিত বেদনায় বিশ্বের শিল্পীচিত্ত শতধা থেকে সহস্রধা, ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর ব্যাকুল এবং বিকল। কবি এবং কাব্য-তাত্ত্বিক বলছেন স্বজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল কল্পনায় যে-সত্য উদ্‌ভাসিত হয় সে-সত্যই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্য, তথ্যের সত্য ধ্রুব নয় অতএব সত্যও নয়। কিন্তু একথা মানবেন না কোনো বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের সত্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও

পরীক্ষা নিরীক্ষার সত্য, তথ্যপরায়ণ যুক্তি ও বিচারের সত্য। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ অবশ্য আঠারো শতকী ও উনিশ শতকী বিজ্ঞানবিদের মতো জড়বাদী নন, তাঁর জগৎ আর সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যকারণপরবশ জগৎ নয়, হাইসেনবার্গের প্রিন্‌সিপ্‌ল্ অব্ ইন্‌ডিটারমিনেসি'র পরে বিজ্ঞান-চিন্তায়ও এক আশ্চর্য ঔদার্যের আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞানের তথ্যপ্রিয়তা, যুক্তিনির্ভরতা তো কিছুমাত্র কমেনি, কমবার কোনো লক্ষণ নেই, কারণও নেই। আর এই বিজ্ঞানই দিনের পর দিন সর্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারের মতো নিজ সাম্রাজ্য বাড়িয়ে চলেছে। আমাদের জ্ঞান বাড়ছে প্রতিদিন, সাংসারিক ও সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ক্রমেই বাড়ছে, প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক যুগের অজস্র বিপদ অসুবিধা থেকে আজ আমরা মুক্ত, পূর্বকালীন অলীক সংস্কার ও প্রত্যয়গুলি ধ্বসে' পড়ছে একে একে, আজকের জগৎ প্রায় বিজ্ঞানময়। অপরপক্ষে কাব্যের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে, কীট্‌স্-এর আশঙ্কা যেন কার্যকরী হয়েছে। যে-পৌরাণিক ও আধিদৈবিক প্রত্যয়ে অজস্র প্রাচীন কাব্য প্রতিষ্ঠিত সে সব প্রত্যয় আজকের দিনে গ্রাহ্য নয়, কোনো আধুনিক কবি আর "ডিভিনা কম্‌মেডিয়া" ও "প্যারাডাইস্ লস্ট" লিখতে পারেন না, ওবেরণ-টিটানিয়া-ক্যালিবান্-এরিয়েল্ আজ অন্তর্হিত। যদি কোনো আধুনিক কবি হঠাৎই পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয় নেন তা'হলে সে কাহিনীকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করতে হয় যাতে কিনা প্রতীকিত অর্থ চল্‌তি দুনিয়ার প্রত্যয়ের সঙ্গে মানানসই হয়। অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনীটি উপলক্ষ মাত্র, তার নিজস্ব মূল্য নেই। তা'ছাড়া কাহিনীর প্রাচীন প্রত্যয়ে ও তার আধুনিক প্রতীকিত প্রত্যয়ের বিভেদে একথাও প্রমাণ হয় যে যে-বস্তু কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে সে বস্তুতে তার বুদ্ধির সায় নেই, অর্থাৎ এলিয়ট-কথিত ডিসোসিয়েশন্ অব্ সেন্‌সিবিলিটি, সংবেদনার ব্যবচ্ছেদ প্রবল হয়েছে। আধুনিক কবি যখন কাব্যরচনা করেন তিনি যেন উটপাখির মতো চারিদিককার বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশাল জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে অস্থির বালুকার ক্ষুদ্র কন্দরে মাথা গুঁজে এক কল্পনারাজ্য রচনা করেন। কাব্য যেন এক পলায়ন-পন্থা। এই পলায়ন-পন্থার দৃষ্টান্ত হিসেবে আমেরিকান কবি হার্ট ক্রেইন্-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করব।

The familiar contention that science is inimical to poetry

is no more tenable than the kindred notion that theology has been proverbially hostile—with the *Commedia* of Dante to prove the contrary. That 'truth' which science pursues is radically different from the metaphorical, extra-logical 'truth' of the poet. When Blake wrote that "a tear is an intellectual thing, And a sigh is the sword of an Angel King"—he was not in any logical conflict with the principles of the Newtonian Universe.

[সচরাচর তর্ক ওঠে যে বিজ্ঞান কাব্যের শত্রু, এ-তর্ক তেমনি অগ্রাহ্য যেমন সংশ্লিষ্ট ধারণা যে ধর্মতত্ত্বও কাব্যের শত্রু ; দান্তের "কম্‌মেডিয়া"তে উল্টো কথাই প্রমাণ হয়। বিজ্ঞান যে সত্যের অভিসারী সে-সত্য কবির রূপকাশ্রিত, ন্যায়শাস্ত্রের অগম্য সত্য থেকে সম্পূর্ণত পৃথক। ব্লেইক যখন লিখেছিলেন "অশ্রুবিন্দু মনোভব বস্তু আর দেবদূতরাজের তরবারি হ'ল দীর্ঘশ্বাস", তখন তিনি এমন কোনো কথা বলেননি যা নিউটনীয় ব্রহ্মাণ্ডের বিধিনিয়মের বিরোধী।]

হার্ট ক্রেইনের এ-উক্তির ঠুন্‌কো চালাকি ধরতে বেশি বেগ পেতে হয় না। প্রথমত কেউ একথা বলেনি যে দান্তের জীবৎকালে ধর্মতত্ত্বে ও কাব্যে সে-বৈরিতার উদ্ভব হয়েছিল যা' ইদানীং হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ব্লেইকের রূপক নিউটনীয় ব্রহ্মাণ্ডের বিরোধী নয় বটে কিন্তু আসলে সে-ব্রহ্মাণ্ডে এসব রূপকের স্থানই নেই, এহেন রূপক নিয়ে কারবারই চলে না। তৃতীয়ত (এবং সব চেয়ে বড়ো কথা) হার্ট ক্রেইন বলছেন (অন্য অধিকাংশ কবিও এমন কথা বলছেন) যে কাব্যের সত্য ও বিজ্ঞানের সত্য প্রভিন্ন। এ কথাতেই আধুনিক কাব্য দর্শনের মৌল দুর্বলতা।

সত্য দুই রকমের, বিজ্ঞানের সত্য ও শিল্পের সত্য, আর শিল্পের সত্যই মহত্তর সত্য এহেন বিশ্বাসের প্রচারে কাব্যের মহতী ক্ষতি হয়েছে। কবি ও কাব্যতাত্ত্বিক কাব্যকে প্রত্যক্ষ পৃথিবীর অতীতে কোনো অলক্ষ্য অবাস্তব (সুতরাং অলীক) জগতে নিয়ে যাচ্ছেন। কাব্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক শিথিল হচ্ছে, পরিণাম কাব্যের পক্ষে শক্তিপ্রদ নয়। কিছুকাল পূর্বে 'কাব্য-প্রত্যয়'-নামা এক প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম যে কাব্যের প্রত্যয় ও ব্যবহারিক

প্রত্যয় মিলে' মিশে' অভিন্ন হ'তে পারে আবার বিভিন্নও হ'তে পারে, বস্তুত অধুনা প্রায়ই তেমন হ'য়েও থাকে। কিন্তু সে কথার মানে নয় যে যে-বস্তু কাব্যে সত্য, ব্যবহারিক জীবনে তা' সত্য নয়। আমি লিখেছিলাম লৌকিক প্রত্যয় ও কল্পলোকের প্রত্যয় স্বতন্ত্র বস্তু। প্রাক্-কাব্য বিষয় ও কাব্যোত্তর বিষয়, এ-দুইয়ে ততই প্রভেদ যতটা ফুলের বীজে ও ফুলটিতে। আসলে এ হচ্ছে শুদ্ধীকরণের ও উন্নয়নের প্রভেদ। যেন কাঁচা মাল ও তৈরি মালের প্রভেদ। কিন্তু শুদ্ধীকৃত কাব্যবস্তু (আমি সৎ কাব্যের কথাই বলছি) মিথ্যা হ'তে পারে না, প্রাক্শোধন কাব্যবস্তুও তেমনি মিথ্যা হ'তে পারে না। বস্তুত সমগ্র কাব্য প্রক্রিয়ায় মিথ্যার স্থান নেই। সে-যুক্তিতেই উক্ত প্রবন্ধের শেষ দিকে আমি আরো লিখেছিলেন, কাব্য সৎ হ'তে হ'লে কবিকেও হ'তে হবে সৎ, কবির শুদ্ধ প্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক প্রত্যয়ে কোন দুস্তর ব্যবধান থাকবে না।

হার্ট ক্রেইন্ যা' বলেছেন, যেমনধারা কথা অনেক উনিশ ও বিশ শতকী কবি বলেছেন ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে ও অন্যত্র (পণ্ডিতম্মন্য তালিকা প্রস্তুত করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়), সেই রোমান্টিক চিন্তাধারায় দুস্তর ব্যবধান, কাব্যেরই পক্ষে পরম হানিকর ব্যবধান, গড়ে' উঠেছে কবির শুদ্ধ প্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক প্রত্যয়ে। হানিকর, কেননা মানব সমাজের পক্ষে মনে করা সম্ভব নয় যে বিজ্ঞান মিথ্যা, বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ ভূয়া চাতুরী, অথচ পুঞ্জীভূত সত্য একমাত্র কবিকল্পনায়। যদি কোনো কালে বেছে নেওয়ার সমস্যা আসে তা'হলে মানবসমাজ বেছে নেবে বিজ্ঞানকেই।

(৫)

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক আসলে সাহিত্যিকের চিত্তে বিজ্ঞানের প্রভাব। ইওরোপে এ-প্রভাব দেখা দিয়েছিল মর্মন্তুদ তীক্ষ্ণতায় উনিশ শতকে, বাংলা সাহিত্যে সে-শতকে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বহুস্পর্শী শক্তির প্রতিভায় ছাড়া অন্য কোনো লেখকের চিত্তে এ-বিষয়ে কোনো চেতনা ছিল বলে' মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র কোঁৎ পড়েছিলেন, বিজ্ঞানের পটভূমিতে যে নূতন দর্শন গড়বার চেষ্টা হচ্ছিল ইওরোপে, তা'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁর "কৃষ্ণচরিত্র" "ধর্মতত্ত্ব" ও "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" প্রভৃতি আলোচনায় সে-দর্শনগ্রাহী

যৌক্তিকতার প্রমাণ। মাইকেল ছিলেন এ বিষয়ে অনবহিত। বঙ্কিমচন্দ্র ইওরোপে যাননি, মাইকেল গিয়েছিলেন বটে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক ইওরোপ জানতেন, পক্ষান্তরে মাইকেলের ইওরোপ, পেত্রার্কা ও ফ্রাঁসোয়া ভিলঁর ইওরোপ, আর পূর্বেকার ভর্জিলের ইওরোপ। যে-মিল্‌টনের কাব্য তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন এমন কি সে-মিল্‌টনেরও যে-শৈল্পিক সমস্যা তীব্র ছিল (বেস্‌ল্ উইলি যা'কে বলেছেন, The Heroic Poem in a Scientific Age) সে বিষয়ে মাইকেল অবহিত ছিলেন না। তাঁর সমস্যা ছিল 'হেরোয়িক পোয়েম্'-এর সমস্যা, 'সায়েন্টিফিক্ এইজ্'-এর নয়।

কোনো বিস্ময়ের বিষয় নয় যে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের অভিসংঘাত সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন। সে-চিন্তার কিছু নিদর্শন "সাহিত্যের পথে" নামক রচনা সংগ্রহে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে আছে বলেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না।' তিনি বলেছেন যে আধুনিক কাব্যের কাজ 'মনোহারিতা নয় মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য।' আরও বলেছেন, 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা।' এসব উক্তিতে প্রমাণ হয় যে যন্ত্রপ্রধান ব্যবহারিক জীবন ও তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানচিন্তা আধুনিক কাব্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। বস্তুত তাঁর শেষ দিককার লেখায় যে বিষয়াত্মতা প্রবল তা' কী পরিমাণে এই বিজ্ঞানচেতনা থেকে উৎসারিত সে কথার আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা যত গভীর যত যথার্থ হোক না কেন, সে-চেতনা তাঁর সমগ্র জীবন দর্শনকে কখনো বিভ্রান্ত করে নি. বিজ্ঞানের তত্ত্বে তিনি এমন কিছু পাননি যার দরুন তাঁর জীবনবোধ সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারত। ব্রাহ্ম সমাজের মুক্তসংস্কার আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে, মহর্ষির গম্ভীর ও উদার ঔপনিষদিক শিক্ষায় পরিপুষ্ট হয়ে', উনিশ শতকী ইওরোপের লিবৃর‍্যাল হিউম্যানিজম্ আপন ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম করে' রবীন্দ্রনাথ এমন এক দার্শনিক ভারসাম্যে পৌঁছেছিলেন যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানের যন্ত্রপ্রচণ্ড বহুসংস্কারধ্বংসী তত্ত্বগুলি কোনো উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে ইওরোপসুলভ ব্যবচ্ছিন্ন

সংবেদনার আভাস নেই। তাঁর মণীষায় ও আবেগে, প্রত্যয়ে ও কর্মে সে-অসঙ্গতি ও বৈরিতা নেই যা' বহু আধুনিক ইওরোপীয় কবির রচনায় প্রকট এমন কি তাঁর কোনো কোনো বঙ্গীয় উত্তরসূরীতেও পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য সমভাবেই নিটোল সর্বাঙ্গসুষম। আধুনিক বিজ্ঞানের অথবা বিজ্ঞানদ্বারা প্রভাবিত আধুনিক কাব্যের কোনো ত্রুটি তিনি দেখতে পাননি তেমন নয়। বাঙলা কাব্য সম্বন্ধে তিনি লিখলেন, 'যে দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে দেশের সাহিত্যে ধার করা সকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে?' ক্রুদ্ধ উক্তি, কিন্তু যেকালে এ-উক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছিল তখন নিতান্ত অযথার্থ ছিল না। যাঁরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার বাঙালী সাহিত্য জীবনের ভাগীদার ছিলেন তাঁরা জানেন যে বিজ্ঞান চিন্তা সে-কালে বঙ্গীয় সাহিত্যিক মনীষায় প্রবেশ করেনি, ততটুকুও করেনি যতখানি বিজ্ঞানী মনোভাব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রের সাহচর্যে। দু'চারজন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কথা বলছি না, প্রবীণ বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে তখনকার দিনে বিজ্ঞান দূরশ্রুত বাঁশরীধ্বনি মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত কশাঘাতের যাথার্থ্য স্বল্পক্ষণস্থায়ী কেননা তাঁর এই উক্তির সময়েই এক তরুণতর কবিগোষ্ঠী সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করছিলেন (আজ তাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ, কেউ কেউ ইতিমধ্যেই পরলোকগত হয়েছেন)। এই তরুণতর কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিষ্ণু দে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞান সচেতন বলে আমার মনে হয়। এঁরা যাঁর যাঁর কাব্যধারণার সঙ্গে বিজ্ঞান চিন্তার সাযুজ্য ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন, অন্য কোনো কবি তেমনটি করেননি বলে' আমার মনে হয়। কোনো আধুনিক কাব্যোৎসাহী হয়তো এ-বিষয় অধ্যয়ন করে' দেখবেন, অধ্যয়নের যোগ্য বিষয়।

একটা ভাসা ভাসা অর্থে বিজ্ঞান চেতনা কোনো কোনো কবির মধ্যে পাওয়া যায়।

(১) মনে রেখো ইলেকট্রনের তামাশা !
কিন্তু কেনই বা মনে রাখবো ?
আকাশে থাকুক জটিল দেশ-কাল-জড়ানো জ্যামিতি,
সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকাটি।

(২) তবু একদিন থাকবে না যুদ্ধ
বন্ধ্যা পৃথিবীর উত্তাপ
—নাইটারে গ্লিসারিনে গন্ধকে লোহায়—
নিভে যাবে সন্তানের স্বপ্নে।

(৩) নপুংসক বর্তমান ক্রুদ্ধ রাসায়নিকের মতো
রক্তময় অতীতের বীজাণু মিশায় অবিরত।

বাঙালী কবি বিজ্ঞানচেতনায় উদ্দীপিত নন ব'লে আমি উদ্বিগ্ন হচ্ছি না কেননা এহেন উদ্দীপনার অভাব ইওরোপীয় কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। এককালে যখন আমি ভিক্টরীয় যুগের ইংরেজি কাব্য অধ্যয়নে নিরত ছিলাম তখন সমসাময়িক বিজ্ঞানের দ্রুতবেগপ্রগতি লক্ষ্য করে' প্রথমে মনে করলাম যে তা'হলে এ-বিজ্ঞানের প্রতিচ্ছায়া নিশ্চয় কাব্যেও মিলবে। বাস্তবিক কাব্যপাঠে প্রতিপন্ন হ'ল আমার সে-অনুমান অযথার্থ। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্তকার ইংরেজি কাব্যে আমি মাত্র গুটি কুড়ি ছত্রস্তবক পেয়েছিলাম যাতে আদৌ বিজ্ঞানের কোনোরকম প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। এজন্য তিন শতের অধিক কাব্যগ্রন্থ আমাকে ঘাঁটতে হয়েছিল—খ্যাতনামা, আবার নিতান্তই কালজীর্ণ বিস্মৃত গ্রন্থ। এই ছত্রস্তবকগুলি ছাড়া অবশ্য টেনিসন্ ও ব্রাউনিংয়ের কিছু কাব্য, 'প্যারাসেল্সাস্', 'দি টু ভয়সেস্', 'দি প্রিন্সেস্', 'ইন্ মেমরিয়ম্'। গবেষণার নগণ্য পরিণতি! কিন্তু আসল কথা এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে ফ্যারাডে ডারুইনের যুগের ইংরেজ কবিচিত্তে বিজ্ঞান-চেতনা ছিল না। বাঙালী কবিচিত্তে আজও সে-চেতনা এসেছে কিনা আমার সন্দেহ। যখন বাঙালী কবি বলেন,

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস

তখন তাঁর প্রত্যয়তৃষ্ণা মূলত ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাসের জন্যই আকুল কিন্তু কেন যে বিগত কালের বিশ্বাস অটল ছিল আর সে-বিশ্বাস আজ অন্তর্হিত, এ অন্তর্ধানের মূল কারণ যে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অভিসংঘাত এমন ধারণা পাওয়া যায় না সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে, অন্তত সাক্ষাৎভাবে পাওয়া

যায় না। কবির আবেগের উপলক্ষ 'অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান', যুগযুগবাহিত ঈশ্বরকল্পনা। এ হেন ঈশ্বরসংশয় অথবা নিরীশ্বরপ্রত্যয় সাহিত্যের ও চিন্তার ইতিহাসে আদৌ নূতন নয়, বস্তুত যেদিন থেকে ঈশ্বরের আবির্ভাব সেদিন থেকে যাত্রা শুরু নিরীশ্বরেরও। অতএব যদিও সুধীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সংশয় বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান চিন্তার সাক্ষাৎ পরিণাম হতেও পারে যেমন হয়েছিল ম্যাথিউ আর্ণল্ডের ছত্রে (We are between two worlds, The one lost and the other powerless to be born,' আমরা আছি দুই জগতের মাঝখানে, একটি গেছে হারিয়ে, আরেকটির শক্তিই নেই জন্মাবার) তবুও কাব্যের ঈশ্বরসংশয় অথবা ঈশ্বরপ্রত্যয়কামনা গতানুগতিক দার্শনিক প্রত্যয়েচ্ছারই অংশ মাত্র। এমন ইচ্ছা ষোলো শতকে বা প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় যুগেও প্রকাশিত হ'তে বাধা ছিল না, প্রকাশিত হ'য়েছিল।

এমন কথা বলার কোনো প্রলাপী অভিপ্রায় আমার নেই যে কবিদের বিজ্ঞান সচেতন হতেই হবে। কবির বিশ্ববীক্ষার কোন্ উপকরণটি হবে সৃজনকারী সে কথা বলার ধৃষ্টতা থাকবে কোন্ সমালোচকের? আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে সে-বিশ্ববীক্ষা যদি বিপর্যস্ত ও প্রত্যয়ক্লিন্ন হয়, তার অনুভূতিসঞ্চারক্ষমতাও হবে ক্ষীণ, তার শিল্পসিদ্ধি হবে অসম্পূর্ণ। আধুনিক ইওরোপীয় কাব্যের মস্ত অংশেই (বিশেষত আঠারো শতকোত্তর কাব্যে) এই অসম্পূর্ণ শিল্পসাধনা ও সিদ্ধির মোহর আঁকা। কবিগণ একদিকে ভেবেছেন যে পরম সত্য কাব্যেই নিহিত, বিজ্ঞানে নয়, বিজ্ঞানের সত্য ক্ষণস্থায়ী। এমন ভাবনার ফলে জড়জগতের এলাকায় বিজ্ঞানের যে ক্রমেই বেড়ে-উঠতে-থাকা মহতী বিজয়যাত্রা তা' থেকে আলাদা হ'য়ে পড়ল শিল্পীচিত্ত, কাব্যের জড়জাগতিক আবেষ্টনী ক্রমেই সঙ্কুচিত হ'তে থাকল, শিল্পের বিষয়বস্তু বহির্জগৎ থেকে সরে' এসে আশ্রয় নিল শিল্পীর আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় ও মানসিকতায় আর এই পিছু-হঠে-যাওয়া, ক্রমেই কোণ-ঠেসা, সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে শিল্পের অঙ্গচালনাকে সমালোচকগণ মস্ত নাম দিয়ে ('সম্বিৎ প্রবাহ', 'মনস্তাত্ত্বিক শিল্প', 'অ্যাবস্‌ট্রাক্ট শিল্প' প্রভৃতি) পরিতৃপ্ত হলেন। এই সঙ্গে আরেকটি ব্যাপারও ঘটল। কবিরা শিল্পদর্শনে অগ্রাহ্য করলেন বিজ্ঞানকে কিন্তু ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে বিজ্ঞানসম্ভূত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সদ্ব্যবহারে কিছুমাত্র উদাসীন রইলেন না।

এইভাবে টেক্‌নলজি স্বীকার হওয়ার ফলে প্রাচীন উপকথা, বীর্যগাথা, লোকপ্রত্যয়গুলি অবহেলিত হ'তে থাকল, কাব্যের বিষয়বস্তুর এলাকা এভাবেও সঙ্কীর্ণ হ'ল। কবিরা যতই বাইরের জগৎ ছেড়ে মনোজগতে প্রবেশ করতে লাগলেন ততই বাড়ল কাব্যের দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা। ডক্টর জন্‌সনের "রাসেলাস্" নামক গ্রন্থে ইমলাক্ বলছেন যে কবির কর্তব্য বিশেষ গুণের বিচার নয় সাধারণ গুণের বিচার। এই সারবান্ ক্লাসিকপন্থী উপদেশ আধুনিক কবি (তথা শিল্পী) ভুলে গেছেন। তাঁর ধ্যেয় ভূমা নয়, ক্ষুদ্র আয়তন মাত্র। কবিরা নিজ নিজ সংবেদনার সঙ্কীর্ণ আয়তনের চারিদিকে দেয়াল তুলছেন, উঁচু থেকে আরো উঁচু হচ্ছে সে-দেয়াল। অথবা বলা যায়, কবিরা বাইরের জগৎ ছেড়ে নিজ নিজ চিত্তেই সুড়ঙ্গ খুঁড়ছেন। এই অপরিসীম আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে অনেক কবির বাক্‌প্রতিমায় এবং সংবেদনাপ্রবাহে সে-অসুস্থ বিকারস্তিমিত মানসিকতা প্রবেশ করেছে যা' দস্তয়েভ্‌স্কির "নোট্‌স্ ফ্রম দি আণ্ডারগ্রাউণ্ড" অথবা কাফ্‌কার কাহিনীগুলিতে প্রতীকিত। আর এ-কারণে আজকের সমাজ থেকে কাব্যের সর্বজনগ্রাহ্যতা লোপ পেয়ে গেছে। কাব্য বা কবির নামে আমরা গদগদ-বচন কিন্তু বেশ দূরে দাঁড়িয়ে। যদিও বা কিছু কাব্য কিছু উপন্যাস পড়ি, তা'র মধ্যে আবার উঁচুকপালে, মাঝ-কপালে, নিচুকপালে প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ মেনে চলি।

এই ক্লেশকর ক্লান্তিকর অবস্থা থেকে, কাব্যশক্তির ক্রমক্ষীণতা থেকে, মুক্তি পেতে হ'লে কবিকে বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানের সত্যে ও শিল্পের সত্যে কোনো বৈরিতা সম্ভব নয়, প্রাক্‌রেনেশাঁস যুগে ছিল না, এখনো থাকা স্বাভাবিক নয়। কীভাবে এই আপাতবৈরিতা অপসৃত হবে সে কথা হয়তো কবি শুরুতে বলতে পারবেন না কেননা দ্রুতধাবমান যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বিজ্ঞান-সম্ভূত প্রত্যক্ষ সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আর সাধারণ মানুষের নীতিবোধ ও অনুভূতি কী ভাবে পরস্পরে মানানসই হবে, মিলে' মিশে' এক হবে, সে-সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব মূলত দার্শনিকের। হয়তো বর্ট্রণ্ড রাসেল্ ও হোয়াইটহেড্-এর প্রয়াসেও বিজ্ঞান ও শিল্প সাযুজ্যলাভ করেনি, হয়তো করবে আগামী দার্শনিকের চিন্তায়। মানুষের নীতিবোধ ও অনুভূতির সুসঙ্গতিসাধন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে, সে-কাজও কবির নয় সমাজবিদের। কিন্তু কবি অন্তত এই প্রত্যয়সম্পন্ন হবেন যে জীবনের বিচিত্র বিশাল এলাকায়,

আপাতবিরোধের গভীরে ঐক্য বিদ্যমান, বিজ্ঞানে ও শিল্পে, কল্পনায় ও কর্মে, জ্ঞানে ও স্বজ্ঞায়, নীতিতে ও অনুভূতিতে একই জীবন-মহাদেবের নৃত্য। যাকে বিরোধ মনে করা যায়, সে আসলে অহ্রিমান ও অহূর-মাজ্‌দার নিরন্তর সংগ্রামশীল লীলাছন্দ। কবির জগৎ অখণ্ড জগৎ।

কাব্যপ্রত্যয়

(১)

প্রশ্ন উঠেছে, কাব্য ও প্রত্যয়, এ-দুইয়ে কী সম্পর্ক? কোনো কাব্যের রসমাধুরী উপভোগ করছি, একথার মানে কি এই যে সে-কাব্যের বক্তব্য-বস্তুটি সত্য ব'লে মেনেছি? অথবা, প্রশ্নটি ঘুরিয়ে বলা যাক : যদি কোনো কাব্যের বক্তব্যবস্তুতে আমার প্রতীতি না থাকে অথবা মাত্র অংশত থাকে, তাহলে সে-অনুপাতে আমার রসসম্ভোগও কি মাত্রই আংশিক অথবা সম্পূর্ণ ব্যাহত? কাব্যসম্ভোগ ও কাব্যবস্তুতে প্রত্যয়, এ-দুই ভিন্ন না অভিন্ন?

দুয়েকটি কাব্যের উল্লেখে প্রশ্নটিকে আরো বিশদ করা যাক। ইংরেজি কাব্যের উল্লেখে মিল্‌টনের "প্যারাডাইজ্‌ লস্‌ট্‌" খ্যাতিমান কাব্য, বহু পাঠকের মতো আমি এর অনুরাগী—কোনো কোনো প্রভাবশালী আধুনিক পণ্ডিতের মিল্‌টন্‌-বিরোধিতা সত্ত্বেও। অথচ এই কাব্যগ্রন্থের আখ্যানটি আমি নিছক কপোলকল্পনার অধিক মনে করি না, এর অন্তর্গত ধর্মশাস্ত্রীয় তর্কে আমি আকৃষ্ট হই না। আমি যদি ক্রিশ্চ্যান হতাম, ইওরোপীয় হতাম, সতেরো শতকী ইংরেজ পিউরিটান হতাম, তাহলে কে জানে হয়তো আদম-হবার আখ্যানটি সত্য বলে গ্রহণ করতে পারতাম, আর যদি ইহুদী ক্যাথলিক অথবা ইসলামী পুরাণে বিশ্বাসী হতাম, তাহলেও আখ্যানটির সত্যতায় বিশ্বাস করতে পারতাম যদিও ঠিক মিল্‌টনের অনুভাবনায় নয়। কিন্তু আমার নিজ প্রত্যয়গুলির ধর্মীয় ও সামাজিক পশ্চাৎপট অন্যরূপ আর বস্তুত কোনো পৌরাণিক আখ্যানকেই আমি ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করি না। আখ্যানের ঐতিহাসিকতায় অপ্রত্যয়ী হয়েও আমি "প্যারাডাইজ্‌ লস্‌ট্‌" কাব্যের অনুরাগী, সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিদেনে একজন সাহিত্য-পাঠকের ক্ষেত্রে প্রত্যয়াভাব রসাস্বাদনের বিপন্থী নয়। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, আমি যদি আখ্যানভাগে পূর্ণপ্রত্যয়ী হতাম, তাহলে কি আমার রসসম্ভোগ আরো নিবিড়, আরো সমৃদ্ধ হত?

মূল প্রশ্নের কয়েকটি অনুপ্রশ্ন আছে। প্রত্যয়-সমস্যার একদিকে দেখছি কাব্যের বিষয়বস্তুতে পাঠক প্রত্যয়হীন অথচ কবি স্বয়ং প্রত্যয়ী। এই সঙ্গে এ-ও কি সম্ভব নয় যে কাব্যের আখ্যানে (অথবা তার অংশ বিশেষে) অথবা

আখ্যান-সঞ্জাত চিন্তায় ও ভাববস্তুতে কবি নিজেই অপ্রত্যয়ী অথবা অগভীর-প্রত্যয়ী ? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবার মিল্‌টনের উল্লেখ প্রয়োজন। দেখতে পাই "প্যারাডাইজ্ লস্ট্"-এর সৌরজগৎ টলেমির মতানুসারী যদিচ মিল্‌টন্ শুধু যে গ্যালিলেওর সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন এমন নয়, তৎকালীন ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূক্ষ্ম আবিষ্কারাদি সম্বন্ধেও ওয়াকিফ্‌হাল ছিলেন আর বিলক্ষণ জানতেন যে কোপার্ণিকাস্-এর নবগণনার অভিসংঘাতে প্রাচীন গ্রীক জ্যোতিষশাস্ত্র অচল হয়ে গেছে। এ এক আশ্চর্য ব্যাসকূট। যে-ভাবনা অগ্রাহ্য হয়েছে কবির আপন জ্ঞানমঞ্জুষায়, সে-ভাবনাকেই তিনি সাদরে ব্যবহার করেছেন কাব্যের অলঙ্করণে। শিল্পীপ্রত্যয়ে যার অস্তি, ফলিত বিশ্বাসে তারই নেতি। আরেক দৃষ্টান্তে ইয়েট্‌স্-এর উল্লেখ করতে হয়। ইয়েট্‌স্ আজীবন ছিলেন অলোক সন্ধানী কিন্তু তাঁর কাব্যবিবর্তনের তৃতীয় স্তরের ভিত্তি হিসাবে জ্যোতিষ-গণিত-প্রেততত্ত্ব প্রভৃতির যে পাঁচমিশেলি চিন্তা-সমুচ্চয় তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাতে তাঁর নিজেরই সম্যক মনীষিক প্রত্যয় ছিল না অথচ সে-চিন্তা সমুচ্চয় তাঁর অনেক মহৎ কবিতার তাত্ত্বিক পশ্চাৎপট। এক্ষেত্রেও দেখছি কবির মনীষাগ্রাহ্য বিশ্বাসে ও শিল্পী প্রত্যয়ে অসঙ্গতি, ব্যবহারিক জ্ঞানে ও রসজ্ঞানে ব্যবধান, সৃজনীকল্পনার সত্য ও বুদ্ধিনির্ভর সত্য যেন দুটি প্রভিন্ন সত্য।

আরেকটি জ্ঞাতিপ্রশ্ন তুলতে হচ্ছে। যদি বলি যে কাব্য সম্ভোগ মানেই কাব্যের বিষয় বস্তুতে প্রত্যয়, অর্থাৎ সম্ভোগ ও প্রত্যয় চলে সমতালে, তা'হলে প্রশ্ন উঠতে পারে—কাব্যের কোনো চিরন্তনতা আছে কিনা। কাব্যের বিষয়বস্তু বলতে কোন্ বস্তু বুঝব—ব্যবহারিক জীবনের তথ্য ও বিষয় বুঝব তো ? তা' নইলে প্রশ্নটি আদৌ ওঠে কেমন করে ? আর তা' যদি বুঝি, তা'হলে কাব্যের চিরন্তনতায় সংশয় জাগা সম্ভব, কেন না ব্যবহারিক জগতের তথ্য ও বিষয়, ব্যবহারিক জীবনের সত্য, সদাপরিবর্তনশীল, দেশে দেশে পুরুষ পর্যায়ে পুরুষ পর্যায়ে মানুষে মানুষে বদলায়। জীবনের ও সংস্কৃতির মূল্যমান বদলায়। এই অধ্রুব সত্য ও মূল্যের প্রভাবে কাব্যমূল্যও বদলাবে, আজকের কাব্য বাতিল হবে আগামী কালে, কাব্যের কোনো শাশ্বত রস থাকবে না। (বেশি এগোবার পূর্বেই বলা ভালো যে শাশ্বত বলতে নিরবধি কালের কথা ভাবছিনা, ভাবছি ইতিহাস-আয়ত্ত গণনাসাধ্য কয়েক শতাব্দীর কথা, যে বিশ ত্রিশ

শতাব্দীকালে দর্শনে ও শিল্পে মানুষের অন্তঃশক্তির প্রকাশগুলি মোটের উপরে অপরিবর্তিত মূল্যের মর্যাদা পেয়েছে।) যদি এই দাবী করি যে কাব্যে প্রতিফলিত হবে ব্যবহারিক জীবনের সত্য, তা'হলে অনেক প্রাচীন ও ধ্রুপদী কাব্য অচল হয়ে যাবে আজকের দিনে। বস্তুত "রঘুবংশম্", "ইন্‌ফার্নো", "হ্যাম্‌লেট" অবধি আজ বাতিল হতে পারে যদি আমাদের কাব্যসম্ভোগস্পৃহা নিয়ত কেবল ফলিত সত্যের সন্ধান করে। মহৎ কাব্য কি নিতান্তই যুগধর্মসাপেক্ষ, তার কি কোনো স্বয়মুজ্জ্বল শিল্পধর্ম নেই?

যদি বলি যে পাঠকের কাব্যানন্দ প্রত্যয়নিরপেক্ষ, কাব্যবস্তুতে তাঁর বিশ্বাস না থাকলেও কাব্যরস তাঁর ভোগায়ত্ত, তা'হলে অন্য সংশয় জাগে— কাব্যবস্তুতে প্রত্যয় কি কাব্যরস থেকে আলাদা? স্পেন্‌সারের রেড্‌ক্রেশ্ নাইটের উপাখ্যান উড়িয়ে দিলাম গালগল্প বলে' অথচ স্বীকার করলাম তিনি উৎকৃষ্ট কবি কেন না ছন্দোমাধুর্যে ও বাক্‌প্রতিমার সৌন্দর্যে তিনি অতুলনীয়, এ হেন দ্বৈততা কি সদ্বিবেকী সমালোচনায় সম্ভব অথবা গ্রাহ্য? একদিকে বলছি যে বুলি বটম্-ওবেরণ-টিটানিয়ার কাহিনীটি নেহাৎই আষাঢ়ে গল্প—শেক্‌স্‌পিয়র নিজেই নাম দিয়েছেন "মিড্ সামার নাইটস্ ড্রীম্"— আরেক পক্ষে বলছি এ-রচনায় কবিত্বরস অপূর্ব, এহেন উক্তিতেও কোনো অপরিচ্ছন্ন চিন্তার ও বিভ্রান্ত সংবেদনার লূতাতন্তু বিদ্যমান।

এতগুলি প্রশ্ন উত্থাপনের পরে আরো দুটি বিষয়ে অবহিত হয়ে প্রশ্ন সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যাবে। প্রথমত মনে রাখা দরকার যে কাব্যে প্রত্যয়ের সমস্যা প্রধানত চিন্তাগর্ভ কাব্যে নিহিত। যে-কাব্য কোনো দার্শনিক ধর্মীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব আত্মসাৎ করেছে, কোনো আখ্যানকথনে নিযুক্ত হয়েও পাঠকের মনে তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদ্রেক করেছে, অর্থাৎ যে-কাব্যে কবি শুদ্ধ অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ না হয়ে কোনো মননক্রিয়ায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন, সে-কাব্যেরই মূল্যায়নে প্রত্যয়ের প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা অনুসারে কবিত্ব এক ধরনের মনন ক্রিয়া। উপনিষৎগুলির ভাষ্য রচনাকালে শঙ্করাচার্য একাধিকবার "কবি" শব্দটির তাৎপর্য করেছেন "ক্রান্তদর্শী" "মেধাবী" অর্থে, সে-অর্থে কবি অবশ্যই মননক্রিয়াশীল পুরুষ। মননক্রিয়া ব্যতীত প্রত্যয়ের সমস্যা উঠতে পারে না, আর যেহেতু কাব্যের যে-কোনো বিষয়বস্তুতে, যে-কোনো প্রকারের কাব্যে (গীতি-উদ্বেল বিশুদ্ধ

লিরিক কাব্যেও) অল্প বিস্তর মননক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী সে জন্য প্রায় সব কাব্যের আলোচনাতেই প্রত্যয়সমস্যা অনুলিপ্ত।

দ্বিতীয় কথা, এ-সমস্যা শিল্পীর বা কবির নিজের সমস্যা নয়, এ-সমস্যা পাঠকের ও সমালোচকের। কবি তাঁর সৃষ্টির বোঝা নামিয়ে খালাস, এখন দায়িত্ব সমালোচকের। কবি যদি বিচক্ষণ সমালোচকও হন—যেমন কোল্‌রিজ্‌ ও এলিয়ট—তাহলে তাঁর বিশ্লেষণ আমাদের শ্রদ্ধার্হ, তাঁর বিশ্লেষণের সাহায্যে আমাদের বিচার নিশ্চয়তা পেতে পারে, কিন্তু অপর পক্ষে কবিরা সব সময়ে বিচক্ষণ না-ও হতে পারেন, অনেক সময় স্বীয় সৃষ্টি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যানাতীত রহস্য বলে মনে হতে পারে (কৌতূহলী সোক্রাটেস যেমন তাঁর প্রশ্নের ঝুলি নিয়ে অনেক কবির কাছে উপস্থিত হয়ে স্তব্ধবাক রহস্যবোধের অধিক কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য উত্তর অথবা আলোচনা পাননি), আর সে জন্যই সৎ সমালোচকের দায়িত্ব গুরুভার, তাঁর বুদ্ধি বিদ্যা ও শৈল্পিক সংবেদনার মান বেশ উঁচু হওয়া দরকার। প্রত্যয়ের সমস্যায় সমালোচকের মেধা নিষ্ঠা ও সার্বিক যোগ্যতার কঠিন পরীক্ষা।

(২)

কাব্যপ্রত্যয়ের সমস্যা আধুনিক সভ্যতার খুবই যুগসম্মত লক্ষণ কেননা শিল্পীর বিশ্বাসে (ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন, সব রকম তত্ত্বজ বিশ্বাসে) ও পাঠকের বিশ্বাসে যে-অসঙ্গতি ও বিরোধ জন্মেছে বিগত দুই শতাব্দীর যন্ত্রনির্ভর সমাজ-বিন্যাসের অবধারিত পরিণাম হিসাবে, প্রাক-রেনেসাঁস ইওরোপে (এবং বিংশ শতকী এশিয়ায় ও আফ্রিকায়) তার কোনো ব্যাপক সচরাচরিক প্রকাশ নেই। ষোড়শ শতক পর্যন্ত যে-কোনো যুগে, যে-কোনো সমাজে, মানুষে মানুষে চিন্তার ও সংবেদনার মোটামুটি অভিন্নতা ছিল এমন বলা অপভাষণ নয় যদিও একথা বলার সময় অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে সামাজিক চিন্তা সে-সব কালেও অখণ্ড বস্তু ছিল না, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে তখনো বিরাজ করত ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও সংবেদনা—কিন্তু তা' হলেও তো বলা চলে যে সে-সমস্ত টুকরো সমাজগোষ্ঠীর খণ্ডিত গণ্ডীতে সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা ছিল!—আর একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে চিন্তা ও সংবেদনার অভিন্নতার মানে এই নয় যে কোনো দ্বিতীয় চিন্তা একেবারেই অনুপস্থিত,

অনুভব। চিন্তার একচেটিয়া অস্তিত্ব এ-কালের টোটেলিটারিয়ান সমাজেই সম্ভব হয়েছে। হয়েছে অসহিষ্ণু হিংসাপরায়ণ নিষ্ঠুর অপরবিনাশী কার্য-কলাপের ফলে। অতীতে কোনো সমাজেই, ধর্মোন্মত্ত গোঁড়া সমাজেও, অবিচিত্র একবর্ণ-চিন্তার ষ্টীম্‌রোলার্ চলে নি যা' আমরা এ-শতাব্দীর ইওরোপে এবং সম্প্রতি এশিয়ায় দেখতে পাচ্ছি। প্রবল ও প্রধান একটি চিন্তা অবশ্য সব সমাজেই থেকেছে কিন্তু সেই চিন্তাবৃত্তের স্পর্শরেখায় (tangent) অন্য চিন্তারও স্থান হয়েছে। সুতরাং যে-অভিন্নতার কথা বলেছি তা আপেক্ষিক, রেলেটিভ্, নিতান্তই নিরঙ্কুশ নয়।

যতদূর জানি তাতে মনে হয় যে প্রাক-রেনেসাঁস ইওরোপে সমাজমানস ছিল সমজাতিক (homogeneous) অন্তত আধুনিক বহুধাবিভক্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সমাজ-মানসের তুলনায় তো বটেই। আর সেই সমজাতিকতার কারণে শিল্পী তাঁর চারিদিককার ভাবমণ্ডলের সঙ্গে স্বীয় ভাবানুভূতির কোন বিভ্রমকারী অসঙ্গতি বোধ করতেন না। যে-অস্ফুট গোঙানি আজ আধুনিক কবির বিমথিত হৃদয় থেকে উৎসারিত, যে-নিরবকাশ অন্তর্দ্বন্দ্বে কবির চিত্ত ও মেধা বিপর্যস্ত ও শিথিল, তাঁর কাব্য যার ফলে একান্তই আত্মনিবিষ্ট (subjective) ও ব্যাধিত, সে-বেদনার উদ্ভব মূলত আধুনিক শিল্পীমানসের নিরন্তর একাকীত্ব-বোধে।

(১) Alone, alone, all all alone,
Alone, on a wide wide sea.

(২) Yes, in the sea of life enisled,
We mortal millions live alone.

(৩) আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।

আধুনিক কাব্যের সর্বাধিক ব্যবহৃত শব্দ এই alone, আর আধুনিক শিল্পীমানসের নিখুঁত প্রতীক এই অগণন বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট দ্বীপ-ছড়ানো বিস্তীর্ণ সমুদ্র, যে-প্রতীক বা যে-প্রতীকভাবনা ছড়িয়ে আছে রিল্‌কে, ইয়েট্‌স্, এমিলি ডিকিন্‌সনের কবিতায়। আমি এমন বলছি না যে বিষণ্ণ সুর আধুনিক

কাব্যেরই বৈশিষ্ট্য। তা' নয়। সর্বযুগের কাব্যেই কোথাও না কোথাও বিষণ্ণ সুর মেলে কেন না বিষাদ তো সার্বজনিক জীবনবোধেরই একটা দিক। টিউডর কবি, মধ্যযুগীয় ত্রুবাদুর কবি, স্যাক্সন্ কবি, লাটিন কবি ও গ্রীক কবির রচনায় বিষাদ প্রচুর, সংস্কৃত কাব্যে মোটেই অপ্রচুর নয়। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে বিষণ্ণ সুর কমবেশি বর্তমান, এমন কি যেখানে সূক্ষ্ম বেদনার প্রত্যাশা করি না—কাশ্মীরের গ্রামাঞ্চলে, কাংড়া উপত্যকায়, আরাবল্লীর পাহাড়ে, পূর্ববঙ্গে পুরুষানুক্রমিক নৌকাবাসীর সমাজে—সেখানেও লোকসঙ্গীতে বিষণ্ণ সুর আদৌ বিরল নয়। কিন্তু বিষণ্ণ সুরেরও আধুনিক ও প্রাগাধুনিক দু'টি রূপ আছে। কোল্‌রিজ্ ও জীবনানন্দর যে-ছত্রগুলি উপরে উদ্ধৃত করেছি তাতে যে-অতীব আত্মনিবিষ্ট কবিচিত্তের নিঃসঙ্গ জীবনক্লান্ত মানসের পরিচয়, প্রাগাধুনিক কাব্যের অথবা লোকসঙ্গীতের সমষ্টিগ্রাহ্য বেদনায় তা' পাওয়া যাবে না। এ-কালের কাব্যে ও তার পরিবেশে যে-আত্মসচেতন ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়, চসর্-পেত্রার্ক-দান্তে, কাটুল্লুস্-প্রপার্শিয়াস-ভর্জিল প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কাব্যপ্রত্যয়ে ও তদানীন্তন কাব্যামোদীর ব্যবহারিক প্রত্যয়ে তেমন কোনো ক্লেশকর বিরোধ ছিল বলে জানা যায় না।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির রুচি ও প্রত্যয়বিভেদে সাম্প্রতিক কাব্যপ্রত্যয়ের সমস্যা নিষণ্ণ। যেহেতু প্রাগাধুনিক কালে ব্যষ্টি ও সমষ্টির চিন্তাধারায় ও সংবেদনায় কোনো ব্যাপক গভীর প্রবল বিভেদ ছিল না সেজন্য কাব্যপ্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক প্রত্যয়ে, কবির নিজ প্রত্যয়ে ও তাঁর পাঠক সমষ্টির প্রত্যয়ে, উল্লেখযোগ্য বিভেদ থাকত না। "কুমার সম্ভব", "উত্তর রামচরিত", কাশীরাম দাসের "মহাভারত" ও "অন্নদামঙ্গলের" পাঠকের চিত্তে এসব কাব্যের আখ্যান (তা সে যতই অলৌকিক হোক না কেন) আর এ সব কাব্যের ভাবপ্রত্যয় কোনো সমস্যা বা সংশয়ের উদ্রেক করেনি। বস্তুত ব্যষ্টিমানসে সেকালে এতই নিবিড় সঙ্গতি ছিল (বিশেষত বাঙলা দেশে) যে ধর্ম-বিভেদেও শৈল্পিক প্রত্যয়বিভেদ ঘটেনি। মুসলমান কবি হিন্দু পুরাণ নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন, হিন্দু পুরাণে আল্লাহ্ অবতীর্ণ হয়েছেন, একই প্রতীক সম্বলিত বাউল গান লিখেছেন হিন্দূ ও মুসলমান কবি। ভারতীয় ও ইওরোপীয় সাহিত্য চিন্তার সঙ্গে আমার যেটুকু অসম্যক পরিচয় আছে তাতে

এমন জানি নি যে প্রত্যয়বিভেদের কোনো গভীর প্রশ্ন অতীতে উঠেছিল। এ-সমস্যা জন্মলাভ করেছে অধুনা আর জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র হয়েছে। ইদানীংকার কাব্যপাঠ কালে আমরা মুহুর্মুহুঃ সংশয়পীড়িত হয়ে থাকি, প্রতিনিয়তই বোধ করি কবিপ্রতীতির সঙ্গে, কাব্যপ্রত্যয়ের সঙ্গে, নিজেদের বিশ্বাসে অসঙ্গতি বিদ্যমান।

এ-অসঙ্গতি সাহিত্যের ও শিল্পের ইতিহাসের অবিস্মর্তব্য অধ্যায় কিন্তু কেবল সাহিত্যের ও শিল্পেরই অধ্যায় নয়, সমগ্র আধুনিক জীবনের অধ্যায়। অসঙ্গতির উদ্ভব কোথায় সে অতি জটিল ও দুরূহ প্রশ্ন, তার আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের এলাকার বাইরে আর আমার বিশ্লেষণ-ক্ষমতারও বাইরে কিন্তু যে-সমালোচক ভুলে যাবেন যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিভেদ আজ সহস্র-স্রোতা আর সাহিত্যে তার একটিমাত্র স্রোতই প্রবাহিনী, সাহিত্যিক সংশয় জীবনের সামগ্রিক সংশয়ের অংশমাত্র, তাঁর সাহিত্যিক প্রবেশপথ হবে ভ্রান্ত, সাহিত্যসন্দর্শন হবে বিকৃত, ছায়াচ্ছন্ন।

(৩)

কাব্যপ্রত্যয়ের আলোচনায় কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আমরা একটি মস্ত অঙ্গীকারে (assumption) পৌঁছই। প্রত্যয় সংক্রান্ত সমস্যাগুলিতে এই মেনে নেওয়া হয়েছে যে কাব্যের বিষয়বস্তু ও কাব্য সমার্থক, কাব্যের সঙ্গে অনুস্পন্দিত হতে হলে কাব্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করতেই হবে। কাব্য মানেই কাব্যের বক্তব্য। আলোচক মনে করেন যে অখণ্ড কাব্যসত্তা থেকে কবিতাটির বুদ্ধিগ্রাহ্য বক্তব্যটি যদি নিষ্কাশিত করে নেওয়া যায়, যদি তিনি বলতে পারেন 'বলাকা' কবিতাটির বক্তব্যনির্যাস কী এবং তার সঙ্গে উপনিষদের "চরৈবেতি" ভাবনার অথবা বের্গসঁর "এলাঁ ভিতাল" ভাবনার জ্ঞাতিত্ব কোথায়, যখন জানলেন বিজান্‌শিয়ম্‌ নগরীর উল্লেখে কোন্‌ প্রতীকভাবনা ব্যঞ্জিত হয়েছে ইয়েট্‌সের কবিতায়, তখন নিরুদ্বেগ তুষ্টচিত্তে তিনি নানারূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারেন। তিনি আলোচনা করবেন কবিতাটির তাত্ত্বিক বক্তব্যটি অন্য কোন্‌ কবির বক্তব্যের সঙ্গে অন্বিত অথবা বিযুক্ত, বক্তব্যটি পাঠকের প্রত্যয়সাধ্য কিনা, জাতির কৌমের ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলদায়ক কিনা, কবির স্বীয় ব্যবহারিক প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গত কিনা—যে সব

ইত্যাকার পণ্ডিতী আলোচনার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কবির ক্ষমাহীন বিদ্রূপ :

> বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা ;
> পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের পর
> বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর অক্ষর।

কবির উপহাস কোনো অব্যয় সত্য নয়, তবুও এসব কাব্য-ব্যবচ্ছেদী আলোচনায় আসল কবিতাটিকে পাই কি ? কবির সৃষ্টিতে যা' হয়েছিল অখণ্ড অদ্বৈত উজ্জ্বল, অসংবেদী আলোচনায় তাকে করা হল বহুধাবিভক্ত। অঙ্গীকার যেমন মস্ত, তার ভ্রান্তি তার চেয়েও মস্ত কেননা তার ফলে শিল্পের শিল্পত্ব, কবিতার কাব্য, হারিয়ে যায়। একথা সত্য যে বিশ্লেষণী আলোচনায় পাঠকচিত্ত শিক্ষিত হয়, নিয়মবলিষ্ঠ হয়, তার ফলে আমাদের পরবর্তী কাব্য-পাঠ হয় সমৃদ্ধতর কিন্তু যাবতীয় আলোচনার গোড়াতেই একটি অলঙ্ঘ্য সতর্কবাক্য স্মরণ রাখতে হবে যে সৎ কবিতা অখণ্ড। যে-বিশ্লেষক, যে-তথ্যসন্ধানী কবিতার অখণ্ডরূপটিকে বিচ্ছিন্ন বিপর্যস্ত নিরন্বিত করে' স্বকার্যে অগ্রসর হয়েছেন তাঁরই কাজ বস্তুত আত্মঘাতী।

অতএব যদি কোনো পাঠক বলেন যে কবিতাটির ধর্মতত্ত্ব অথবা রাজনৈতিক ধারণা অথবা দার্শনিক প্রতীতি তাঁর অমনঃপূত, তা'হলেও সেটা রসবিচার হবে না, হবে ধর্মতাত্ত্বিক রাজনৈতিক বা দার্শনিক বিচার। পাঠক বলেছেন বটে যে তত্ত্ববিশেষে তিনি অপ্রত্যয়ী তবুও যদি তাঁর সৎ সংবেদনা থেকে থাকে তা'হলে নিজ ব্যবহারিক প্রত্যয় অপ্রত্যয় সত্ত্বেও সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুরাগী হতে বাধা নেই। এ-প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে বলেছি যে মিল্‌টনের ধর্মতত্ত্বে অপ্রত্যয়ী হয়েও আমি "প্যারাডাইজ্‌ লস্‌ট্‌"-এর অনুরাগী। "মিড সামার নাইট্‌স্‌ ড্রীম" উপভোগ করবার জন্য দরকার নেই যে বিশ্বাস করব বুলি বটমের মুণ্ডুটা বাস্তবিকই গাধার মুণ্ডু হয়ে গেল। কোনো আবশ্যকতা নেই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্ভোগের জন্য আমাকে মার্কস্‌বাদী হতে হবে অথবা জেরাল্‌ড্‌ ম্যান্‌লি হপ্‌কিন্‌স-এর কবিতার জন্য রোমান ক্যাথলিক। বস্তুত এমনও আবশ্যকতা নেই যে কবির ব্যবহারিক প্রত্যয় ও তাঁর শিল্পপ্রত্যয় অভিন্ন হবে যেমন হয়েছিল ব্লেইকের বেলায় কিন্তু ইয়েট্‌স্‌-এর বেলায় নয়। আরো দেখা যায় একই কবির কাব্যপ্রত্যয় আজ যেমন আছে

কাল তেমনটি ছিল না। ক্যাথলিক বংশজ ডান্ অ্যাংলিকান হয়ে গিয়েছিলেন, বিপ্লবী ওয়র্ড্স্‌ওয়র্থ রূপান্তরিত হয়েছিলেন রক্ষণশীলে।

আমার বক্তব্য যে কাব্যীভূত প্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক বিশ্বাসে অনেক প্রভেদ—একথাই এ-প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য—এতই প্রভেদ যে এ দুই প্রত্যয় সমার্থক জ্ঞান করা না বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক না রসসম্ভোগের অনুকূল। আমি বলছি না যে এ-দুই প্রত্যয়ে কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই বটে, যেমন ঘনিষ্ঠ গোলাপ ফুলটি আর ফুলগাছটির জমি ও আবহাওয়া। যেহেতু ফুলে আনন্দ পাই, ফুলের শোভায় বিশ্বাসী, সেজন্য এমন অপসিদ্ধান্ত করব না যে গোড়ার জমিও তুল্য আনন্দের কারণ। মূল ও ফল যে এক বস্তু নয় তা' প্রমাণ করার জন্য ন্যায়শাস্ত্র ঘাঁটা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ কোনো ধারণা বা উপাখ্যান আমার প্রত্যয়বলয়ের অধিগম্য না হতে পারে—এমন তো হাজারো ধারণা বা উপাখ্যান ছড়িয়ে আছে চারিদিকে—কিন্তু যে-মুহূর্তে সে-ধারণা সমাহিত হয়ে গেল কোনো কবির শিল্পধ্যানে, পরিগ্রহ করল কাব্যের রূপ আর সে-কবিতায় আমার অখণ্ড রসোপলব্ধি হল—সমস্ত পারম্পর্যটি আমি দেখছি পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে, স্রষ্টার নয়, আর কেন তেমন দেখছি সেকথা এ-প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ দিকে বলেছি—যখন সে-ধারণায় ফুটল কবিতা, আর সে-কবিতায় আমি পেলাম আনন্দ, তখন বিষয়বস্তুর ও তার প্রত্যয়ের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। তখন বিষয়বস্তু আর বিষয়বস্তু নেই আছে শুধু কবিতা। তখন বিষয়বস্তুতে প্রত্যয় অপ্রত্যয় নেই, আছে শুধু কবিতার আনন্দ, কবিতাটির কাব্যত্বে বিশ্বাস। কাব্যে প্রত্যয়ের প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে যদি প্রাক্‌কাব্য বিষয় ও কাব্যীভূত বিষয়ের যে-প্রভেদ আমি উপরে ব্যাখ্যান করেছি সে-প্রভেদ মেনে নেওয়া হয়। তা' মানলে বোঝা যাবে যে আমি সতেরো শতকী ইংরেজ ক্রিশ্চ্যান না হয়েও কি ভাবে "প্যারাডাইজ্ লস্ট্" পাঠে নিরন্তর আনন্দ পাই, ইয়েট্‌স্‌-এর জ্যোতিষ-প্রেততত্ত্বসঙ্কুল ধারণায় আদৌ বিশ্বাসী না হয়েও তাঁর কবিতা যতবার পড়ি ততবারই মুগ্ধ হই। যদি কোনো প্রত্যয়ঘটিত অসঙ্গতি আমাকে পীড়া দিয়ে থাকে তাহলে সে-অসঙ্গতি আমার ব্যবহারিক প্রত্যয়ে, যেখানে কবি ও আমি দুজনেই মামুলি দুনিয়ার মানুষ। কিন্তু যেখানে কবি কাব্যসৃষ্টিশীল ক্রান্তদর্শী আর আমি সৃষ্টিগ্রাহী রসবেত্তা, যেখানে তিনি দৈনন্দিন জগতের

অলক্ষ্য নিগূঢ়ে কল্পজগতে ধ্যানমগ্ন আর আমি সে-ধ্যানজগতের স্পর্শরেখা ছুঁয়েছি মাত্র, সেখানে ব্যবহারিক ধারণার প্রবেশ নিষিদ্ধ, অতএব সেক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রত্যয়ের সঙ্গতি অসঙ্গতির বিচার অনাবশ্যক। লৌকিক প্রত্যয় ও কল্পলোকের প্রত্যয় স্বতন্ত্র বস্তু।

এ-প্রসঙ্গে আমারই অন্যত্র লিখিত একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলে হয়তো বেমানানসই হবে না :

> সার্থক ও পূর্ণ রসসৃষ্টিতে বিষয় ও রূপ ('ফর্ম') প্রভিন্ন থাকে না, বিষয় ও রূপ পরস্পরের অন্তর্নিহিত হয়ে পড়ে। যে-রচনায় বিষয় ও রূপের প্রভেদ প্রকট, সে-রচনা শিল্পের মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি, খানিক দূর এগিয়েছে হয়তো। সৃষ্টির অনির্বচনীয় মুহূর্তের পূর্বলক্ষণ অবধি কবির প্রস্তুতিশীল চিত্তে বিষয় ও রূপ আলাদা থাকতে পারে, তিনি তখন বলতে পারেন আমি অমুক বিষয় নিয়ে লিখব আর অমুক কাব্যরূপ অবলম্বন করব। কিন্তু বিষয় ও কাব্য সমার্থক নয়, রূপ ('ফর্ম') ও কাব্যও সমার্থক নয়, কাব্য বস্তুত বিষয়ের ও রূপের অতীত একটি তৃতীয় সত্তা। ব্রাউনিংয়ের অ্যাব্‌ট্‌ ভোগ্‌লার বড়ো খাঁটি কথা বলেছিলেন that out of three sounds he [the musician] frame, not a fourth sound, but a star। যিনি বুঝতে পারেন নি শিল্পায়িত অভিজ্ঞতা ও সে-অভিজ্ঞার উপাদানে প্রভেদ কতটা মৌল প্রকৃতিগত, তিনি কাব্যের তথা শিল্পের স্বরূপ বুঝতে পারেন নি। কাব্যে পরিণত হবার পূর্বে বিষয়-সংক্রান্ত প্রজ্ঞা বা experience এবং ফর্ম সংক্রান্ত প্রজ্ঞা বা experience এক মহত্তর গভীরতর শক্তির (যাকে ইম্যাজিনেশ্‌ন্‌, সৃষ্টিশক্তি, কল্পনাশক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে) অবোধ্য জারকরসে সিঞ্চিত চূর্ণিত মথিত হয়ে এমন একটি অবিচ্ছিন্ন তৃতীয় সত্তায় পরিবর্তিত হয়ে যায় যাকেই আমরা বলি কবিতা, তা' শুধু বিষয় নয় ফর্মও নয়। সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে-বস্তুটি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় (যেমন প্রেম বা রাজনীতি বা নিসর্গপ্রীতি) অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণ ফর্ম (যেমন সনেট, গান বা মহাকাব্য, অথবা পয়ার ত্রিপদী বা ছড়ার ছন্দ), সৃষ্টির পরে তা' হয়ে গেল কাব্য, আর তাকে ফর্ম বলতে পারিনে বিষয়ও বলতে পারিনে। যা' ছিল প্রেম বা রাজনীতি, যে-প্রেম বা যে-রাজনীতি রামা

শ্যামা যে-কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতাসাধ্য ও অনুভূতিসাধ্য, কবির কল্পনারসে সিঞ্চিত হয়ে, সৃষ্টিকর্মে জারিত হ'য়ে, তা' সাধারণ অভিজ্ঞতা অনুভূতির অতীতে এতই দূরে চলে' গেল যে তাকে আর প্রেম বা রাজনীতি বলা চলেনা, শিল্পায়িত কাব্যীভূত প্রেম বা রাজনীতি বললে বরং কিছুটা যথার্থ হয়। প্রাক্‌কাব্য বিষয় ও কাব্যোত্তর বিষয়, এ-দুইয়ে ততই প্রভেদ যতটা ফুলের বীজে ও ফুলটিতে।

ইদানীংকার যে-কোনো সদ্বিবেকী সাহিত্যিক বা সমালোচক কাব্যপ্রত্যয়ের স্বরূপ চিন্তায় কবি-সমালোচক এলিয়টের রচনায় অবশ্যই পৌঁছবেন। এ-প্রসঙ্গে এলিয়টের কয়েকটি প্রধান মন্তব্য নিচে তুলে দিচ্ছি :

I deny that the reader must share the beliefs of the poet in order to enjov the poetry fully.

(আমি একথা মানিনে যে কাব্য পূর্ণভাবে উপভোগ করতে হ'লে পাঠককে কবির প্রত্যয়গুলিরও অংশ অবশ্যই নিতে হবে।)

You are not called upon to believe what Dante believed.

(দান্তে যা' বিশ্বাস করতেন আপনাকেও তা'ই বিশ্বাস করতে হবে এমন কোন অবশ্যতা নেই।)

If there is 'literature', *if* there is 'poetry', then it must be possible to have full literary or poetic appreciation without sharing the beliefs of the poet.

(যদি সাহিত্য বলে কোনো বস্তু থাকে, কাব্য বলে কোনো বস্তু থাকে, তাহলে কবির প্রত্যয়গুলির অংশীদার না হয়েও সাহিত্যিক রসসম্ভোগ নিশ্চয় সম্ভব।)

If you can read poetry as poetry, you will 'believe' in Dante's theology exactly as you believe in the physical reality of his journey ; that is, you suspend both belief and disbelief.

(যদি কাব্য হিসাবে কবিতা পড়ার পটুতা আপনার থেকে থাকে তাহলে আপনি দান্তের ধর্মতত্ত্বে সে-পরিমাণেই বিশ্বাস রাখবেন

যে-পরিমাণে বিশ্বাস হবে যে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত স্থূল বাস্তব কাহিনী বটে, অর্থাৎ, আপনার বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুই-ই ক্ষণনিরুদ্ধ থাকবে।)

There is a difference between philosophical *belief* and poetic *assent.*

(দার্শনিক প্রত্যয় ও কাব্যিক সম্মতি, এ-দুইয়ে প্রভেদ বিদ্যমান।)

We can make a distinction between what Dante believed as a poet and what he believed as a man.

(দান্তে কবিস্বরূপে যা' বিশ্বাস করতেন আর সাধারণ মানুষ স্বরূপে যা' বিশ্বাস করতেন, সে-দুইয়ের মধ্যে আমরা তারতম্য করতে পারি।

উদ্ধৃত উক্তিগুলির চতুর্থটির সঙ্গে তুলনীয় কোল্‌রিজ-এর বিখ্যাত উক্তি **that** willing suspension of disbelief which constitutes poetic **faith** (অবিশ্বাস স্বেচ্ছায় ক্ষণ-নিরুদ্ধ হলেই কাব্যপ্রত্যয় গড়ে' ওঠে), আর তা' ছাড়া এলিয়টের মতামত মোটের উপরে—তিনি নিজেই সে কথা বলেছেন —আইভর্‌ রিচার্ড্‌স্‌-এর চিন্তার অনুকম্পায়ী। কখনো কখনো আমার মনে হয় এলিয়ট যে কথা বলেছেন আমিও বুঝি বা হুবহু সেকথাই বলছি কিন্তু সুতর্কতর দৃষ্টিতে বুঝতে পারি যে এলিয়টের বক্তব্যের চেয়ে আমার বক্তব্য বেশ খানিকদূর অগ্রসর আর সেজন্য প্রত্যয়সমস্যার সমাধানের নিকটতর। এলিয়ট বলেছেন বটে যে তাত্ত্বিক প্রত্যয় ও কাব্যিক সম্মতি আলাদা বস্তু, কিন্তু তিনি সে-প্রত্যয় ও সে-সম্মতির সম্পর্ক বিচার করেন নি। তিনি বলেছেন আমরা কবির প্রত্যয়ের অংশীদার হতে পারি, না-ও হতে পারি, অংশীদার হবার কোনো অবশ্যতা নেই। আমার সিদ্ধান্ত যে এক হিসাবে অবশ্যতা আছে। দান্তের কাব্য যখন পড়ি তখন তাঁর সাধারণ মানুষিক প্রত্যয়ে আমার প্রয়োজন নেই কিন্তু তাঁর কাব্যিক প্রত্যয়ে আমার নির্দ্বিধ প্রত্যয় থাকা একান্ত প্রয়োজন, যে-কাব্যিক প্রত্যয় হয়তো কবির ও আমার ব্যবহারিক প্রত্যয়ের সঙ্গে সুসঙ্গত অথবা হয়তো নয়। কবির সৃজনী কল্পনা তখন তাঁকে নিয়ে গেছে তাঁর ব্যবহারিক প্রত্যয়ের ও ধ্যানধারণার ওপারে কল্পজগতে, তিনি তখন অমুক চন্দ্র তমুক নন, তিনি তখন কবি, স্রষ্টা। আমিও (অর্থাৎ সহৃদয় পাঠক ও) তাঁর রচিত কল্পজগতে প্রবেশ করেছি। সৃষ্টিকার্যের পরে অবশ্য কবি ফিরে আসছেন তাঁর সচরাচরিক ব্যবহারিক

প্রত্যয়ে, পাঠকও তেমনটি আসছেন। যদি কাব্যিক প্রত্যয় আমি গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে থাকি, তা হলে কবির কাব্যসৃষ্টিই আমি গ্রহণ করতে পারি নি। অতএব আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সে কাব্য অসার্থক। কবিতাটি তখন আর কাব্য নয় বাণীশিল্প নয়, যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য বাচনিক প্রকাশ মাত্র। আমার পাটোয়ারি বুদ্ধি ও প্রত্যয় আমার কাব্যসম্ভোগে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। পক্ষান্তরে কবি নিজেও হয়তো তাঁর ব্যবহারিক চিন্তাক্ষেত্রেই আটকে গেছেন, তাঁর ভাবনা পৌঁছয়নি সৃষ্টিশীল শক্তির এলাকায়। প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে ব্যবধান মানে কাব্যের অসার্থকতা—হয়তো কবির অক্ষমতা নয়তো পাঠকের অসংবেদনা। সার্থক কাব্যরসে কোনো প্রত্যয়-অসঙ্গতি থাকা অসম্ভব একথা বুঝতে না পারার দরুন এলিয়টের মত পুরোপুরি গ্রাহ্য নয়।

(৪)

উপরের অনুবন্ধ থেকে দু'টি তর্ক উঠতে পারে। (এক) পাঠক যে কাব্যসৃষ্টি সম্যক গ্রহণ করতে পারেন নি, সেজন্য কি সিদ্ধান্ত করব যে কবিতাটি অসার্থক হয়ে গেল? কবিতার কি নিজস্ব কোনো নিরিখ নেই? কাব্যের মূল্য কি যাচাই করতে হবে প্রতি পাঠকের রসগ্রহণ শক্তি দিয়ে না কোনো চিরন্তন স্বাধীন মানদণ্ড দিয়ে? (দুই) বাচনিক রূপের প্রসঙ্গ। কোনো ধারণা যখন কাব্যীভূত হয় তখন সে-ধারণা পেয়েছে বাচনিক রূপ। অপরপক্ষে, কাব্যীভূত হবার পূর্বে ধারণাটি যখন মাত্র ব্যবহারিক ধারণাই ছিল, তখনও তো তার রূপ ছিল বাচনিক। তা হলে দুই বাচনিক রূপে মস্ত প্রভেদ কোথায়?

তর্ক দুটির আলাদা আলাদা বিচার করা যাক।

প্রথম তর্ক। কাব্যের মূল্যায়নে চিরন্তন মানদণ্ড কিছু আছেই (সে-মানদণ্ডের স্বীকৃতিতে আরিস্টট্ল থেকে মারিতঁ্যা অবধি সব সাহিত্যশাস্ত্রীর আলোচনার ঐক্য সূত্র) কিন্তু প্রতি পাঠকের রসবোধ আদৌ অবজ্ঞেয় নয়। কবিতার সার্থকতা লক্ষ পাঠকের লক্ষ স্বতন্ত্র রসাস্বাদে, আবার কোনো না কোনো চিরন্তন আদর্শের পরিপূরণেও তার সার্থকতা। প্রত্যেক পাঠক কবিতার সম্মুখীন হন নিজ বিশিষ্ট সংবেদনা ও মনোভাব নিয়ে, প্রত্যেক কবিতা পাঠে কাব্যের পুনর্বিকাশ। যত নূতন পাঠক কবিতাটি পড়ছেন তত

সংখ্যক বিকাশ কবিতার। একই পাঠক যদি পুনঃপুনঃ কবিতাটি পড়েন তা' হ'লেও কবিতার পুনঃপৌনিক বিকাশ। এই আশ্চর্য পুনর্ভব শক্তি শিল্পের অনন্য মাহাত্ম্য আর সার্থক কাব্যে এই নিয়ত-নবত্বের প্রমাণ অসংখ্য স্বতন্ত্র পাঠকের রসসম্ভোগে। সুতরাং একটি পাঠকের বেলায়ও রসাস্বাদের ব্যাঘাত ঘটলে কাব্যের পুনর্ভব শক্তি রুদ্ধ ও অস্ফুট হয়ে পড়ে, অর্থাৎ কবিতাটি অন্তত সে-মুহূর্তের জন্য কাব্য হতে পারল না। রসাস্বাদের এই ব্যাঘাতের মূল কোথায়, পাঠকের অসংবেদী চিত্তে না কবিতার কোনো অসম্পূর্ণতায়, সে আবার অন্য এক প্রশ্ন, Obscurity in Poetry, কাব্যে দুরূহতা অথবা অস্পষ্টতার প্রশ্ন, যে-প্রশ্নের উত্তর বিস্তৃত প্রবন্ধের অপেক্ষার্থী। আপাতত কোনো সৎ সমালোচক ভুলতে পারেন না যে কাব্যের মূল্যায়ন একদিকে যেমন ক্লাসিকপন্থী হবে, অর্থাৎ চিরন্তন মান-সাপেক্ষ হবে, অন্যদিকে তেমনই রোমান্টিকপন্থী হবে, অর্থাৎ প্রতিটি স্বতন্ত্র পাঠকের ব্যক্তিসত্তায় কাব্যের অভিসংঘাত কোন্ রূপ পরিগ্রহণ করল অথবা আদৌ করল না সে-কথারও বিচার করবে। ব্যক্তির রুচি তুচ্ছ নয়। সাহিত্যের বিচারে নিরন্তর প্রয়াস হবে কী করে' ক্ষণিকের মানদণ্ড ও শাশ্বতের মানদণ্ড এ-দু'য়ের ব্যবধান মিলিয়ে অথবা প্রায় মিলিয়ে ফেলা যায়।

এ-তর্কে আরো প্রশ্ন ওঠে, চিরন্তন আদর্শ কী অথবা কী কী? এ-প্রশ্নের উত্তরও ভিন্ন প্রবন্ধের বিষয়, তবুও এ স্থলে বলা প্রয়োজন (যে-কথা পূর্বেই বলেছি) যে চিরন্তন বলতে নিরবধি কাল বুঝব না, বুঝব ঐতিহাসিক বিবর্তনে অন্বিত বিশ ত্রিশ শতাব্দী মাত্র, যে-কালে পূর্বতন যুগের ঐতিহ্য-চেতনা পরবর্তী যুগের চিন্তায় এষণায় কর্মে প্রভাব বিস্তার করে। চিরন্তনের এই সংজ্ঞায় পড়ে না ক্রোমাগনন্ অথবা নিয়নডারথাল্ মানুষের কাল—পড়তে বাধা নেই কিন্তু সে-কাল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বড়ই স্বল্প—কিন্তু মিশরীয় আসীরিয় গ্রীক চৈনিক ভারতীয় সভ্যতার দিন থেকে আজ অবধি সমগ্র মানবজাতির চিন্তায় ও ক্রিয়াকর্মে অসংখ্য ব্যবধান ও বিরোধ থাকা সত্ত্বেও এমন কিছু মূল্য পাওয়া যায় যাকে জীবনানন্দ বলেছেন "স্মরণীয় উত্তরাধিকার"। এই ইতিহাস-সীমিত স্মরণীয় উত্তরাধিকার প্রায় আড়াই হাজার বছরের। ইলিয়ড্ আর ঈনিড্, কঠোপনিষৎ আর বুক অব্ ইক্লিজিয়াস্‌টেস্, ডিভাইন্ কমেডি আর শাহ্‌নামা, শকুন্তলা ও কিং লীয়র্,

ফাউস্ট্ ও অ্যানা কারেনিনা নিজ নিজ প্রকাশকালে তখনকার পাঠকের চিত্তে জাগিয়েছিল উদ্বেল অনুরণন। প্রশিক্ষিত রুচিবান পাঠক আজও সে সব মহৎ সাহিত্যসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত। যদিচ আইভর্ রিচার্ড্‌স্ "Permanence as a criterion" (চিরন্তনতার মানদণ্ড) সম্বন্ধে অবিশ্বাসী এবং মনে করেন যে "ডিভাইন্ কমেডি" নেহাৎই কতকগুলি বিস্মৃতপ্রায় ধারণার ভাণ্ডারমাত্র, তবুও বহু পুরুষপর্যায়ের রুচিবান পাঠক স্বীকার করেছেন (সে-স্বীকার নেহাৎই critical timidityর, সমালোচনিক ভীরুতার পরিচায়ক, রিচার্ড্‌সের এমন ধারণা ধৃষ্ট পণ্ডিতম্মন্যতা বৈ আর কিছু নয়) যে এসব সাহিত্যসৃষ্টি মানবের রসনির্মাণ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সে-নিদর্শনে আমরা চিরন্তন আদর্শের ধারণা পাই। সন্দেহ নেই যে এ-উত্তরাধিকারেও মূল্যায়নভেদ হয় কালে কালে, নিরিখ বদলায়, ইলিয়ড্ কেন মহৎ সে-ধারণা বদলায় কিন্তু ইলিয়ড্ যে মহৎ সে-ধারণা বদলায় না।

দ্বিতীয় তর্ক। ভাষা মানুষের অতি অভ্যস্ত সম্পদ, এত অভ্যস্ত যে সচরাচর আমাদের হুঁশ থাকে না যে আমরা ভাষার অধিকারী। সেজন্যই একথাও বুঝতে পারিনে কী করে' ভাষার মতো অত্যন্ত মামুলি বস্তু আবার শিল্পের অন্যতম মাধ্যম। কবিতা যে শিল্প—বাক্‌শিল্প—কবিতার অঙ্গ ও উপাদান যে আমাদের নিত্য অভ্যস্ত ভাষায়, একথা মাঝে মাঝে যেন নতুন করে' আবিষ্কার করি আর তখনই বুঝি যে যাবতীয় বাচনিক অভিব্যক্তি সম-স্তরীয় নয়, লক্ষ লক্ষ বাচনিক অভিব্যক্তি দৈনন্দিন ভাষা-প্রয়োগের সৃজনেতর স্থূল রূপহীন স্তরেই থেকে যায় অথচ কচিৎ দুয়েকটি বাচনিক অভিব্যক্তি শিল্পরূপ পরিগ্রহণ করে কোনো অনির্দেশ্য কল্পনাশক্তির অবিশ্লেষণীয় আশীর্বাদে!

কয়েকটি কাব্যোদ্ধৃতি এবং তাদের সাধারণ গদ্যার্থ লক্ষ্য করা যাক:

(১) তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্র-রবে।
(—রাত্রি ভোর হলেই তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে।)

(২) The multitudinous seas incarnadine.
(—The many seas turned red.)

(৩) রোমাঞ্চিত মাঠে মাঠে
ফেটে পড়ে আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল।
পুলকিত অরণ্যের
মন্ত্রমুগ্ধ নীলাক্রান্ত পাখি
নিরুদ্দিষ্ট শূন্যে মেলে পাখা।

(—নতুন শস্যের মাঠে মাঠে এলো আশ্বিনের চমৎকার সকাল। নীলপাখি বন থেকে বেরিয়ে যেন কোন্ নেশায় উড়লো আকাশে।)

(৪) দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যা—
নশ্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

—শ্বেতাশ্বতর, ৪।৬

(—দুটি পাখি, তারা সমস্বভাবসম্পন্ন এবং সব সময় একত্রবাসী, একই বৃক্ষকাণ্ডে আলিঙ্গিত হয়ে আছে। একটি পাখি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করছে, অথচ অন্য পাখিটি নিজে না খেয়ে সাক্ষীরূপে সঙ্গীর ভক্ষণ লক্ষ্য করছে।)

প্রতি উদ্ধৃতির জুড়ি দুটিতে বক্তব্য নির্যাস একই কিন্তু প্রথম বাক্‌সমাবেশ কাব্যগুণসম্পন্ন, দ্বিতীয়টি নয়, প্রথমটিতে কল্পনাশক্তির ও ভাষা প্রয়োগের সে-আশীর্বাদ উদ্ভাসিত যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। কাব্যভাষা ও আটপৌরে ভাষার তারতম্য সূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে অলঙ্কার শাস্ত্রে। এক পক্ষে মুখ্য অর্থ বা বাচ্যার্থ, অপর পক্ষে ব্যঙ্গার্থ বা ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জিত ধ্বনির আলোকে বাচ্যার্থ রূপায়িত হয় কবিতায়, সেজন্য ব্যঞ্জনা বা ধ্বনির নানাবিধ শ্রেণীবিশ্লেষণে আনন্দ পেতেন ভারতীয় রসবেত্তা আর অনুরূপ কারণে ইওরোপীয় রেটরিক্‌বিৎ বাক্যালঙ্কারের রকমফের বিচারে ব্যস্ত থাকতেন। কাব্যের প্রধান এবং অন্তরঙ্গতম কাজ যে অনুভূতির উদ্ভাবনা এবং ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তিতেই যে আবেগ সঞ্চার সম্ভব সে-ধারণা অবশ্য প্রাচীনকাল থেকেই সুবিজ্ঞাত আর বিশেষত উনিশ শতকী রোমান্টিক ভাবধারার সঙ্গে নিবিড়-লিপ্ত, তবে এযুগের সাহিত্যশাস্ত্রী মনে করেন যে

কাব্যভাষা অলঙ্কৃত বাক্যের চেয়ে অনেক মহৎ, কাব্যভাষায় কবির বাক্‌শিল্প-প্রতিভা প্রকাশিত হয় বাক্‌প্রতিমা ও প্রতীকপ্রয়োগের মাধ্যমে। কাব্যে আমরা তথ্যলাভ করিনে (যদি করি সেটা ফাউ, কাব্যের স্বধর্মোৎসারিত ফল নয়), কাব্যে যে-জ্ঞানলাভ করি সে-জ্ঞান সংসারী বুদ্ধির অথবা ধীশক্তির আবেদন নয়, সে-জ্ঞান অনুভূতির জ্ঞান, এষণার প্রবৃদ্ধি। যে-মুহূর্তে আমরা কাব্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রটির কথা ভুলে যাই, ভুলে যাই যে কাব্যোৎপন্ন জ্ঞান অনুভূতি-আবেগ-এষণার জ্ঞান, পাটোয়ারি বুদ্ধির অথবা ধীশক্তির জ্ঞান নয়, সে-মুহূর্তেই কাব্যপ্রত্যয়ের ব্যাঘাত ঘটে কেননা তখন আমরা কাব্যের বিচার করতে যাই ব্যবহারিক প্রত্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। তখন তর্ক করব Beauty is truth, truth beauty একথা তো আমার সংসারী প্রত্যয়ের বলয়চক্রে আসছে না, এ কোন্ ধরনের কথা হল ? সে-বিতর্কের আঁধিতে কবিতার প্রাণকেন্দ্র দৃষ্টিবহির্ভূত হয়ে যাবে। কবিতা আর কবিতা থাকবে না, যে-কোনো সাধারণ বাক্যবন্ধের সমগোত্রীয় হবে।

(৫)

কাব্যোৎপন্ন অনুভূতির কথাটা আরেকটু বিশদ করা দরকার। কাব্যের অনুভূতি ও সচরাচরিক অনুভূতিতে তারতম্য না করলে কাব্যের শিল্পরূপ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে না। আমার আশঙ্কা হয় যে এ-প্রবন্ধের তৃতীয় অনুবন্ধে যে দুই প্রকার প্রত্যয়ের তারতম্য বিচার করেছি, এখন যদি আবার প্রস্তাব করি যে অনুভূতিও দুই প্রকার, তাহলে সম্ভবত আমার আলোচনা অতিসূক্ষ্মতার অভিযোগে লাঞ্ছিত হবে। যতদূর জানি কোনো সাহিত্য-শাস্ত্রী এ যাবৎ কাব্যপ্রত্যয়ের প্রকারভেদ করেন নি, অনুভূতিরও নয় (প্রত্যয়ের ও অনুভূতির যে প্রকারভেদ-সম্বন্ধীয় ধারণার প্রস্তাব আমি এ-প্রবন্ধে করছি) কিন্তু প্রকারভেদ ছাড়া আমাদের কাব্যসম্বন্ধীয় চিন্তা কী ভাবে পরিচ্ছন্ন ও সঙ্গত হতে পারে তা ভেবে পাইনে। দু'প্রকার প্রত্যয়ের সপক্ষে যুক্তি পেশ করেছি এ-প্রবন্ধের তৃতীয় অনুবন্ধে। এখন বলা প্রয়োজন যে অনুভূতিও দু'রকমের—লৌকিক অনুভূতি ও শৈল্পিক অনুভূতি। শিল্পের অনুভূতি-আবেগ-এষণা লৌকিক অনুভূতির সমগোত্রীয় বটে কিন্তু সম-স্তরীয় নয়। এ-দু'য়ে ব্যবধান যেন কাঁচা লোহায় ও পান-দেওয়া

ইস্পাতে ব্যবধান। একক্ষেত্রে অনুভূতির অ-সংস্কৃত ব্যবহারিক রূপ, অপরক্ষেত্রে শুদ্ধীভূত রূপ।

কিন্তু শুদ্ধি হয় কী ভাবে?

ইতিপূর্বে বলেছি যে কাব্যের আবেগসঞ্চারী শক্তির ধারণা সাহিত্যশাস্ত্রের পুরাতন কথা, কিন্তু সে ধারণা যেন নতুন গতিঝোঁক লাভ করল ওয়র্ডস্বোয়র্থের উক্তিতে: Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings—প্রবল স্বতোচ্ছল অনুভূতি-ই কাব্য। দুর্ভাগ্যবশত এ-উক্তির অসম্যক তাৎপর্যের ফলে অনেকেই বুঝলেন যে একগাদা আবেগের ছল্‌কানিতেই কাব্যের স্বধর্ম পালিত হয়। পক্ষান্তরে যাঁরা ব্যক্তিক অনুভূতির উচ্ছলতায় অতৃপ্ত তাঁরা মনে করলেন ওয়র্ডস্বোয়র্থের শক্ত পাল্টা জবাব মিলেছে এলিয়টে: Poetry is not a turning loose of emotion, it is an escape from emotion—ঢিলে-দেওয়া আবেগের অবাধ স্ফূর্তিতে কাব্য নয়, বরং আবেগ থেকে অব্যাহতিতেই কাব্য। আমার মনে হয় যে বস্তুত ওয়র্ডস্বোয়র্থের ধারণায় ও এলিয়টের ধারণায় কোনো মৌলিক বৈষম্য নেই। ওয়র্ডস্বোয়র্থের উক্তি যদি তাঁর চরম কাব্যতত্ত্ব বলে' মানি তাহলে তাঁর প্রতি দুরপনেয় অবিচার করা হবে কেননা তাঁর বর্ণিত স্বতোৎসারিত অনুভূতি কখনই ফেনায়িত বাক্‌স্ফীত স্বল্পসার অনুভূতি নয়, এ-অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর অন্য উক্তিও অবিস্মরণীয়: Emotion recollected in tranquillity— আত্মস্থ প্রশান্তভাবে স্মরণ-হওয়া অনুভূতি। ওয়র্ডস্বোয়র্থের tranquillity কথাটি সুপ্রযুক্ত নয়, যে-মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাবার পরে অনুভূতি উন্নীত হয় কাব্যবস্তুতে, সে-পরিবর্তনের সঠিক তাৎপর্য পাওয়া যায় না এ-কথাটিতে। দার্শনিক পরিভাষার সঙ্গে ওয়র্ডস্বোয়র্থের সম্যক পরিচয় ছিল না, তাঁর চিন্তাও ছিল না ন্যায়শাস্ত্রসম্মত তবুও তাঁর ধারণাগুলি মূলত সৎ। অনুভূতিই কাব্য অথচ সে-অনুভূতি আত্মস্থ স্মৃতিতে সঞ্চারিত—এ কথায় ওয়র্ডস্বোয়র্থ বুঝেছিলেন কাঁচা অনুভূতি নয়, পাকা অনুভূতির পবিত্রতা (এহেন বিশেষণ যদি পাঠক বরদাস্ত করতে পারেন)। অ-সংস্কৃত আবেগ ও শুদ্ধীকৃত আবেগে তারতম্য বিদ্যমান আর সে-তারতম্যই এলিয়ট জ্ঞাপন করেছেন process of depersonalization (নিজত্ব চেতনার বিলোপ)-এর ব্যাখ্যায়। আমার বিবেচনায় ওয়র্ডস্বোয়র্থ tranquillity বলতে যা বুঝেছিলেন, এলিয়ট মূলত

তা-ই বুঝেছেন যখন তিনি বলেছেন যে the progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality (শিল্পীর অভিব্যক্তি নিরন্তর আত্মবলিতে, নিজত্বচেতনার নিরন্তর অপসরণে)। কবির প্রাক্‌সৃষ্টি আবেগ নিজত্ববোধসম্পন্ন—যে আবেগে তিনি উদ্বেলিত সে-আবেগ একান্ত তাঁরই, তাঁর ব্যক্তিত্বের বাইরে তার কোনো স্থান নেই—আর যতক্ষণ সে-আবেগ এককেন্দ্রিক থাকে ততক্ষণ যেন সে গ্লাশভরা ঘোলাজল। যখন ঘোলাজল থিতিয়ে পরিষ্কার জল উপরে ওঠে, যখন শিল্পীচিত্তে সৃজনীপ্রক্রিয়া আবর্তিত হতে থাকে, তখন সে-আবেগের নিজত্ববোধ ক্রমশঃ অপসৃত হতে থাকে (আর এ-নিজত্ববোধ নিতান্তই সঙ্কীর্ণ স্থানকাল-পাত্র সাপেক্ষ, নেহাৎই ভঙ্গুর), সৃষ্টিশীল চিত্তমন্থনের ফলে শিল্পীর ব্যবহারিক অনুভূতি রূপান্বিত হয় শুদ্ধীভূত শৈল্পিক অনুভূতিতে। সার্থক কাব্যে হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি যেসব অনুভূতি পাই সেগুলি ও ব্যবহারিক হর্ষ বিষাদ সমার্থক নয়। কবির লৌকিক প্রত্যয়ে যেমন, তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিতেও তেমনি সাধারণ জগতের কোনো কৌতূহল নেই, কবির শৈল্পিক প্রত্যয়ে ও তাঁর শুদ্ধীভূত অনুভূতিতে যে নিজত্ববোধরহিত মানবিক প্রত্যয় ও অনুভূতি সমুদ্ভাসিত তাতেই জগতের অনিমেষ কৌতূহল। আবেগ শুদ্ধীকরণের এই প্রক্রিয়া বোঝাবার জন্যই আরিস্‌টট্‌ল্‌ "কাথারসিস্" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

(৬)

এ-প্রবন্ধের গোড়াতে বলেছি যে প্রত্যয়সমস্যা পাঠকের সমস্যা। পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা আরেকটি কথা না বললে এ-প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকবে! এতক্ষণ সযুক্তি আলোচনা করেছি যে কাব্যের প্রত্যয় ব্যবহারিক প্রত্যয় নয় কিন্তু সে-প্রত্যয়ের শুদ্ধ বিকসিত রূপ, অর্থাৎ কাব্যের অনুভূতি সংসারী অনুভূতির সংস্কৃত প্রকাশ। এ-আলোচনা থেকে এমন সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক যে যদিচ শিল্প ও লৌকিক জীবন এক নয় তবুও লৌকিক জীবনেই শিল্পের অচ্ছেদ্য মূল। যিনি কাব্যের সৎ পাঠক তাঁর সংসারী প্রত্যয় ও অনুভূতি অবশ্যই ক্রমশ বিশুদ্ধতর হয়, তাঁর মানবিক সত্তা পূর্ণতর হয়, শিল্পজীবন ও লৌকিক জীবনের সমন্বয়ে তাঁর জীবনবোধ হয় মহত্তর।

কাব্যের প্রত্যয় ও অনুভূতি যদি পাঠকের নিত্য নৈমিত্তিক লৌকিক প্রত্যয় ও অনুভূতিগুলিকে সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ করতে পারে তাহলে সে-কাব্য কাব্যের চেয়েও বড়ো হবে কেননা সে-কাব্য শুধু কাব্য নয় তাকে বলব জীবনবেদ আর কাব্য তো জীবনের চেয়ে বড়ো নয়। কোটি কোটি নরনারী কাব্যে যে-আনন্দ পেয়েছে সে-আনন্দ হয়েছে তাদের প্রশস্ত জীবনবোধের সহায়ক। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় "শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি" আমাদের সহনীয় হয় এমন কি সে-জীবনযাত্রায় আমরা পেতে পারি মহৎ মানবিক সম্বোধি যদি কাব্যপ্রত্যয়ে আমরা সাহায্য পাই, অর্থাৎ কাব্যপ্রত্যয়ে ও কাব্যানুভূতিতে অভ্যস্ত হয়ে আমাদের সচরাচরিক প্রত্যয় ও অনুভূতি বিশুদ্ধ হয়। কাব্যপাঠে এ-উন্নয়ন সম্ভব বলেই ম্যাথিউ আর্নল্ড ও তাঁর পরবর্তী কেউ কেউ বলেছেন যে সমাজজীবনে ধর্মের যে উন্নয়নী কর্তব্য সে-কর্তব্য এযুগে বর্তেছে কাব্যে। এযুগে কাব্যপ্রত্যয়ের প্রশ্ন প্রবল হয়েছে তার কারণ মানুষের জীবনপ্রত্যয়ই এখন বিস্রস্ত।

আজ এই পৃথিবীর অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস
কেবলি শিথিল হয়ে যায়।

সে-শিথিল বিশ্বাস বলিষ্ঠ হতে পারে সৎ কাব্যের প্রত্যয় ও আবেগসঞ্চার ক্ষমতায় আর কাব্য সৎ হ'তে হ'লে কবিকেও হ'তে হবে সৎ, কবির শুদ্ধ প্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক প্রত্যয়ে থাকবে না কোনো দুস্তর ব্যবধান। তেমন সৎ কাব্যের উদাহরণ আমি পাই আমার প্রিয় কবির রচনায়। সে-কাব্যে কবির ব্যক্তিক বিশ্বাস ও শৈল্পিক প্রত্যয়, পাঠকের সংসারী বিশ্বাস ও কাব্য-প্রত্যয়, কবির ও পাঠকের অনুভূতি, সমস্তই নির্ব্যবধান ও একাত্ম। এ যুগের "কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ, অন্ধকার, সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম", যে কালে খণ্ডিত বাংলায় ও উদ্‌ভ্রান্ত পৃথিবীতে "রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়", যে-পৃথিবীতে "ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়", সেই শকুন্তক্রান্তির যুগে কবির প্রত্যয়বচনে আমি শুনতে পাই পরম কাব্য আবার কাব্যের চেয়েও মহত্তর উক্তি কেননা সে-কাব্য আসলে অনির্বাণ জীবনবোধের উদ্‌গীথ তান, সে-কাব্যে শিল্পপ্রত্যয় ও জীবনপ্রত্যয় সমার্থ:

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা-নবীনতা-শুভ্র মানবিকতার ভোর ?
নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?
অন্ধকারে ইতিহাস পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই ;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।
হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে ;
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন ?
নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাটবসন্তের তরে !
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ণ হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।

কাব্যে পাঠান্তর

(১)

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে একদা এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে শেক্‌স্‌পিয়র-গ্রন্থাবলীর পাঠভেদ-সমস্যা সম্বন্ধে জনৈক বিদ্বান আলোচনা শুরু করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে যদিও আঠারো শতকে অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিত শেক্‌স্‌পিয়র-গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা করেছিলেন ও তদুপলক্ষে নিজ নিজ বিচারসংগত পাঠ নির্ণয় করেছিলেন, যদিও উনিশ শতকে ক্লার্ক ও অল্‌ডিস্‌ রাইট্‌ নামক দুই পণ্ডিতের সম্পাদনায় যে কেম্ব্রিজ শেক্‌স্‌পিয়র-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল—দীর্ঘকাল জনসাধারণের ধারণা ছিল যে এই গ্রন্থাবলীই প্রমাণসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য শুদ্ধ পাঠের আকর—তবুও বর্তমান শতকে নানা কারণে শেক্‌স্‌পিয়রের পাঠনির্ণয়ের সমস্যা আবার সজাগ হয়েছে, অনেক নূতন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত পাঠ আবার যাচাই করা হচ্ছে। এবং বক্তা আরও বলেছিলেন যে এই পাঠনির্ণয়ের বন্ধুর পথেই শিক্ষিত শেক্‌স্‌পিয়র-ভক্তের চলা উচিত।—এ অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন ছাত্র, বিদ্বান বক্তারা কেউ কেউ আমার শিক্ষক। আমার স্মরণ আছে যে পাঠান্তর-সমস্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হওয়ার পরে জনৈক খ্যাতিমান অধ্যাপক বললেন, শেক্‌স্‌পিয়রের মৃত্যুকাল থেকে আজ অবধি তিনশো' বছরের অধিককাল কেটে গেছে, এই সময়ের মধ্যে পাঠনির্ণয় সম্বন্ধে তো অনেকই বাক্যব্যয় হয়ে গেছে, এখন পণ্ডিতেরা ক্ষান্ত হোন, তাঁদের মোহধ্বান্তনাশন পণ্ডিতী থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা শেক্‌স্‌পিয়রের গ্রন্থাবলী পাঠ করব নিছক আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে, কয়েকটি শব্দের ও ছত্রের অস্পষ্টতা নিয়ে আমরা কাব্যসুখস্পৃহা নিষ্পেষিত করব না।

এই সামান্য বিস্মৃত ঘটনার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়টির ইশারা সেদিনকার দ্বিধাবিভক্ত চিন্তায় নিহিত। কাব্য যেহেতু শিল্প আর আনন্দই যেহেতু শিল্পের পরম দান, সুতরাং পাঠনির্ণয় কখনোই শিল্পালোচনা নয়, উপভোগের সহায়ক নয়, বরঞ্চ প্রত্নতত্ত্বের সগোত্র হতে পারে—এ ধরনের যুক্তির পরিণামে রসসন্ধানী শিল্পভোগধর্মী সমালোচক মনে করলেন পাঠসন্ধানী সমালোচকের তুলনায়

তিনি মহত্তর জীব। সাহিত্যসৌধের নিরালোক নিচুতলার কুঠরীতে বাস করেন শুষ্কচিত্ত পুঁথিঘাঁটা পণ্ডিত, নেহাৎই সাহিত্য-ব্যাকরণবিৎ, অথচ সে সৌধের উপরতলায়, অনেক উপরতলায়, বাস করেন আকাশ-প্রতিবেশী নিয়ত কাব্য-রস-পায়ী অভিজাত সমালোচক। শিল্পভোগধর্মী সমালোচকের এহেন মনোভঙ্গীর সুন্দর একটি বর্ণনা পাই জনৈক ইংরেজ কবির অন্য প্রসঙ্গে রচিত কয়েকটি ছত্রে :

Dig in thy deep dark prison ;
O miner and finding be thankful.
Though unpolished by thee,
unto thee unseen in perfection,
While thou art eating black bread in the
poisonous air of thy cavern,
Far away glitters the gem on the
peerless neck of a Princess.

ভিক্টরীয় কবি ক্লাফ্-এর কয়েকটি ছত্র। খনির নিচুতলায় কাজ করছে যারা তাদের স্বেদাক্ত কর্মের সার্থকতা কোথায়? অনেক বিষাক্ত বায়ু সেবনের পরে তারা একটি পাথরের টুকরো পায়, সে-পাথরের সংস্কারবিদ্যা তাদের জানা নেই, তারা শুধু অ-সংস্কৃত পাথর খুঁড়ে পেয়েই খালাস, কিন্তু এই পাথরটি যখন কুশলী মণিকারের হাতে রূপান্তরিত হয়ে কোনও তন্বী রাজকন্যার মর্মরসিত কণ্ঠে শোভা পায়, তখন তাদের শ্রম সার্থক। অনেকের ধারণায় রাজকন্যার সঙ্গে তুলনীয় কাব্যরসবিলাসী অভিজাত সমালোচক, খনিকর্মীর সঙ্গে তুলনীয় পুঁথিকর্মী, সম্পাদনকর্মী।

আমাদের এই জাত-মানা দেশে সমালোচকরাও নিচু জাতে ও উঁচু জাতে বিভক্ত হবেন সেটা আশ্চর্য নয় কিন্তু এই ভেদবোধ অলীক, অগ্রাহ্য, আত্মঘাতী। ইওরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচকমাত্রেই আলোচ্য সাহিত্যের পাঠশুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন থেকেছেন। ডক্টর জন্‌সন্ শেক্‌স্‌পিয়র-গ্রন্থাবলী সম্পাদনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সম্পাদকীয় ভূমিকা-প্রবন্ধে পাঠসংস্কার বিষয়ে যে-সব মূলনীতি উপস্থাপিত করেছিলেন সেগুলি আজও টেক্‌স্‌চুয়ল্ ক্রিটিসিজ্‌ম্-এর—পাঠকেন্দ্রিক সমালোচনার—মূলনীতি বলে' স্বীকৃত। অনুরূপ সম্পাদকীয়

অধ্যবসায় ও আত্মশাসন কোল্‌রিজের অসংযমী স্বভাবে সম্ভব ছিল না কিন্তু তবুও শেক্‌স্‌পিয়রের পাঠশুদ্ধি বিষয়ে তাঁর অনেক বিবেচনা সর্বজনশ্রদ্ধার্হ। ব্র্যাড্‌লি, উইলসন্‌ নাইট, ক্লেমেন, এলিয়ট, সকলেই পাঠকেন্দ্রিক সমালোচনার মূল্য অসংকোচে মেনেছেন। (আমি কেবল ইংরেজ সমালোচকদের উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকছি, অনুরূপ উদাহরণ যে ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাসেও মিলবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।) যদি কোনো সমালোচনা-যশঃপ্রার্থী পাঠকেন্দ্রিক আলোচনা সম্বন্ধে উন্নাসিক থেকেও থাকেন, তাঁর সমালোচনা অন্তিম বিচারে স্থায়ী হয় নি কেননা এহেন সমালোচনা আসলে পল্লবগ্রাহী আত্মাশ্রয়ী আপ্তবাক্য মাত্র। সাহিত্য-সমালোচনার কারয়িত্রী দায়িত্ব বিস্মৃত হওয়া সকলের পক্ষেই বিপৎসংকুল। সত্য বটে কারয়িত্রী সমালোচনার পশ্চাতে বিদ্যমান নান্দনিক তত্ত্ব ও নীতি কিন্তু নিছক তত্ত্ব ও নীতি সাহিত্য-সমালোচনার আওতার বাইরে চলে যায়, চলে যায় দর্শনবিদ্যার কোনো কোনো অধ্যায়ে। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞ ও নীতিজ্ঞ হওয়ার পরেও সাহিত্য-সমালোচক কখনো ভুলতে পারেন না যে the play's the thing, the poem's the thing (নাটকটিই আসল জিনিস, কবিতাটিই আসল জিনিস)। কাব্যবিশেষ ও নাটকবিশেষের অনুধ্যান থেকেই তাঁর সমালোচনা উৎসারিত। অতএব মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তাঁকে স্থির জানতে হবে আলোচ্য কবিতা বা নাটকের যে পাঠ তিনি পেয়েছেন তা খাঁটি কি না। নির্ভরযোগ্য পাঠেই যে সংগত সমালোচনার বুনিয়াদ সে কথার স্পষ্টীকরণের জন্য শেক্‌সপিয়রের "পঞ্চম হেন্‌রি" নাটক থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এই নাটকে স্যর জন্‌ ফল্‌স্‌টাফের মৃত্যু বর্ণিত হচ্ছে :

Nay, sure, he's not in hell : he's in Arthur's bosom, if ever man went to Arthur's bosom. A' made a finer end, and went away an it had been any christom child ; a' parted even just between twelve and one, even at the turning o' the tide : for after I saw him fumble with the sheets and play with flowers and smile upon his fingers' end, I knew there was but one way ; for his nose was as sharp as a pen, and a' babbled of green fields.

—*Henry V*, II, iii, Hostess

এই উদ্ধৃতির শেষ বাক্যাংশটি লক্ষ্য করুন, 'his nose was as sharp' ইত্যাদি, বিশেষতঃ 'a' babbled of green fields'। মৃত্যুপথযাত্রী ফল্‌স্‌টাফের হাড়-জিরজিরে শরীরের ছবি পাই একটি যথাযথ উপমায়—তার নাক হয়ে গিয়েছিল কলমের মতো তীক্ষ্ণ। (বিশেষ ক'রে নাকের উল্লেখ কেন? কারণ, বিখ্যাত প্রাচীন বৈদ্য হিপোক্রেটিস মরণোন্মুখ ব্যক্তির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে নাকের তীক্ষ্ণতার কথা বিশেষ করে উল্লিখিত হয়েছে। এ-জাতীয় বর্ণনা মধ্যযুগীয় ইওরোপে এত বহুলপ্রচার লাভ করেছিল যে সাধারণ লোকেও মৃত্যুর বর্ণনায় এ-সব উপমা প্রয়োগ করত যদিও তারা জানত না উপমাগুলি প্রথমে কে বা কারা ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু 'কলম' কেন? অন্য এক বিখ্যাত বৈদ্য গালেন মরণোন্মুখ ব্যক্তির বর্ণনায় একটি শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন যার উচ্চারণসাদৃশ্যে মনে করা যায় যে শব্দটি quill, অর্থাৎ কলম। অতএব উপরের উদ্ধৃতির বর্ণনাকারিণী বলছেন, তার নাক হয়ে গিয়েছিল কলমের মতো তীক্ষ্ণ।) এর পরের বাক্যাংশটি শেক্‌স্‌পিয়র-পাঠশুদ্ধির সর্বোজ্জ্বল উদাহরণ। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ফোলিও সংস্করণে বাক্যাংশটি ছিল, and a table of green fields, যার বিশেষ গ্রহণযোগ্য মানে হয় না। হয়তো অতি ক্লিষ্ট মানে একটা কিছু খাড়া করা যায়, করা গেছেও, এই শতকেও করা গেছে, কিন্তু সেই ক্লিষ্ট মানে এই হৃদয়স্পর্শী বর্ণনার অন্য অংশগুলির সঙ্গে সুসংগত নয়। বেশ কিছুকাল পর্যন্ত পাঠকগণ a table of green fields এই পাঠে অস্বস্তিবোধ করতেন, পাঠটি সহজবোধ্য অথবা আদৌ বোধগম্য মনে হত না, পাঠকের অনুমান হত এই কথাটির আড়ালে কোথায় যেন একটা সুসংগত অভিধা হারিয়ে গেছে। এমন সময় আঠারোশতকী শেক্‌স্‌পিয়র-সম্পাদক টিবল্‌ড্‌ এই পাঠটির সংস্কার করলেন, বললেন a table হবে না, হবে a' babld, অর্থাৎ (আধুনিক বানানে) a' (=he) babbled। শেক্‌স্‌পিয়রের যুগে যে-হস্তলিপি প্রচলিত ছিল তাতে b ও t, d ও e দেখতে প্রায় একই রকমের ছিল, সুতরাং একটু জড়ানো লেখা পুঁথি দেখে ছাপতে গিয়ে মুদ্রাকরের কিঞ্চিৎ প্রমাদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। সংস্কার-কৃত কথাটির মানে চমৎকার মিলে যায় সম্পূর্ণ বাক্যবন্ধটির সঙ্গে, তা' ছাড়া কথাটি নিজগুণেই সুন্দর অর্থবহ কেননা মরণোন্মুখ ব্যক্তি babble করবেন, এলোমেলো বকবেন, এ তো প্রত্যাশিত ব্যাপার! টিবল্‌ড্‌ সহৃদয়

অনুমানে যে বাক্য-পরিবর্তন করেছিলেন, বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-প্রণালীতে দেখা গেছে যে সে অনুমান সত্য।

শেক্‌স্‌পিয়র থেকেই আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি, 'হ্যাম্‌লেট' নাটক থেকে। হ্যাম্‌লেটের একটি বিখ্যাত স্বগতোক্তি শুরু হয়েছে এইভাবে—

O, that this too too solid flesh would melt,
Thaw, and resolve itself into a dew !

যদিও দুয়েকজন সম্পাদক solid কথাটিতে রাজকুমার হ্যাম্‌লেটের মেদবহুল দেহের আভাস পেয়েছেন, তাঁদের হাস্যকর ভাষ্য ছেড়ে দেওয়ার পরে solid কথাটির সুসংগত মানে পাওয়া যায় কি? মানে হবে নিশ্চয় রূপকাশ্রিত মানে, কিন্তু মেদ কোন্ অর্থে কঠিন? দ্বিতীয় ছত্রের dew ও প্রথম ছত্রের solid flesh, এই দুইয়ে বিপরীতার্থ জ্ঞান করলে একটা কঠিন স্থূল শরীরী অস্তিত্ব যেন আলগোছে রূপায়িত হয়ে গেল একটা অনির্দিষ্ট অবয়ব তরলতায়; গ্লানি-লাঞ্ছিত দেহের সীমা ছাড়িয়ে ক্ষুব্ধ মানবাত্মা অসীমের অভিসারী হল —এমন মানে করলে solid কথাটি গ্রাহ্য হতে পারে, তবুও একটু সংশয় থেকে যায়, মেদ কী অর্থে তরলিত হতে পারে? কিন্তু কথাটি যে solid সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত কি? এই পাঠরূপ আমরা পেয়েছি ১৬২৩ সনের ফোলিও সংস্করণে। এই সংস্করণের পূর্বে প্রকাশিত প্রথম কোয়ার্টো সংস্করণে (১৬০৩) পাচ্ছি too much grievd and sallied, দ্বিতীয় কোয়ার্টো সংস্করণে (১৬০৪) পাচ্ছি too too sallied। এ ক্ষেত্রে sallied শব্দটি খুবই সংগত—বিক্ষুব্ধ, লাঞ্ছিত, এই অর্থে। কিন্তু ইদানীংকার কোনো কোনো পুঁথিজ্ঞানী অনুমান করছেন যে ফোলিওতে যে solid শব্দটি আছে ওটি আসলে sulid = sullied, মানে কলঙ্কিত কুরঞ্জিত। (সে যুগের হস্তাক্ষরে u ও o এই দুটি অক্ষরে বিভ্রমাত্মক সাদৃশ্য হতে পারত যেমন আজকাল u ও n, m ও w, এ সব জোড়া অক্ষরে বিভ্রম হতে পারে।) পরের ছত্রের সঙ্গে এই শব্দটির সংগতি পাওয়া যায়—কলঙ্ক-রঞ্জিত মেদ গ'লে তরলিত হোক, অর্থাৎ মেদ = কঠিন বরফ। (শীতপ্রধান দেশে রাস্তায় জমা তুষার পথযাত্রীর পায়ে পায়ে বিশ্রী একটা ম্লান বিকৃত বর্ণ ধারণ করে; গলে' গিয়েই, জলধারায় পরিবর্তিত হ'লে পরেই, তার মুক্তি, তার সুস্থ অস্তিত্ব।) এ মানেও সুন্দর, এখানেও বাক্‌প্রতিমাটি সহজে

সমগ্র পটভূমির সঙ্গে মিলেছে। তিনটি মানেই যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তা' হলে প্রশ্ন হচ্ছে আমি সম্পাদক হিসেবে অথবা সাধারণ পাঠক হিসেবেই কোন্ পাঠটি গ্রহণ করব? কোন্‌টিকে শেক্‌স্‌পিয়রের মূল পাঠ বলে গণ্য করব?—এ প্রশ্ন নিঃসংশয়েই গুরুভার প্রশ্ন, এমন প্রশ্ন যা' কোনো সদ্বিবেকী সম্পাদক অথবা পাঠক এড়াতে পারেন না। এই ছত্র দুইটি নাটকটির অতীব মূল্যবান বাক্‌পুঞ্জের অংশ, এখানে অভিধা অস্পষ্ট থাকলে মূল্যবান অংশটিরও অভিধা অস্পষ্ট থাকবে, ফলে সমগ্র নাটকটি সম্বন্ধে আমাদের সমালোচকীয় সম্বোধ ও উপভোগ ব্যাহত ও অসম্পূর্ণ থাকবে।

অতএব সিদ্ধান্ত যে শিল্পভোগধর্মী সমালোচনা বলে' কোনো স্বয়ন্তর সাহিত্যকৃতি সম্ভব নয়, নিছক কাব্যরসবিলাস অবাস্তব ও অলীক, ভোগধর্মী আলোচনা ও পাঠকেন্দ্রিক আলোচনা নিবিড়ভাবে পরস্পর-সম্পৃক্ত। পাঠকেন্দ্রিক আলোচনায় শুদ্ধ পাঠ যখন নির্ণীত হল, তখন (তার পূর্বে নয়) রসভোগের কাল। পক্ষান্তরে রসবোধ না থাকলে লেখকের চিন্তা ও প্রকাশ-পারম্পর্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যাবে না, আর তা' না হলে শুদ্ধ পাঠনির্ণয়ের মননশক্তিও থাকবে না। শুদ্ধ পাঠনির্ণয়ে যে কতটা সহৃদয় মননশক্তির আবশ্যক সে কথা উপরের শেক্‌স্‌পিয়র-পাঠ দুইটির বিশ্লেষণে নিশ্চয় যথেষ্ট প্রকট হয়েছে।

(২)

শুদ্ধ পাঠনির্ণয় তা' হলে নেহাৎ the dull duty of an editor নয়, (যেমন বলেছিলেন ইংরেজ কবি পোপ, যাঁর নিজ সম্পাদকীয় কৃতিত্ব নিন্দনীয় নয়) সম্পাদকের কর্ম নীরস নয়, এ কর্ম অখণ্ড সমালোচনা-কর্মেরই একটি শাখা।

কিন্তু পাঠান্তর-সমস্যা আদৌ উদ্ভূত হয় কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে নিহিত। যে পাঠ আমাদের অধ্যয়নবস্তু তার মূল কোথায়, সে পাঠ যে শুদ্ধ, অন্তত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য, তার প্রমাণ কোথায়?

যে কবিতাটি আমার অধ্যয়নবস্তু সেটি হয়তো কবি মুখে মুখে রচনা করেছিলেন। বিশেষত তিনি যদি প্রাচীনকালের কবি হয়ে থাকেন অথবা

নিজে লিখন-পঠনক্ষম না হয়ে থাকেন (অথবা যে অনগ্রসর সমাজে তাঁর বাস সেখানে যদি লিখন-পঠনের পদ্ধতি অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত থেকে থাকে), তা' হ'লে তাঁর রচনাটি মুখে মুখেই চলতে থাকবে যতদিন না কেউ ওটিকে লিপিতে ধরে রাখেন। বস্তুত অনেক প্রাচীন সমাজের সাহিত্য, অনেক অপ্রাচীন অথচ অনগ্রসর সরল সমাজের সাহিত্য, মৌখিক প্রকাশেই সীমাবদ্ধ, অনেক ক্ষেত্রে তার কোনো লিখিত রূপের অস্তিত্বই ঘটে নি সমসময়ে। (হয়তো পরবর্তীকালে কেউ মৌখিক রূপটিকে লিখিত রূপ দিয়ে থাকবেন)। কাব্যজগতের একটি বিশাল অংশ 'অরাল ট্র্যাডিশন্'-এর, মৌখিক পরম্পরার অন্তর্গত। ইওরোপীয় ব্যালাডগুলি, আমাদের ভাষায় বাউল গান ও ছড়াগুলি, এই মৌখিক পরম্পরার নিদর্শন। যেহেতু এক পুরুষ পর্যায় থেকে অন্য পুরুষ পর্যায়ে এই-সব রচনা মুখে মুখেই চলে এসেছে, এমন সম্ভব (সম্ভব কেন, প্রায় নিশ্চিত) যে রচনাগুলির আদি রূপটি কালক্রমে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ব্যালাড ও ছড়াগুলির বিভিন্ন পাঠ এই পরিবর্তনে উৎপন্ন। ব্যালাড ও ছড়াগুলি তো বস্তুত বিশেষ কোনো লেখক-মানসের ধারক নয়, মুখে মুখে ঘুরে ফিরে সেগুলির অনন্য ব্যক্তিকতা লোপ পেয়ে যায় (গোড়াতে হয়তো মাত্র একজন অথবা দু-তিনজন লেখকের অনন্য মানস রচনাটিতে বিধৃত ছিল), এ সব পদ্যরচনায় সমাজ-মানসের অথবা গোষ্ঠী-মানসের প্রতিচ্ছবি। যতদিন-না লিপিবদ্ধ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এ-সব পদ্যের পাঠ পরিবর্তনশীল, পরিবর্তন-সম্ভব। যখন লিপিবদ্ধ হয়ে গেল তখন পদ্যটির পাঠ (অন্তত বিশেষ একটি পাঠ) যেন শিলীভূত হয়ে গেল। যে লিপিকার যে পাঠটি পেয়েছেন তিনি সেটিকেই লিপিতে ধরেছেন। এ ভাবে আলাদা আলাদা লিপিকারের পাঠে প্রভেদ উৎপন্ন হয়, একই ব্যালাডে বা ছড়ায় (বা অন্য কোনো রচনায়) পাঠ-তারতম্য প্রকট হয় যদিও প্রত্যেক লিপিকারই নিষ্ঠার সহিত একটি বিশেষ পাঠ লিপিবদ্ধ করেছেন।

পাঠ-তারতম্যের অন্য কারণও থাকতে পারে। অনুমান করা যাক যে দু'জন লিপিকার একই সময়ে একই বাউলের গান শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতধ্বনির লিপিকরণে প্রবৃত্ত হলেন। গানের লিপিকৃত দুই রূপে প্রভেদ থাকা খুবই স্বাভাবিক। উচ্চারিত বাক্যগুলি খুবই সম্ভবত দুজন লিপিকারের কানে একই ধ্বনি বহন করে নি, যৎ শ্রুতং তল্লিখিতং, যিনি যেমন শুনেছেন

তিনি তেমন লিখেছেন। যেকালে বানানও নিয়মাবদ্ধ হয় নি (ইংরেজি লিপিতে তো ডক্টর জনসনের বিখ্যাত অভিধানের আগে পর্যন্ত বানান ছিল বহুরূপী), পৃথক পৃথক লিপিতে একই পাঠের পৃথক পৃথক বানান থাকত আর কালে এই বানান-বৈষম্যই নানাপ্রকার পাঠপ্রমাদ ও পাঠসংশয় সৃষ্টি করত। শ্রুতিবৈষম্য থেকে যে বানানবৈষম্য ও ধ্বনিবৈষম্য, ধ্বনিবৈষম্য থেকে যে শব্দবৈষম্য উদ্ভূত হতে পারে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ অবশ্য সর্বদেশীয় মৌখিক ধারাবাহী লোকসাহিত্যে মেলে, তা' ছাড়া এই বৈষম্যপ্রবণতা আধুনিক (অর্থাৎ লিখিত ও সযত্নে মুদ্রিত) সাহিত্যেও কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি একদা স্যার ওয়লটার স্কট ওয়র্ডস্বোয়র্থের একটি ছত্র ('ইয়ারো ভিজিটেড্' নামক কবিতা থেকে) এইভাবে উদ্ধৃত করেছিলেন : "A softness chill and holy"। মূলে আছে still and holy। কবি বড়ই মর্মাহত হয়েছিলেন কেননা যদিচ chill ও still দুটিই সমধ্বনি শব্দ, সুতরাং একের পরিবর্তে অন্যের প্রয়োগে ছন্দের কোনো বিকৃতিসাধন হয় না তবুও শীতল ও পবিত্র এই দু'টি শব্দে কবির ঈপ্সিত ভাবসংগতি রক্ষিত হয়নি. শীতল ও নিথর এই দুটি শব্দ বিনিময়-শব্দ নয়। বলা যেতে পারে, এটি মাত্র ক্ষীণস্মৃতির দৃষ্টান্ত, ঠিক পাঠ-সমস্যার নয়, তা' হলে আরেকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন। আমার ইস্কুল-জীবনে একদা কোথাও সংগীত-আসরে একটি গান শুনেছিলাম, 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান'। গানটি কার রচনা জানতাম না, দু-তিন বছর পরে জেনেছিলাম। কিন্তু গানটি নিশ্চয় সাধারণ জনসমাজেও আদর পেয়েছিল কেননা আমার প্রথম শোনার অনতিপরেই ঢাকা শহরের গাড়িওয়ালা এবং শাঁখারির মুখে গানটির এই পাঠ শুনেছি :

রাজপুরীতে বাজায় বংশী দিনের শ্যাষের তান

... ...

ঘরে আমার রাইখবার লাগে বহুত লোকের মন
বহুত বংশী বহুত হাঁসি বহুত পিরজন।

ঢাকাই 'কুট্নি'র উচ্চারণ শুধু বানানের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না কিন্তু স্থানীয় উচ্চারণের দিকে নির্দেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পাঠান্তর কয়টি লক্ষ্য করার বিষয়। "পিরজন" মানে সত্যিই 'প্রিয়জন' শব্দটি না মূল

'আয়োজনে'র পরিবর্তে 'প্রয়োজন' শব্দের বিকৃত রূপ তা' জানি না। নেহাৎ রবীন্দ্রনাথের গান বলে এহেন পাঠান্তর স্থায়ী হতে পারে নি কিন্তু এই প্রণালীতেই মুদ্রণপূর্ব যুগের অসংখ্য গান ও কবিতার পাঠান্তর সংসাধিত হয়েছে।

যে-ক্ষেত্রে মূল রচনাটি স্বয়ং প্রবহমান, পরিবর্তনশীল, অ-স্থির, সে ক্ষেত্রে পাঠবৈচিত্র্য অবধারিত।

প্রবহমান লোকসাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও বিশেষ লেখকের নিঃসংশয় ব্যক্তিত্বধারক রচনায়ও অনুরূপ কারণে পাঠবৈচিত্র উৎপন্ন হ'তে পারে। ইংরেজ কবি ডান্-এর দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন। তাঁর গ্রন্থ 'পোয়েম্স্' প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে, ১৬৩৩ সনে। এ-গ্রন্থের অন্তর্গত অধিকাংশ কবিতা—বিশেষত প্রেমের কবিতাগুলি, কয়েকটি এপিগ্রাম, এলিজি ও স্যাটায়ার— এই প্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশ পেল যদিও ত্রিশ বছর আগেই এসব কবিতা লণ্ডনের শিক্ষিত সাহিত্যানুরাগী উচ্চমধ্যবিত্ত তরুণসমাজে খুবই চালু ছিল। কেউ কেউ হয়তো সরাইখানার চতুর বাক্‌পটু আড্ডায় কোনো কবিতার আবৃত্তি শুনে চট্‌ করে লিখে রাখলেন এবং কিছুকাল পরে শ্রুত কবিতার লিপিকৃত রূপ নিয়ে আস্ত একটি পাণ্ডুলিপিই ভরে' ফেললেন। (রানী প্রথম এলিজাবেথের কালে অনেক কবিতাই পাণ্ডুলিপির রূপে চালু থাকত বৎসরের পরে বৎসর।) কবি ডান্-এর জীবদ্দশায় এ-সব কবিতা ছাপা হয় নি যদিও একাধিক পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে যখন ছাপা হল, তখন একটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেই ছাপা হল বটে কিন্তু আজকের সম্পাদক ও বিদ্বান দেখছেন যে মুদ্রিত পাঠে ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপির পাঠে অনেক প্রভেদ, কখনো কখনো মস্ত প্রভেদ। এইভাবে পাঠান্তর-সমস্যা কাব্য-উপভোগের পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়ায়। পাণ্ডুলিপি থেকে এবং পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে যে সংস্করণ মুদ্রিত তা' থেকে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারা যায় না যে কবির রচনাটি ঠিক কী ছিল যে-সংস্করণ বা পাণ্ডুলিপি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত সেটিতে কবির শিল্পভাবনার বাণীমূর্তি নিখুঁত কিনা অথবা বিকৃত হলে কোথায়, কেন, কতটা বিকৃত।

(৩)

প্রমাদ গুরুতর হওয়ার বেশি সম্ভাবনা যে-ক্ষেত্রে আলোচ্য রচনাটির মূলরূপ কোনো পুঁথি থেকে পাওয়া গেছে। পুঁথি হতে পারে জীর্ণ, খণ্ডিত, কীটদষ্ট ; হস্তলিপি দুর্বোধ্য হতে পারে, দু-তিনটি অক্ষরের লিখন-সাদৃশ্য বিভ্রমজনক হতে পারে। যদি পুঁথি মাত্র একটিই পাওয়া গিয়ে থাকে তা' হলে, শুদ্ধ পাঠ লাভের পথে বিঘ্ন যতটা নিশ্চয়তাও ততই। প্রাচীন ইংরেজি কাব্যের যে-সব আকর গ্রন্থ আমাদের কাছে এসেছে—এগ্‌জিটার গ্রন্থ, ভারচেল্লি গ্রন্থ, কটন্-পুঁথিমালা ইত্যাদি— সেগুলি যার যার বিধৃত কাব্যের একমেবাদ্বিতীয়ম্ আকর, পুঁথি কয়েকটি ছাড়া এ-সব কাব্যের অন্য কোনো মূল নেই। চর্যাপদের মূল পুঁথি একটিই, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল পাঠও একটিমাত্র পুঁথিতেই সীমাবদ্ধ। এ-সব অনন্যমূল কাব্যের সুবিধা যে পাঠভেদ সংক্রান্ত যা' কিছু সমস্যা ও সংশয় তা' একটি পুঁথিতেই সীমিত, যদি সেই একটি পুঁথির পাঠ সুষ্ঠুভাবে নির্ণীত হয়ে যায় তা' হলে নিখুঁত পাঠ সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা থাকে না। নিখুঁত পাঠ লাভের যা' কিছু বিঘ্ন তা' ঐ একটি পুঁথিতেই সম্পূর্ণ। অপর পক্ষে এই অনন্যমূল পুঁথির অসুবিধা যে সংশয়সংকুল স্থলে অন্য পাঠের সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ পাওয়া যায় না, অবস্থাটা নেহাৎই hit or miss, নিখুঁত পাঠ পেলাম তো পেলাম, নতুবা চিরতরেই হারিয়ে ফেললাম।

ইংরেজি সাহিত্যে প্রাচীন পুঁথি আর আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা এখন কম। যতরকম সম্ভব পুঁথির আশ্রয়স্থল খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, অকৃপণভাবে শ্রম নিষ্ঠা অর্থ উৎসর্গীকৃত হয়েছে, এখনকার দিনে বড়জোর বার্ট্রাম্ ডবেল্-এর মতো অধ্যবসায়ী কাব্যপ্রেমিক টমাস ট্র্যাহার্নের কিছু অপ্রকাশিত কাব্যের পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেতে পারেন (১৯০৮ সনে পাওয়া গিয়েছিল যদিও ট্র্যাহার্ন মারা গিয়েছিলেন ১৬৭৪ সনে) অথবা অকস্মাৎ ওয়েল্‌সের অথবা উত্তর-স্কট্‌ল্যাণ্ডের কোনো দুর্গম গ্রামস্থ সম্প্রতি ঐশ্বর্যরিক্ত প্রাচীন ভূস্বামীর গৃহে দু-চারটি মধ্যযুগীয় নাটকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেতে পারে। তুলনায় বাংলা সাহিত্যের পুঁথিসন্ধান এখনো গোড়ার পর্যায়ে চলেছে বলে' মনে হয়, বিশেষত মনে হয় যখন দেখি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে কত ব্যাদিত ছেদ। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মৈমনসিংহ গীতিকা মাত্র সেদিনের আবিষ্কার ; আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে আমাদের তথ্যসমাহার

এখনো অনিশ্চিত; প্যালিওগ্রাফি (প্রাচীনলিপি-পাঠবিদ্যা) ও প্রাচীন ভাষাজ্ঞান এখনো কত দুর্লভ; প্রাচীন পুঁথিপাঠে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির ব্যবহার, প্রাচীন কাগজ ও কালি বিচারে আধুনিক রসায়নবিজ্ঞানের ব্যবহার কত অপটু! এতাবৎ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ যা' কিছু হয়েছে, নিতান্তই কোনো কোনো সাহিত্যপ্রেমীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে। এখন সময় এসেছে কোনও সাহিত্য প্রতিষ্ঠান অথবা শক্তিশালী বিদ্যায়তনের তরফ থেকে তন্নিষ্ঠ অনুসন্ধান চালাতে হবে কেননা খণ্ডিত বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি কোথায় যে কোন্ খণ্ডে লুকিয়ে গেল তা' জানা দুঃসাধ্য। তা' ছাড়া বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় বাঙালীর আয়ুর মতো পুঁথির আয়ুও হ্রস্ব। দ্রুতক্ষয়শীল গ্রামগুলিতে যদি বা দু-চারটি পুঁথি এখনো থেকে থাকে, আর কতকাল থাকবে বলা কঠিন। ঢাকায় বাংলা অ্যাকাডেমিতে পূর্ববঙ্গীয় পুঁথি সংগ্রহের মূল্যবান কাজ অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু পুঁথিসংগ্রহকালে পুঁথি খাঁটি না ভেজাল সে বিষয়ে অবহিত হতে হবে: প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে কোনো কোনো মাসিক পত্রিকায় এক তর্কযুদ্ধ চলেছিল, বাংলার কুলপঞ্জীগুলি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের আকর কিনা। সেকালে জনৈক খ্যাতনামা তীক্ষ্ণসন্ধানী ইতিহাসবিদের কাছে শুনেছিলাম, কোনো কোনো ঘটক কীভাবে প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুকরণ ক'রে লিখিত পুঁথিটিকে নানা প্রক্রিয়ায় তিন-চারশো বছরের পুরানো পুঁথি বলে চালিয়ে থাকেন। সাহিত্যিক জালিয়াতির বহু দৃষ্টান্ত বিদেশে পাওয়া যায়। দু'য়েকটির উল্লেখ করছি। আঠারো শতকের ইংরেজ কবি চ্যাটার্টনের দৃষ্টান্ত বোধ হয় বহুজন-পরিচিত। চ্যাটার্টন্ কিছু কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, আসলে সেগুলি স্বরচিত, কিন্তু সেগুলিকে তিনি এক পুরানো পুঁথিতে পাওয়া প্রাচীন ইংরেজি ভাষায় (অর্থাৎ মিড্‌ল্ ইংলিশে) লেখা কবিতা বলে' চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। সত্যিকারের মিড্‌ল্ ইংলিশ জানার মতো শিক্ষা ও বিদ্যা চ্যাটার্টনের ছিল না, তিনি শুধু কিছু আপাত-প্রাচীন বানান ও শব্দরূপের প্রয়োগ করেছিলেন, আর জগৎকে এই বলে ভাঁওতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে পুঁথিখানি তিনি স্বগ্রামস্থ গির্জার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে পেয়েছিলেন। হরেস্ ওয়ল্‌পোল্ ও অন্যান্য জনকয়েক কাব্যানুরাগী যদিও শুরুতে এই আবিষ্কারের দাবীতে উৎসাহিত হয়েছিলেন, তথাপি বিদ্বান

বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণে এই জালিয়াতি অচিরেই ধরা পড়ে এবং মর্মাহত নিঃসম্বল অথচ প্রতিভাশালী তরুণ কবির জীবনান্ত হয়। আর একজন জালিয়াত ছিলেন উইলিয়ম হেনরি আয়ার্ল্যাণ্ড (১৭৭৭-১৮৩৫)। ইনি উকিলের কেরানী ছিলেন, সেই সুযোগে কিছু দলিল-দস্তাবেজ জাল করেন এবং সেগুলি শেক্‌স্‌পিয়র-সংক্রান্ত বলে চালাবার চেষ্টা করলেন; ক্রমে তাঁর সাহস বাড়ল, তিনি বললেন দুটি নাটকও আবিষ্কার করেছেন, সেগুলি শেক্‌স্‌পিয়র-রচিত।—এ জোচ্চুরি বিশেষজ্ঞদের হাতে ধরা পড়ল এবং ক্রমে আয়ার্ল্যাণ্ড অপরাধ স্বীকারও করলেন। ইদানীংকার সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত গ্রন্থ-প্রবঞ্চক ছিলেন টমাস জেম্‌স্‌ ওয়াইজ। এঁর পুস্তক-সংগ্রহ ছিল এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। বহু দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত গ্রন্থ পত্রপত্রিকা এঁর সংগ্রহশালায় ছিল এবং যে-কোনো ইংরেজ লেখকের প্রথম ও দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ওয়াইজের মতামত এমনই মর্যাদা লাভ করেছিল যে কয়েক বৎসর পূর্বে অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ওঁকে এম. এ. ডিগ্রীতে ভূষিত করেন। কিন্তু ১৯৩৪ সনে জন্‌ কার্টার ও গ্রেহাম পলার্ড নামক দুই ভদ্রলোক "অ্যান্‌ এনকোয়ারি ইন্‌টু দি নেচার অব্‌ সার্টেন নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরি প্যাম্‌ফ্‌লেট্‌স্‌" নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে শ্রীযুক্ত ওয়াইজ-বর্ণিত অনেক দুর্লভ সংস্করণ বস্তুত জাল এবং এই জালিয়াতিতে তিনি সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিলেন অন্য দুজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাছ থেকে—মরিস্‌ বাক্‌স্‌টন্‌ ফর্মান (যিনি কীট্‌সের পত্রাবলী ও কবিতাবলী সম্পাদনা করে' যশোলাভ করেছিলেন) ও স্যর এডমণ্ড গস্‌ (কবি, লেখক, ঐতিহাসিক)। শ্রীযুক্ত ওয়াইজের জালকরণ প্রণালীর একটি উদাহরণ দিই। ইংরেজ কবি-দম্পতি রবর্ট ও এলিজাবেথ ব্রাউনিং ১৮৪৬ সনের শেষভাগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, তার পরেই দুজনে ইতালীতে চলে যান, সেখান থেকে ১৮৫০ সনে মিসেস ব্রাউনিংয়ের অনবদ্য প্রেমকাব্য, 'সনেট্‌স্‌ ফ্রম দি পর্টুগীজ' নামক সনেটগুচ্ছ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই ঘটনার দীর্ঘকাল পরে, যখন ব্রাউনিং-দম্পতির কেউই জীবিত নেই, শ্রীযুক্ত ওয়াইজ বললেন যে উক্ত সনেটগুচ্ছ ১৮৫০-এর পূর্বেই ১৮৪৭ সনে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে এই প্রথম সংস্করণ গোপনে ছাপা হয়েছিল, কবিবন্ধু মিসেস মেরী রাসেল মিট্‌ফোর্ডের ব্যবস্থায়, যাতে কিনা অল্প কয়েকটি মুদ্রিত কপি শুধু অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকে বিলি করা

যায়; এটি যেন সীমিত খাস-সংস্করণ, জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট আম-সংস্করণ নয়। (এ হেন সীমিত খাস-সংস্করণ সে যুগে সুপ্রচলিত ছিল। টেনিসনের 'ইন মেমরিয়ম্' এ হেন সংস্করণের উদাহরণ, টেনিসনের আরেকটি কাব্য 'দি লাভার্স টেল্' সর্বজনের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৯ সনে, যদিও কাব্যটির দীর্ঘতম অংশ রচিত হয়েছিল ১৮২৮ সনে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, এবং তা' ছাড়া ১৮৩৩ ও ১৮৬৮ সনে দুটি সীমিত খাস-সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল বন্ধুসমাজে বিলির জন্য।)

শ্রীযুক্ত ওয়াইজ-বর্ণিত ১৮৪৭ সনের তথাকথিত সংস্করণটি (যেটি আসলে ওয়াইজ জাল করে ছেপেছিলেন) চড়াদামে বিক্রি হয়ে গেল। কিন্তু ১৯৩৪ সনে কার্টার ও পলার্ড প্রমাণ করলেন যে তথাকথিত আদি সংস্করণটি যে কাগজে ছাপা হয়েছে সে কাগজ মিসেস ব্রাউনিংয়ের জীবৎকালে তৈরি হত না (এই প্রমাণ রসায়নবিদ্যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে), এই তথাকথিত সংস্করণে এমন কয়েকটি হরফ ব্যবহৃত হয়েছে যা কিনা হরফ-নির্মাতা ক্লে কোম্পানি ১৮৯০ সনের পূর্বে আদৌ নির্মাণ করেন নি। এই দুটি বড় যুক্তি এবং অন্যান্য ছোটখাটো যুক্তির অবোধ্য আঘাতে শ্রীযুক্ত ওয়াইজের প্রবঞ্চনা প্রকট হয়ে পড়ল।

এই দু-চারটি দৃষ্টান্ত থেকে খানিকটা অনুমান করা যেতে পারে যে বহু ভেজাল-বর্ণিল এ সংসারে সাহিত্যগ্রন্থেও ভেজাল ও খাঁটির তারতম্য বিদ্যমান। এবং সংসারের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনি বিচক্ষণ ব্যক্তি ভেজাল বর্জন করে' খাঁটি বস্তুটি বাছাই করে নেবেন। গ্রন্থের ভেজালত্ব প্রমাণ করতে হলে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কৌশল জানতে হয়, তা' ছাড়া সতর্ক ভাষাজ্ঞান ও সর্বোপরি সূক্ষ্ম শিল্পবোধ না থাকলে কেবল কানুনমাফিক বিশ্লেষণ অকৃতকার্য হতে পারে। বলা বাহুল্য যে খাঁটি ও ভেজাল, এই দুই কথা আমি গ্রন্থের সাহিত্যরস সম্পর্কে প্রয়োগ করছি না, গ্রন্থটি যে-লেখকের, যে-কালের, যে-ভাবধারার বলে' দাবী পেশ করা হয়েছে, সে দাবী গ্রাহ্য কিনা, অর্থাৎ গ্রন্থটির যা' পরিচয় সেটি তা-ই কিনা, এই প্রমাণেই জানা যাবে গ্রন্থটি খাঁটি না ভেজাল। জানা যাবে যে-পাঠ আমার কাছে সরবরাহ করা হয়েছে সে-পাঠ শুদ্ধ না বিকৃত, যে-কাব্যানন্দ আমি উপভোগ করছি এই পাঠের নির্ভরে, সে-আনন্দ স্থায়ী না অলীক।

গ্রন্থের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা-বিচারের পদ্ধতি পুঁথিতে ও মুদ্রিত গ্রন্থে অনেকটা পৃথক যদিও মূলনীতিগুলি একই ধরনের। যিনি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন অথবা যিনি কাব্যালোচনায় নিছক আনন্দের প্রত্যাশী, তাদের দুজনকেই গ্রন্থের শুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে এবং যদিও আলোচকের পক্ষে স্বয়ং শুদ্ধতা-নির্ণয়ে লিপ্ত হওয়া সম্ভব না হতে পারে, সৎ সম্পাদকের পক্ষে এ কার্য অবশ্যমান্য। সমগ্র গ্রন্থের শুদ্ধতা নির্ণয় করতে হবে, আর যদি গ্রন্থটি খাঁটি বলে ধরা যায় তা' হলেও অংশবিশেষে পাঠান্তর বিদ্যমান কিনা, সে কথা জানতে হবে, বিদ্যমান থাকলে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ collate করতে হবে অর্থাৎ একত্র করে তাদের তুলনা করতে হবে যাতে এই তুলনাভিত্তিক বিশ্লেষণে শুদ্ধ অথবা শুদ্ধতম-সম্ভব পাঠ আমাদের আয়ত্ত হয়।

(৪)

শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের পথে যে বিচিত্র জটিলতা তার কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে উপরের অনুচ্ছেদে। মূলগ্রন্থ বা গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করতে হবে। মূল হয়তো লেখকের স্বহস্তলিপি (holograph) অথবা লিপিকারকের হস্তলিপি, হয়তো একাধিক লিপিকারকের একাধিক হস্তলিপি। অতএব সমকালীন হস্তলিপি অধ্যয়ন করতে হবে। বাংলা সাহিত্যে এ-সব কাজ তেমন কিছু হয়েছে বলে জানিনে— আমার অজ্ঞতা হওয়াই সম্ভব— কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়রের তিন পৃষ্ঠাব্যাপী স্বহস্তলিপির ও অন্যান্য ষোড়শ শতকী ইংরেজদের স্বহস্তলিপির ভিত্তিতে যে তথ্যপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ, আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি-পরীক্ষিত লিপিবিদ্যা গড়ে' উঠেছে, অথবা ষোড়শ শতকেরও অনেক আগেকার মধ্যযুগীয় মিড্‌ল্‌ ইংলিশের বহু ডায়ালেক্‌ট্‌ বা আঞ্চলিক উপভাষার এবং ওল্‌ড্‌ ইংলিশের লিপিবিদ্যা গড়ে' উঠেছে, তেমন নির্ভরযোগ্য বিস্তৃত, সম্পূর্ণ, আধুনিক-জ্ঞানসম্মত বঙ্গলিপিবিদ্যা আমাদের ভাষায়ই বা গড়ে' উঠবে না কেন? পুঁথিপাঠোদ্ধার অতীব কুশলী বিদ্যা। যিনি প্রাচীন সাহিত্যের পাঠ নির্ণয় করবেন তাঁর সন্ধানলক্ষ্য হবে পুঁথি, যিনি মুদ্রণোত্তর যুগের সাহিত্যচর্চায় নিযুক্ত তিনি অন্বেষণ করবেন মুদ্রিত পুস্তক। দুই অন্বেষণ এক ধরনের নয়, দুই সন্ধানে লক্ষ্যে প্রণালীতে কিছু তারতম্য আছে কিন্তু দু' রকম সন্ধানেরই প্রথম কথা— সাহিত্যবস্তুগুলি সংগ্রহ করতে হবে। এই সাহিত্যবস্তুগুলির

মধ্যে, মুদ্রণোত্তর যুগে, আমরা অন্তর্ভুক্ত করব: (ক) মূল পাণ্ডুলিপি, (খ) ছাপাখানায় দেওয়া কপি, এবং (গ) সম্ভব হলে প্রুফ কপি, বিশেষত যদি রচয়িতা স্বয়ং প্রুফ দেখে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের দেখা কিছু প্রুফ সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। মুদ্রণকালে সংগত পাঠ সম্বন্ধে রচয়িতা হয়তো কিছু আলোচনা করে থাকতে পারেন; আলোচনা বাচনিক হয়ে থাকলে অবশ্য আমাদের লাভ নেই কেননা সে-আলোচনা নিশ্চয় ফনোগ্রাফে বা টেপ্-রেকর্ডে ধরে' রাখা হয় নি; কিন্তু কবি যদি এ বিষয়ে পত্র ব্যবহার করে' থাকেন (যথা কীট্‌স্, জেরার্ড ম্যান্‌লি হপ্‌কিন্‌স্, রবীন্দ্রনাথ) তা' হলে সেই পত্রগুলিকেও গ্রন্থপ্রমাণ বলব। ছাপাখানায় দেওয়া কপি, মায় প্রুফও যখন সম্পাদকের উপাদান, তখন অবশ্য ছাপাখানার রীতিনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে হবে। সে-সব রীতিনীতি কালে কালে বদলায়, আবার ছাপাখানা থেকে ছাপাখানায় তার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এমন কি প্রত্যেক কম্পোজিটরের, প্রত্যেক প্রুফ-পাঠকেরও কিছু খামখেয়াল কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং পুঁথিলিপিকারদের লিপিবৈশিষ্ট্য যেমন অধ্যয়নের বিষয়, ছাপাখানার খামখেয়ালও তেমনি অবর্জনীয় তথ্য। এ কালের শ্রেষ্ঠ শেক্‌স্‌পিয়র-সম্পাদক ডোভার উইল্‌সন্ বলেছেন, 'We can at times creep into the compositor's skin and catch glimpses of the Ms. through his eyes. The door of Shakespeare's work-shop stands ajar.' ('কখনো কখনো আমরা যেন গুঁড়ি মেরে কম্পোজিটরের চামড়ার তলায় ঢুকে যেতে পারি আর তখন তার চোখ দিয়ে পাণ্ডুলিপির চকিত দর্শন পেতে পারি। শেক্‌স্‌পিয়রের কর্মশালার দুয়ার খুলে যায়।') অনেক সময় মুদ্রিত পুস্তকে ভুল থেকে গেছে কেননা ছাপাখানায় যে 'কপি' দেওয়া হয়েছিল ভুল তাতেই ছিল, ছাপাখানার ভূত আসলে 'কপি'-কারকের ভূত!

এই সংগ্রহ-কাজ অবশ্য, শুদ্ধ বিচারে, সাহিত্যিক নয় কেননা এ কাজ দালাল ও চর লাগিয়েই সম্পন্ন হতে পারে, হয়ও। দীনেশচন্দ্র সেন ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু লোক মারফত অনেক পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাধিকারী আমেরিকান ক্রোড়পতি শ্রীযুক্ত ফলজার সারা দুনিয়ায় চর লাগিয়ে তাঁর আশ্চর্য লাইব্রেরি

গড়েছিলেন। কিন্তু দালাল ও চর লাগিয়ে কাজ হাসিল করা নিরাপদ নয় কেননা দেখা গেছে কখনো কখনো দালালরা (বিদেশে দেখা গেছে, এ দেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দালালরা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না) দুনো মুনাফার লোভে ভেজাল মাল চালাতে পারে।

পুঁথি ও গ্রন্থ সংগৃহীত হওয়ার পরে শুরু হবে আসল সম্পাদনকর্ম। সম্পাদনকর্মের উদ্দেশ্য মূল রচনার আদর্শ-রূপ (archetype) স্থির করা। সে-উদ্দেশ্য সাধনার্থে সম্পাদক যাবতীয় পুঁথি ও পুস্তক একত্র করে' স্থির করবেন কোন্‌টি কোন্ সনে লিপিকৃত বা মুদ্রিত হয়েছিল; পুঁথিতে পুঁথিতে ও পুস্তকে পুস্তকে পাঠভেদগুলি (তুচ্ছতম ভেদগুলিও বাদ যাবে না) লক্ষ্য করবেন; কোথায় কোন্ অক্ষর বা শব্দ বাদ পড়েছে, বিকৃত হয়েছে, কাটাকুটি করা হয়েছে, স্থানান্তরিত হয়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে, তার সম্পূর্ণ হিসাব রাখবেন; এ কাজ বিব্লিঅগ্রাফির কাজ, বলতে পারি কেতাব-শুমারির কাজ। দৃশ্যত এ কাজেরও সাহিত্যিক বা শৈল্পিক মূল্য বিশেষ নেই কিন্তু বিচক্ষণতার সহিত দেখলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ কাজের মূল্য হৃদয়ঙ্গম হবে। যখন দেখি চসরের 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্' এবং ল্যাংল্যাণ্ডের 'পিয়র্স প্লাউম্যান'-এর অনেকগুলি পুঁথি পাওয়া গেছে (যথাক্রমে ৮৩টি ও ৬০টি) সমকালে ও পরবর্তী এক শতকে লেখা, তখন প্রমাণ পাই যে গ্রন্থ দুটি পাঠকসমাজে ক্রমান্বয়েই সমাদর পেয়েছে। শেক্‌স্‌পিয়রের মৃত্যুর সত্তর বৎসরের মধ্যে চার-চারটি সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী-সংস্করণ বেরিয়ে গেল অথচ তাঁর সমকালীন অনেক লেখকদের রচনার অনুরূপ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হল না; বায়রনের কাব্যগ্রন্থগুলি ও টেনিসনের 'ইন্ মেমরিয়ম' পুনঃপুনঃ মুদ্রিত হয়েছিল; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশের দু' সপ্তাহের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছিল—এ-সব তথ্যে সংশ্লিষ্ট লেখকদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ হয় আর নিঃসংশয়েই জনপ্রিয়তা সাহিত্যমূল্যের একটি মস্ত বিচার্য অংশ। কেতাব-শুমারির অন্য মূল্য দৃষ্টান্ত দিয়ে পেশ করি। শেক্‌স্‌পিয়রের কোনো কোনো নাটক তাঁর জীবৎকালেই কোয়র্টো সাইজে মুদ্রিত হয়েছিল, অতএব (সহজ বিচারে) এই মুদ্রণগুলির অথরিটি বা প্রতিপত্তি প্রচুর। শেক্‌স্‌পিয়রের মৃত্যু হয় ১৬১৬ সনে, ১৬২৩ সনে প্রথম সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ফোলিও সাইজে, কোয়র্টোতে ও ফোলিওতে

বিস্তর পাঠভেদ বিদ্যমান এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্যা চলেছে যে কোন্ পাঠ অধিক গ্রাহ্য, যে পাঠ লেখকের জীবৎকালে প্রকাশিত হয়েছিল, না, যে পাঠ অপরে কি জানি কোন্ মূলের নির্ভরে প্রকাশ করেছিলেন ? এই অনিশ্চিত অবস্থায় বর্তমান শতকে শ্রীযুক্তপলার্ড প্রমাণ করলেন যে কতকগুলি কোয়র্টোতে যদিও তারিখ দেওয়া আছে শেক্‌স্‌পিয়রের মৃত্যুর পূর্বের, তবুও আসলে সেগুলি ছাপা হয়েছিল মৃত্যুর পরে, ১৬১৯ সনে, যে-বৎসর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের উদ্যম হয়েছিল ও কিছু নাটক ছাপা হয়েছিল। তার পরে নানা কারণে সে-উদ্যম ছিন্ন হয় কিন্তু মুদ্রিত নাটক কয়টিকে আগেকার তারিখ লাগিয়ে জীবৎকালীন সংস্করণ বলে চালানো হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে কয়েকটি কোয়র্টো খুবই সম্ভবত শেক্‌স্‌পিয়রের মূল পাণ্ডুলিপি থেকেই ছাপা হয়েছিল। পলার্ডের প্রমাণের ভিত্তি কেতাব-শুমারির নানা সূক্ষ্ম তথ্য, বিশেষত কাগজের মার্কা ও ব্যবহৃত হরফগুলির বৈশিষ্ট্য। পলার্ডের এই প্রমাণে নাটক কয়টির রচনা-তারিখ সম্বন্ধে বিভ্রমের নিরসন হয়েছে, ফলে শেক্‌স্‌পিয়র-প্রতিভার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিচ্ছন্নতর হয়েছে।

এর পরে সম্পাদক পুঁথি ও পুস্তকগুলিকে স্তরায়িত করবেন। সব কয়টি সংস্করণেরই মূল্য একই স্তরের নয়। আদর্শপাঠ প্রস্তাবকালে সমধিক গ্রাহ্যতার হিসাবে পুস্তকগুলি স্তরবিন্যস্ত হবে এবং ঊর্ধ্বস্তরের পাঠ অবশ্যই নিম্নস্তরের পাঠের চেয়ে বেশি প্রতিপত্তি পাবে। অনেক পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণ হয়তো কোনো পূর্বগ পুঁথি বা সংস্করণের হুবহু নকল মাত্র, মায় ভুলচুক সুদ্ধ। এ-সব নকলের মূল্য তুচ্ছ।

এভাবে সম্পাদনকর্মের প্রথম অধ্যায়ে তিনটি পর্যায় আমরা পেরিয়ে এলাম : collection, collation, classification—সংগ্রহ, তুলনা, স্তরায়ন। (Class বলতে আমরা সচরাচর বুঝি শ্রেণী, কিন্তু শ্রেণী কথাটিতে গুণ ও মর্যাদাসূচক সেই উচ্চাবচতার ধারণা পাই না যেমন পাই স্তর কথাটিতে।) সংগৃহীত সংস্করণগুলির যেন একটা বংশপঞ্জী তৈরি করা হল, কোন্ সংস্করণ আদিম আদর্শ গ্রন্থের নিকটতম ধারাবাহক, কোন্ সংস্করণই বা জারজ বা দূরান্বিত, সে-সমস্যার নিরসন হল। এখন যাবতীয় পুঁথি বা সংস্করণের বা পুনর্মুদ্রণের তুলনায় সম্পাদক একটি আদর্শ মূলগ্রন্থ প্রস্তুত করবেন, এ গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই কিন্তু যদি অবিকৃত মূল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হত তা' হলে তার পাঠ ও

বর্তমান সম্পাদিত আদর্শ পাঠ অভিন্ন হত। ইওরোপীয় পাঠকেন্দ্রিক আলোচনায় এই কাজের নাম 'রিসেন্‌শন্', বাংলায় বলতে পারি (গ্রন্থের) পুনর্বিন্যাস।

কোনো গ্রন্থের অনেকগুলি মুদ্রিত সংস্করণ থাকলে কোন্ সংস্করণটির অথরিটি বা প্রতিপত্তি সর্বাধিক হবে? এককালে Editio Princeps বা প্রথম সংস্করণের প্রতিপত্তি ছিল সর্বাধিক। দুর্লভ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অবশ্য চড়া দামে বিক্রয় হয় সাহিত্যিক কারণে ততটা নয় যতটা দুর্লভতা ও বাজার-দরের সম্পর্ক বিষয়ে ধনবিজ্ঞানের নীতি অনুসারে। (আমার সামনে লণ্ডনের ড'সন্ কোম্পানির ১২৭নং পুস্তক তালিকা আছে, তাতে দেখতে পাচ্ছি রস্‌কিনের 'অন্ দি ওল্‌ড্ রোড্', ১৮৮৫ সনে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের দাম ধরা হয়েছে ১০১ পাউণ্ড ; ক্লেমঁ মারো'-সম্পাদিত ১৫২৬ সনে প্রকাশিত গিওম্ দ্য লরিস্ ও জঁ। দ্য মেঁ্যা প্রণীত লা রোমাঁ দ্য লা রোজ-এর দাম ধরা হয়েছে ২৭৫ পাউণ্ড। এ রকম চড়া দামের প্রধান কারণ এ-সব গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য।) কিন্তু প্রথম সংস্করণ শ্রেষ্ঠ সংস্করণ না-ও হতে পারে, অধিক ক্ষেত্রেই নয়, সেজন্য আজকাল (অক্‌স্‌ফোর্ডের অধ্যাপক চ্যাপম্যানের ভাষায়) 'the most authoritative edition is the last published in the author's lifetime', অর্থাৎ যাবতীয় সংস্করণের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী হচ্ছে লেখকের জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণ। কিন্তু এ বিষয়েও মুশকিল আছে। সর্বশেষ সংস্করণেই যে কবির পরিণততম শিল্প তেমন না-ও হতে পারে ; প্রবীণ বা বৃদ্ধ বয়সের জরা-শিথিল উদ্যমে হয়তো লেখক সংস্করণটিতে মনোনিবেশ করতে পারেন নি ; অথবা নিজ অপরিণত রচনায় সংকোচ বোধ ক'রে তিনি হয়তো আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য 'সঞ্চয়িতা' ১৩৬৬ পুনর্মুদ্রণ, ৮৫৯ পৃষ্ঠাতে গ্রন্থপরিচয়ে 'পরিচয়' কবিতাটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে 'শিশু'তে গৃহীত ও 'সঞ্চয়িতা'য় সংকলিত পাঠ এতই ভিন্ন যে এদের পৃথক কবিতাও বলা চলে)।

আদর্শ পাঠ অথবা শ্রেষ্ঠ সংস্করণ সম্বন্ধে ইদানীংকার পণ্ডিতেরা, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে, সংশয়ী হয়েছেন। এই সংশয় অবশ্য খাটে প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে অথবা যে-সব গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি বা ঐতিহাসিক প্রমাণরহিত সংস্করণ পাওয়া যায় না সে-সব গ্রন্থ সম্বন্ধে : বিগত দেড়শো দু'শো বছরের মধ্যে

মুদ্রণকার্যের এতই উন্নতি হয়েছে যে সব আধুনিক গ্রন্থাদির বিচারে আদর্শ পাঠের প্রশ্ন ওঠে না। (বাংলায় সুমুদ্রিত গ্রন্থের কাল অনেক সংকীর্ণ বলে মনে হয়। সযত্নমুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ কি বিশ্বভারতীর পূর্বে পাওয়া যায়?) ইদানাং পণ্ডিতেরা বলেন যে কল্পিত আদর্শ পাঠের সন্ধানে না ঘুরে' যে সংস্করণ মনে হবে মূল রচনার নিকটতম প্রতিবেশী সেটিকেই অবলম্বন করা উচিত; এই-সঙ্গে মুখ্য পাঠান্তরগুলিও সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। কিন্তু যদি অন্য পুঁথির বা সংস্করণের পাঠান্তরগুলি গ্রহণযোগ্য না হয় তা' হলে সম্পাদক কী করবেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে সম্পাদন-কর্মের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌঁছলাম। প্রথম অধ্যায়ের তিন-পর্যায়ী কর্মের উল্লেখ করেছি ইতিপূর্বে: সংগ্রহ, তুলনা, স্তরায়ন—এ-সব পর্যায়ের উদ্দেশ্য একটা আদর্শ পাঠ কল্পনা করা অথবা সদৃশতম জাতিপাঠ নির্দেশ করা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিজ প্রস্তাবিত পাঠ প্রস্তুতের সময় সম্পাদককে অনেক সময় নূতন পাঠ উদ্ভাবন করতে হবে কেননা চল্‌তি অনেক পাঠই তিনি সঙ্গত মনে করেন না। এই নূতন পাঠ উদ্ভাবনের কাজ emendation বা পাঠশোধনের কাজ।

(৫)

পাঠশোধনের সরলতম স্তরে সাদাসিধে মুদ্রণপ্রমাদের সংশোধন হয়ে থাকে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' যে-পাঠভেদ সংকলিত হয়েছে শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় দ্বারা তা'তে দেখতে পাচ্ছি এক সংস্করণের মুদ্রণপ্রমাদ অন্য সংস্করণে সংশোধিত হয়েছে, যথা, 'সুখের বিলাপ': প্রথম পাঠ ছিল 'সুখে কহে নিশ্বাস ফেলিয়া,' সংশোধিত রূপ হয়েছে 'সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া'। 'সন্ধ্যা' কবিতাতে ২৪নং ছত্রটি প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এইরূপ: 'যেন তার কতশত, পুরান সাধের স্মৃতি'। এই ছত্রটি অন্য এক সংস্করণে ছাপা হয়েছে, 'যেন তোর কতশত'। 'তোর' শব্দটি আদৌ অর্থহীন নয় বরং সঙ্গত অর্থই করা যায়, তবুও পৌর্বাপর্য বিবেচনায় মনে হয় 'তার' পাঠই শুদ্ধ এবং তা হলে 'তোর' পাঠ সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদ। "দেশ" পত্রিকায় এই সংকলকদ্বয় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির যে-পাঠভেদ সংকলন করেছেন তাতেও সম্ভবপর মুদ্রণপ্রমাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যথা ১৬ ছত্রে বাসনা / বেদনা, ১০৭ ছত্রে ছিঁড়িয়া / ছুঁড়িয়া। কয়েক বৎসর হল

"কবিতা" পত্রিকায় আলোচনা চলেছিল রবীন্দ্রনাথের কথাটি 'মিড-ভিক্টোরীয় যুগবর্তী' না 'মিড-ভিক্টোরীয় যুগবতী'। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুদ্রণপ্রমাদ ঠিক প্রমাদ না আপাতপ্রমাদ বলা কঠিন। কবি ইয়েট্সের বিখ্যাত কবিতা 'বিজানশিয়ম্' থেকে কয়েকটি ছত্র তুলছি :

A starlit or a moonlit dome disdains
All that man is,
All mere complexities,
The fury and the mire of human veins.

প্রথম ছত্রের শেষ শব্দটি disdains রূপে (অধুনা এই রূপটিই স্বীকৃত) আবার distains রূপেও পাওয়া গেছে ; d ও t, কোন্ অক্ষরটি যে মুদ্রণপ্রমাদ, কোনো অক্ষরই যে প্রমাদ, তা বলা অসম্ভব কেননা দুই রূপেই ছত্রটির সুন্দর মানে পাওয়া যায়। অধ্যাপক চ্যাপ্‌ম্যান্ অনুরূপ দৃষ্টান্ত শেক্‌স্‌পিয়র থেকে দিয়েছেন : ফোলিওতে আছে and in one purpose, অথচ কোয়ার্টোতে আছে end in one purpose, দুই রূপেই সঙ্গত মানে পাওয়া যায় অথচ and-এর a এবং end এর e-তে মুদ্রণপ্রমাদ না ইচ্ছাকৃত অক্ষর-পরিবর্তন (কার ইচ্ছা, লেখকের না কম্পোজিটরের ?) সে কথা বলার উপায় নেই।

এক সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে আরো সংশোধন পাওয়া যায় যেগুলি মুদ্রণপ্রমাদ নয়, সামান্য অবয়ব-পরিবর্তন মাত্র, যথা, দীর্ঘ ঈকারের জায়গায় হ্রস্ব ইকার, মূর্ধন্য ণ-এর জায়গায় দন্ত্য ন ব্যবহৃত হওয়া ; বন্ধনীচিহ্ন, কমা প্রভৃতি চিহ্নের পরিবর্তন। উদাহরণ-স্বরূপ ব্রাউনিংয়ের 'পলিন্' কাব্যের উল্লেখ করছি। এ-কাব্যের তিনটি সংস্করণ বেরিয়েছিল কবির জীবৎকালে ১৮৩৩ সনে, ১৮৬৮ ও ১৮৮৮ সনে। দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধনগুলি এভাবে শ্রেণীবিভক্ত হতে পারে : ক্যাপিট্যাল বা বড়ো অক্ষর বর্জন (Winter/winter, Fancy/fancy) ; পৃথক পৃথক শব্দকে যুক্তশব্দ বানানো (sun treader/sun-treader, quick glancing/quick-glancing) বানান বদলানো (sate/sat, altho'/although)। প্রথম সংস্করণে ড্যাস্-চিহ্নের ছড়াছড়ি, ১০৩১ ছত্রে সম্পূর্ণ কাব্যটিতে ৩০২ বার ব্যবহৃত হয়েছে ; তৃতীয় সংস্করণে কমিয়ে ৭৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অবশ্য

মুখ্যতর সংশোধন বহু পাওয়া যায় কিন্তু যে-সব অবয়ব-পরিবর্তনের উল্লেখ করলাম এগুলিও নিরর্থক নয়, এগুলি থেকে কবির প্রবীণ রচনা-প্রণালী হৃদয়ঙ্গম হয়।

পাঠ-সংশোধনের জটিলতর পর্যায়ে পাই মূল শব্দের অবয়বী ও অভিধাগত পরিবর্তন, পুরাতন শব্দের (বা ছত্রাংশ, ছত্র, ছত্রাবলী) বর্জন, নূতন শব্দের (বা ছত্রাংশ, ছত্র, ছত্রাবলী) প্রয়োগ। এই জটিল সংশোধনের উদ্দেশ্য কবির মূল রচনার সন্নিকট হওয়া। এ কার্যে সম্পাদকের মুখ্য অবলম্বন প্রত্যেক পাঠভেদের প্রাচীনতম নিদর্শন। ডক্টর জন্‌সনের অমূল্য উপদেশ এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়: Always turn the old text on every side, and try if there be any interstice through which light can find its way—(পুরানো পাঠটি নিয়ত সবদিক থেকে নাড়াচাড়া কর, দেখ কোনো রন্ধ্রপথ পাও কিনা যেখান দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে)। এই নীতি অবলম্বনে ডক্টর জন্‌সন্ স্বয়ং যে সব সংশোধন করেছিলেন শেক্‌স্‌পিয়র-পাঠে, তার মাত্র দুটির উল্লেখ করছি। 'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা' নাটক, ৪ অঙ্ক ১৫ দৃশ্য, ৭৩-৭৪ ছত্র:

Cleopatra. No more but e'en a woman, and commanded
By such poor passion as the maid that milks

ফোলিও-সংস্করণে ছিল (এই নাটকটির এই প্রথম সংস্করণ, পূর্বে কোনো কোয়ার্টো-সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি) but in a woman; জন্‌সন্ in সরিয়ে e'en বসিয়েছেন। অন্যে মূল রচনা পড়ে গেছেন, লিপিকার শুনে লিখে গেছেন, e'en শুনে in লিখেছেন, এমন হওয়া খুবই সম্ভব, এ স্থলে inএর মানে হয় না লিপিকার সে কথা বিবেচনা করেন নি। জন্‌সন্-কৃত পাঠান্তরে সঙ্গত ও সুন্দর মানে হয়েছে। মাত্র ৮ লাইন পূর্বে অ্যান্টনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, তারপরেই ক্লিওপাট্রা মূর্ছা গেছেন, মূর্ছাভঙ্গের পরে বলছেন, এখন আমি আর সম্রাজ্ঞী নই, আমি শুধু প্রেমিকা, যে-সামান্যা শ্রমজীবী নারী প্রেমাবেগে শাসিতা আমিও তারই মতো নারী মাত্র, প্রেমিকা।—যদি শেক্‌স্‌পিয়রের মূল রচনা আমাদের করায়ত্ত থাকত তা' হলে তুলনায় দেখতে পেতাম (তুলনায় বলছি কেননা এ-সব বিষয়ে ষোলো আনা নিশ্চয়তা অসম্ভব) জন্‌সনের সংশোধন খাটি। পক্ষান্তরে আর একটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন,

সেখানে জন্‌সনের সংশোধন গ্রহণ না-ও করা যায়। এই নাটকেরই পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য, ৪১-৪২ ছত্রে ক্লিওপাট্রা বলছেন :

What, of death, too,
That rids our dogs of languish ?

ফোলিওতে আছে। languish-শব্দটি সচরাচর ক্রিয়াপদ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, এখানে বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং জন্‌সন্ 'l' কেটে দিয়ে anguish, বিশেষ্য শব্দ বসিয়েছেন। আধুনিক পণ্ডিত দেখিয়েছেন যে languish শব্দটির বিশেষ্য-প্রয়োগ শেক্‌স্‌পিয়রের অন্যত্র ('রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট', ১, ২, ৫০) পাওয়া যায়, এমন কি অনেক পরবর্তী কালে কোল্‌রিজের কাব্যেও পাওয়া যায়। এবং আলোচ্য ছত্রে languish কথাটি সুপ্রযুক্ত। অতএব জন্‌সনের সংশোধন অনাবশ্যক, অগ্রাহ্য। একই নাটকের অন্য দুইটি বহুজনগ্রাহ্য সংশোধন বিবেচনা করুন।

১. A grief that smites
My very heart at root. (৫, ২, ১০৪)

কথাটি ফোলিওতে আছে suites, অসংগত-প্রযুক্ত মনে হয়। কবি পোপ প্রস্তাব করলেন shoots বসানো হোক। তাতে শুদ্ধ মানে হয় বটে কিন্তু shoots ও suites-এ চেহারার সাদৃশ্য নেই। পরে ক্যাপেল নামক পণ্ডিত বললেন কথাটি smites ; smites ও মূল suites-এ প্রায় ষোলো আনা সাদৃশ্য এবং সহজেই অনুমান করা যায় যে কম্পোজিটরের হাতে m বদলে u হয়েছে। অতএব ক্যাপেলের সংশোধন সংগত, সুন্দর, গ্রাহ্য।

২. For his bounty,
There was no winter in't : an autumn 'twas
That grew the more by reaping : (৫, ২, ৮৬-৮৮)

পরলোকগত অ্যাণ্টনির গুণকীর্তন করছেন ক্লিওপাট্রা। ফোলিওতে ৮৭ ছত্রে আছে an Anthony 't was, তাতে পরিচ্ছন্ন বাক্-রীতি (ইডিয়ম) পাওয়া যাচ্ছে না। সংশোধক টিবল্‌ড্ বললেন কথাটি autumn ; এই কথাটিতেই পরবর্তী ছত্রের বাক্‌প্রতিমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতি বিদ্যমান, তা' ছাড়া autumn ও Anthonyতে বিভ্রম হওয়া নেহাৎ অসম্ভব নয়, অতএব টিবল্‌ডের পাঠান্তর গ্রাহ্য।

প্রাচীন পুঁথির পাঠ উদ্ধার করা আদৌ সহজ নয়, বিশেষত যখন সেই পুঁথি অবলম্বনে পরে অনেক দায়িত্বহীন নকল ছাপা হয়ে গিয়ে থাকে। যে-আধুনিক পণ্ডিত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পাঠশুদ্ধি প্রস্তাব করেন তিনি আমাদের প্রশংসার্হ যদিও তাঁর প্রস্তাব সব সময় সংশয়াতীত না হতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিই আলাওলের 'পদ্মাবতী' থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৬, শীত সংখ্যা ১৩৬৬) সৈয়দ আলী আহসান কবি জায়সীর 'পদুমাবৎ' ও আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য দুটির সতর্ক সবিচার আলোচনান্তর 'পদ্মাবতী'র কোনো কোনো অংশের পাঠশুদ্ধি প্রস্তাব করেছেন। দু-তিনটি প্রস্তাব বিবেচনা করুন।

১। সিংহল-দ্বীপ-বর্ণন খণ্ড, ২নং স্তবক, ১২ ছত্র : পুঁথিগুলিতে বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়—জমু দিপ পক্ষ আর সাকাএ সান্ননি / জম্বো দিপ পল্ল আর আসকো সাল্‌মলি / জম্বো দিপ পক্ষ আর সক্লেশ সুস্থালি /—কোনো পাঠই গ্রাহ্য নয়, মানে করা যায় না। আলী আহ্‌সান সাহেব সমীচীন কারণে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন ; জম্বু দ্বীপ প্লক্ষ আর শাক শাল্মলী। আমার কেবল একটি নিবেদন আছে। যদি "জম্বু দ্বীপে" করা যায় তা' হলে অধিকরণ কারকের কৃপায় ছত্রটি ব্যাকরণ ও বাক্‌ভঙ্গী-সংগত হয়, বাক্যটির মানে যুক্তিসংগত হয়। এ-কারের যোজনা কষ্টকল্পনা হবে না।

২। উক্ত খণ্ডের ৬নং স্তবক, ৭ ছত্র : পুঁথির পাঠ : শ্বেত রক্ত মউৎপল দেখিতে সুন্দর /—ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র সংশোধন :—শ্বেত রক্ত মণ্ডিত জল দেখিতে সুন্দর /—মূল জায়সীতে আছে—ফুলা কঁবল রহা হোই রাতা /—আলী আহ্‌সান সাহেবের প্রস্তাব : —শ্বেতরক্ত সউৎপল দেখিতে সুন্দর। পুথির পাঠ স্পষ্টতই অশুদ্ধ, 'মউৎপল' কোনো শব্দ নেই। শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের প্রস্তাবিত 'শ্বেত রক্ত মণ্ডিত জল' কষ্টকল্পনা, তা' ছাড়া জায়সীর ভাবসংগত নয়। আহ্‌সান সাহেবের প্রস্তাবে 'সউৎপল' শব্দটি যদিও বহুব্রীহি সমাসসিদ্ধ তবুও আদৌ চলিত নয়, আলাওল নূতন শব্দ সৃষ্টির দিকে মনোযোগী ছিলেন না। তা' ছাড়া 'শ্বেতরক্ত সউৎপল দেখিতে সুন্দর', এই বাক্যবন্ধের মানেও সুষ্ঠু হয় না। কী দেখতে সুন্দর?—যে শ্বেতরক্ত উৎপলের

সহিত বর্তমান। এতদ্দ্বারা জোর দেওয়া হচ্ছে রক্তের উপরে, অথচ জোর দেওয়া উচিত উৎপলে। আমার বিনীত প্রস্তাব যে 'মউৎপল' পুঁথির লিখনদোষজনিত ভ্রম, কথাটি 'সে উৎপল' অথবা 'যে উৎপল'। তা' হলে ছত্রটি হবে: শ্বেতরক্ত যে উৎপল দেখিতে সুন্দর। সাদা পদ্ম, লাল পদ্ম, দু'রকম পদ্মের কথাই কবি বলেছেন।

৩. উক্ত খণ্ডের ৮নং স্তবক, প্রথম দুই ছত্র

পুনি ফুলবারি লাগা চহুঁ পাসা।
বিরিছ বেধি চন্দন ভই বাসা॥

—জায়সী

মনোহর উদ্যান পুষ্পেত তার পাশ।
বৃক্ষ সব হৈল যেন চন্দনের বাস॥

—আলাওল, পুঁথির পাঠ

মনোহর পুষ্করিণী উদ্যান তার পাশ।
বৃক্ষ সব ভেদি হৈল চন্দন সুবাস॥

—আলাওল—আহ্সান

আমার বিনীত প্রস্তাব যে আহ্সান সাহেব অকারণে 'পুষ্করিণী' শব্দটির আমদানি করেছেন, জায়সীতেনেই, পুঁথিতে এর আভাসও নেই, তা ছাড়া তাঁর প্রস্তাবিত প্রথম ছত্রটিতে পয়ারের ছন্দোগতি ব্যাহত হয়েছে। এমন হওয়া সম্ভব নয় কি যে পুঁথির 'পুষ্পেতে' শব্দটি=পুষ্পিত, হ্রস্ব ই-কারের জায়গায় এ-কার লিখেছেন লিপিকার? তা হলে আমার প্রস্তাবে ছত্রটি হবে:

মনোহর উদ্যান পুষ্পিত তার পাশ।

এর পরে শেক্স্পিয়র থেকে দুটি অংশের পাঠভেদ বিবেচনা করা যাক। প্রথমটি নেওয়া হয়েছে 'কিং লীয়র', প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে। রাজা লীয়র রাজ্যের বাঁটোয়ারা করছেন, বড়ো দুই মেয়েকে তাদের অংশ দিয়ে তাকিয়েছেন প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যার দিকে:

but now our joy,
Although the last, not least in our dear love,
What can you say to win a third, more opulent
Than your sisters'?

এই পাঠ পাওয়া যায় ১৬০৮ সনের কোয়র্টো-সংস্করণে— এইটিই প্রাচীনতম সংস্করণ। পক্ষান্তরে ১৬২৩ সনের ফোলিও-সংস্করণে এ-অংশটির পাঠ অন্যরকম :

Now our Joy
Although our last, and least ; to whose young love,
The vines of France and milk of Burgundy
Strive to be interess'd ; what can you say to draw
A third more opulent than your sisters ? Speak.

এককালে কোয়র্টো-পাঠটিই বেশি প্রচলিত ছিল এই যুক্তিতে যে 'last but not least' পদটি ইংরেজি কথ্যরীতির সঙ্গে সংগত। আজকাল যুক্তি বদলে গেছে ; এখন বলা হয় যে এখানে বাক্-ভঙ্গী লেখকের লক্ষ্য নয়, তিনি 'least' কথাটিতে বোঝাতে চাচ্ছেন যে বড় বোন দুটির তুলনায় কর্ডেলিয়ার ছিল হাল্‌কা শরীর, তিনি যেন নেহাৎ বালিকা। এ-যুক্তিতে ফোলিও-সংস্করণের পাঠে কর্ডেলিয়ার সুন্দর এক মূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছে, সুতরাং ফোলিও-পাঠই গ্রাহ্য। (এ-উপলক্ষে বলা প্রয়োজন যে এই বিশেষ অংশটির সমস্যা ছেড়ে দিয়েও অন্যান্য অনেক প্রবল যুক্তিতে ইদানীং সমগ্র 'কিং লীয়রে'র ফোলিও-পাঠই শুদ্ধতর বলে মানা হয়।)

আর-একটি অংশ গ্রহণ করছি 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' থেকে। পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে রোমিওর শেষ উক্তি ; আমি উদ্ধৃত করছি দ্বিতীয় কোয়র্টো-সংস্করণ থেকে। এই সংস্করণের একটি ছত্রাংশ ও কয়েকটি ছত্র আধুনিক সংস্করণে বর্জিত হয়, এই বর্জিত অংশ বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

Ah dear Juliet
Why art thou yet so fair ? [I will believe] Shall I believe
That unsubstantial death is amorous,
And that the lean abhorred monster keeps
Thee here in dark to be his paramour ?
For fear of that I still will stay with thee
And never from this palace of dim night
Depart again. [Come lie thou in my arm,

Here's to thy health; where ere thou tumblest in,
O true Apothecary !
Thy drugs are quicke. Thus with a kiss I die.
Depart again.]

দশ ছত্র নিচে শেষ তিন ছত্র পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আধুনিক সম্পাদকগণ মনে করেন যে কোয়র্টো-সংস্করণটি শেক্‌স্‌পিয়র স্বয়ং অদলবদল করেছিলেন এবং পুনরাবৃত্ত ছত্রাংশ কয়টি বাদ দিয়েছিলেন কিন্তু ছাপাখানার লোক পাণ্ডুলিপি ঠিকমতো ধরতে না পেরে বর্জিত অংশটিও ছাপানোর ফলে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেজন্যই বন্ধনী-সীমিত ছত্রগুলি আধুনিক সংস্করণে বাদ যায়।

(৬)

গ্রন্থ-সম্পাদনার কিছু সমস্যার, বিশেষত পাঠ-সংশোধনের বহু সমস্যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। অতঃপর এ-সব সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি মুখ্য সূত্র ও পন্থার প্রস্তাব করা যায় কি ? সম্পাদন-কর্মশাস্ত্র ইওরোপেই অপ্রবীণ যদিও আঠারো শতকেই এ-শাস্ত্রের দিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নজর পড়েছিল এবং উনিশ শতক থেকে এ-শাস্ত্রের ব্যাপক ও গভীর চর্চা হতে থাকে। বাংলাদেশে এ-শাস্ত্রের চর্চা অর্ধ শতাব্দীর অনধিক। এ-শাস্ত্রের রীতিনীতি, সূত্রগুলি এখনো কালপক্ব হয়ে ওঠে নি তবুও জনকয়েক মান্য সম্পাদন-শাস্ত্রবিদের কর্মপদ্ধতি-নির্ভরে আমি কয়েকটি মুখ্য নীতি ও পন্থার প্রস্তাব করছি।

সম্পাদক সর্বপ্রথমে ভেবে দেখবেন তাঁর সম্পাদনার উদ্দেশ্য কী, তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ কোন্ পাঠকের জন্য ? হতে পারে তাঁর উদ্দেশ্য এমন এক তথ্যপ্রমাণযুক্তি-সম্বলিত পাঠবিচার প্রস্তুত করা যাতে হয়তো নেহাৎ অল্প-সংখ্যক লোক উৎসাহ পাবেন কিন্তু তাঁরা পণ্ডিত ব্যক্তি এবং তাঁরা বুঝতে পারবেন যে দুরূহ জ্ঞানজগতের কোন্ অজ্ঞানতার রন্ধ্রপথ এই পাঠবিচারের 'অ্যাপারেটাস্ ক্রিটিকাস্' নামক বিচারযন্ত্রের সামর্থ্যে নিশ্ছিদ্র হয়ে গেল। অর্থাৎ তাঁর গ্রন্থ পণ্ডিতদ্বারা পণ্ডিতের জন্য লিখিত, আর যেহেতু এ গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের জন্য নয় বরং সাধারণ পাঠকের জন্য সমীচীন যে গ্রন্থ

সে-গ্রন্থের আকর, তার সত্যাসত্যের চরম ধর্মাধিকরণ, সেজন্য এ-গ্রন্থ নিশ্চয় পণ্ডিতগ্রাহ্য অথচ সাধারণজন-দুর্বোধ্য সংকেত চিহ্নে ভূষিত থাকবে। পক্ষান্তরে সম্পাদকের উদ্দেশ্য হতে পারে যে মহৎ গ্রন্থটি অনেক পাঠসমস্যা সত্ত্বেও সাধারণজনের আয়ত্ত হওয়া উচিত, সুতরাং তথ্যপ্রমাণ-সংকেতের জটিল পরিবেশ বর্জন করে' ভিতরের সারবস্তু অর্থাৎ তাঁর প্রস্তাবিত পাঠটি তিনি পেশ করবেন। এই পাঠই তাঁর বিচারে শুদ্ধ পাঠ, এই পাঠ বিদ্বজ্জনসমাজে গৃহীত হয়েছে (তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে) কিন্তু সাধারণজন তথ্যভারাক্রান্ত হবেন না, কেবল শুদ্ধ পাঠে তৃপ্ত থাকবেন। উদাহরণস্বরূপ অধ্যাপক ইস্রেল গলান্‌স্‌ দ্বারা সম্পাদিত সুশোভন ক্ষুদ্রকায় টেম্প্‌ল্‌-সংস্করণ শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকাবলীর উল্লেখ করতে পারি, এ-সংস্করণের পিছনে যে প্রভূত পরিশ্রম ও বিচার বিদ্যমান তার কিছুমাত্র স্বেদাক্ত পরিচয় সংস্করণগুলিতে লক্ষ্য করা যায় না।

অতএব সিদ্ধান্ত যে সম্পাদিত গ্রন্থের দুই উদ্দেশ্য হতে পারে, পণ্ডিততুষ্টি ও সাধারণ জনতুষ্টি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকালে একটি কথা বিনা দ্বিধায় বলা আবশ্যক। কথাটি এই যে সম্পাদিত গ্রন্থের চেহারা যেমনই হোক-না কেন, বিচারযন্ত্র-ভারাক্রান্ত অথবা ঋজু ও পরিচ্ছন্ন যা-ই হোক-না কেন—গ্রন্থের পাঠ উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে শুদ্ধ, এমন নয় যে অপণ্ডিত পাঠকের জন্য অশুদ্ধ পাঠ প্রস্তুত করলেই চলবে। এ কথাটি বলা আবশ্যক কেননা সম্পাদনার নামে বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনেক বিবেকহীন কাজ চলেছে। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় ১৩৭০ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা বিষয়ে যে মূল্যবান প্রবন্ধ শুরু করেছেন তাতে এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলেছেন। ভট্টাচার্য মহাশয় বলছেন : "এ যুগে আবার যখন ওই সকল বই [প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ] মুদ্রিত হয় তখন প্রকাশকেরা কোনো না কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির হাত দিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধন করাইয়া লন।…যেখানে পাঠান্তর আছে সেখানে সম্পাদক যে পাঠ তাঁহার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় সেইটিই গ্রহণ করেন। যেখানে কোনো শব্দের বা ছত্রের অর্থবোধে বাধা হয় সেখানে ইচ্ছামত এক শব্দ তুলিয়া দিয়া আর এক শব্দ বসাইয়া দেন, কখনো কখনো নূতন ছত্র রচনা করিয়া দেন। তাহাতে

মাঝে মাঝে গণ্ডগোল যে ঘটে না এমন নয়, কিন্তু তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না।···দীনেশচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের হাতে এই সকল গ্রন্থের [রামায়ণ মহাভারতের] যেসব সংস্করণ বাহির হইয়াছে সেগুলি আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠ্য। যে সকল অংশ আধুনিক যুগে রুচিবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে সেইসব অংশ তাঁহারা বর্জন করিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে ভাষার সংস্কার— এবং মার্জনাও করিয়াছেন।" এই ছত্র কয়টিতে ভট্টাচার্য মহাশয় কিছু আধুনিক বাংলা সম্পাদনার প্রণালী বর্ণনা করেছেন। প্রণালীর সততা ও গ্রাহ্যতা সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট করে' কিছু বলেন নি। আমার মনে হয় যিনি তাঁর প্রবন্ধে একটি বিশেষ গ্রন্থের সম্পাদনা সম্বন্ধে সতর্ক বিশ্লেষণে নিযুক্ত হয়েছেন তিনি নিশ্চয় বর্ণিত সম্পাদকীয় স্বেচ্ছাচারের সমর্থন করেন না। যে কালে গ্রন্থ মানে ছিল পুঁথি, এক মূল গ্রন্থের অসংখ্য নকল লোকসমাজে প্রচলিত থাকত, যে কালে বৈজ্ঞানিক ও সত্যসন্ধ সম্পাদনার ধারণা আদৌ ছিল না, সেকালে পুঁথিলিপিকারগণ অথবা যাঁরা পুঁথির লিপি করিয়ে দিতেন তাঁরা, নিজ নিজ রুচি অভিপ্রায় ও সাহিত্যাদর্শ অনুযায়ী পাঠ-পরিবর্তন করতেন, তাঁদের পুঁথিতে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ শোভা পেত। তাঁদের স্বেচ্ছাচার ছিল যুগধর্মে সীমিত। কিন্তু মুদ্রণোত্তর কালে, যে কালে মূল রচনার নিকটতম রূপ পরিবেশন করা সম্পাদনার উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হয়েছে, সেকালে রুচির নামে বা আবালবৃদ্ধবনিতার জন্য পাঠযোগ্যতার নামে স্বৈরাচার অতীব গর্হিত, যত বড় খ্যাতনামা ব্যক্তিই এ কাজ করে থাকুন না কেন। ইংরেজি সাহিত্যে এমন স্বৈরাচারের কৃষ্ণতম উদাহরণ পাই ১৮১৮ সনে প্রকাশিত টমাস্ বোড্লার (Thomas Bowdler)-সম্পাদিত (সম্পাদিত কথাটি এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই বোধ হয় অসমীচীন) 'ফ্যামিলি শেক্স্পিয়র' নামক গ্রন্থাবলীতে। এই ব্যক্তি সমাজহিতের নামে শেক্স্পিয়রের রচনা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিলেন এবং তাঁর নাম থেকে bowdlerise কথাটি (অর্থাৎ নীতি ও রুচির নামে অন্যের রচনায় অদলবদল করা) ইংরেজি ভাষায় চালু হয়েছে। প্রধানত তিনি বর্জন করেছিলেন সে-সব অংশ যেগুলি তাঁর মতে আবালবৃদ্ধবনিতার নৈতিক চিন্তা কলুষিত করতে পারে। এমন কথা তিনি (এবং তাঁর বঙ্গীয় অনুগামিগণ) ভাবেন নি যে

(ক) পরিবর্তনশীল সামাজিক নীতির চেয়ে সত্য মহত্তর, (খ) নীতির খাতিরে বর্জন ও 'সংস্কার' করতে হলে গ্রীক,রোমান, সংস্কৃত, এলিজাবেথীয় ইংরেজি সাহিত্যের প্রকাণ্ড অংশ নিপীড়িত হবে, (গ) দু-চারজন শুচিবায়ুগ্রস্ত নীতিবাদী সত্ত্বেও সাধারণ জনসমাজের নৈতিক শক্তি এমন ঠুনকো নয় যে শেক্‌স্‌পিয়র, রামায়ণ, মহাভারতের অবর্জিত সংস্করণ পাঠে চুরমার হয়ে যাবে।

গ্রন্থ-সম্পাদনা আসলে সত্যের সন্ধান, এ সন্ধানে স্বেচ্ছাচারের কিছুমাত্র স্থান নেই, নীতি ও সামাজিক রুচির নামে, আপন সাহিত্যাদর্শের খাতিরে, কোনো পাঠান্তর সাধনের স্থান নেই। পণ্ডিতজনোচিত পাঠই হোক, সাধারণ-জনোচিত পাঠই হোক, পাঠের যে-রূপ অধ্যবসায়ী নিয়মনিষ্ঠ বিচারে প্রস্তুত হয়েছে সেই সত্যরূপই তার একমাত্র রূপ। কচিৎ কোনো স্থলে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণের পরেও হয়তো সমস্যার ফয়সালা হয় না, তখন হয়তো আপন রুচির নির্ভরে সম্পাদককে রায় দিতে হতে পারে। কিন্তু সে রায়ের সঙ্গে নীতিবোধ ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক শোভনতার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। একান্তভাবে সাহিত্যিক ও গ্রন্থতাত্ত্বিক (বিব্লিঅগ্রাফিক্যাল) কারণে সে রায় তৈরি হবে। উপরে প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ ভাগে হ্যাম্‌লেট্‌-নাটকের অমীমাংসিত প্রশ্নের উল্লেখ করেছি : solid, sallied, sullied, কোন্ পাঠ গ্রহণ করা হবে ? তিন পাঠেরই সপক্ষে প্রমাণ আছে, তিন পাঠেই গ্রহণযোগ্য মানে পাওয়া যায়। আমি সম্পাদক হ'লে এ ক্ষেত্রে বেছে নিতাম sullied, সমগ্র নাটকটি এবং এই বিশেষ নাট্যাংশ সম্বন্ধে আমার অনুভূতি ও চিন্তার সঙ্গে sullied কথাটি সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত, এই ব্যক্তিগত রুচির কারণে পাঠটি গ্রহণ করতাম (সামাজিক রুচির কারণে নয়)। কিন্তু সেইসঙ্গে পাদটীকায় অন্য পাঠ দুটিরও উল্লেখ করতাম এবং সে-পাঠের সপক্ষে যুক্তিগুলিও পেশ করতাম। এই বিশেষ দৃষ্টান্তটির ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রুচির প্রতিপত্তিই অধিক হয়ে পড়ছে।

যদি সম্পাদনার উদ্দেশ্য হয় প্রমাণসম্বলিত সংস্করণ প্রস্তাব করা, তা'হলে পাঠান্তর ও পাঠশুদ্ধির প্রশ্ন ওঠে। আধুনিক লেখকদের গ্রন্থ-সম্পাদনায় পাঠশুদ্ধির তেমন সুযোগ নেই। ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের রচনা। তাঁর রচনায় এক সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে পাঠান্তর অবশ্য অনেক পাওয়া যায়

কিন্তু যেখানেই মুখ্য পাঠান্তর, এমন কি পাণ্ডুলিপি থেকেও মুদ্রিত পাঠ পৃথক, সেখানে ধ'রে নিতে হবে যে এসব পাঠান্তর কবির স্বয়ংকৃত। অতএব রবীন্দ্রোত্তর সম্পাদক পাঠশুদ্ধি প্রস্তাবের ধৃষ্টতায় লিপ্ত হবেন না, বরং তাঁর কর্তব্য হবে সম্পাদিত গ্রন্থে কবির জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বশেষ পাঠটি দিয়ে —কোনো কোনো কবিতার (যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ') এডিশিয়ো প্রিন্‌সেপস্‌ অর্থাৎ সর্বপ্রথম পাঠটি দিয়ে—পরে অন্যান্য সংস্করণস্থ পাঠান্তর-গুলির নির্দেশ দেওয়া। এরকম ভেয়ারিঅরম্‌ বা পাঠভেদ-সম্বলিত সংস্করণ বিদেশী সাহিত্যে প্রচুর, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ বা কবিতাবিশেষ নিয়ে এ হেন সংস্করণ কিছু কিছু প্রস্তুত হচ্ছে। পাঠশুদ্ধির সমস্যা, সম্পাদক নিজেই পাঠ প্রস্তাব করবেন কি না এ সমস্যা, প্রধানত প্রাচীন গ্রন্থের বেলায় উদ্ভূত হয়, আধুনিক গ্রন্থের সম্পাদনায় কম।

পাঠশুদ্ধির সমস্যায় কয়েকটি সূত্র স্মরণ রাখা দরকার। সম্পাদকের মুখ্য অবলম্বন হবে লেখকের স্বহস্ত-রচিত পাণ্ডুলিপি ; যদি এ হেন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব না থাকে তা' হলে অন্ততপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির সাক্ষাৎ নকল (এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ থাকা দরকার)। যেখানে পর পর অনেকগুলি মুদ্রিত সংস্করণ বা পুঁথি সংস্করণ বিদ্যমান অথচ জানা যায় যে এগুলি পূর্বতন কোনো সংস্করণের পুনরাবৃত্তি মাত্র (উপরন্তু কালক্রমে সেই পূর্বতন সংস্করণের ভুলভ্রান্তি বাড়িয়েই দিয়েছে), সে ক্ষেত্রে সতর্ক পরীক্ষার পরে সংস্করণ-পুনরাবৃত্তিগুলিকে অবহেলা করা চলে। শেকস্‌পিয়রের 'রিচার্ড দি সেকেণ্ড' নাটকের দ্বিতীয় কোয়ার্টো সংস্করণে প্রথম সংস্করণের চেয়ে ১২৩টি ভুল বেশি, পঞ্চম সংস্করণে মোট ভুল ২১৪টি। 'লাভস্‌ লেবারস্‌ লস্ট্‌'-এর কোয়ার্টোতে ১৭৬টি ভুল ছিল, পরবর্তী ফোলিও-সংস্করণে ১১৮টির সংশোধন হয়, ৫৯টি অবিচলিত ছিল, ১৩৭টি নূতন ভুল সন্নিবিষ্ট হয়। অতএব সম্পাদক স্বয়ং সব কয়টি সংস্করণই পরীক্ষা করবেন কিন্তু সম্পাদিত পাঠে অধিক গ্রাহ্য ও স্বল্পগ্রাহ্য পাঠের তারতম্য করবেন। পাঠবিচার অতীব জটিল কর্ম সে কথা ইতিপূর্বে বলেছি। পাঠবিচারে প্রয়োজন ইতিহাসজ্ঞান, ভাষাজ্ঞান, লিখনরীতি ও মুদ্রণরীতি সম্বন্ধে জ্ঞান, সাহিত্যরসবোধ এবং ইংরেজিতে যাকে বলে shrewd commonsense, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান। এইসঙ্গে কিছু সৌভাগ্য হলে আরও উত্তম। কোনো কোনো সম্পাদক (যথা টিবল্‌ড্‌) সাহিত্যরসে

ধনী না হয়েও সৌভাগ্যবলে সুষ্ঠু পাঠশুদ্ধি প্রস্তাব করেছেন। সাহিত্যরসিক সম্পাদক বিচার করবেন লেখকের বিশিষ্ট ভাব, চিন্তাপ্রণালী, শব্দপ্রয়োগ, ভাবানুষঙ্গ, বাক্‌প্রতিমা, ছন্দ ইত্যাদি কাব্যকারুর বিভিন্ন প্রকাশ। একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। শেকস্‌পিয়র-পরবর্তী কালে ওয়েব্‌স্টার প্রতিভাশালী নাট্যকার ছিলেন। তিনি দু'খানা প্রসিদ্ধ নাটক (দি ডচেস্ অব মল্‌ফি, এবং দি হোয়াইট্ ডেভিল) ও একটি অনতিপ্রসিদ্ধ নাটক (দি ডেভিল্‌স্ ল'-কেস্) রচনা করেছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নেই কিন্তু এ ছাড়া আরো কয়েকটি নাটক সে যুগের প্রথানুসারে অপর লেখকের সহযোগিতায় রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকগুলির কোন্ কোন্ অংশ তাঁর রচনা সে কথা জানার নিঃসংশয় উপায় নেই বটে কিন্তু নিশ্চিত নাটকগুলির শব্দপ্রয়োগ, ছন্দ, বাক্‌প্রতিমা ইত্যাদির তুলনায় (অর্থাৎ যাকে ইন্‌টার্নল্ এভিডেন্স বলা হয় সেই গ্রন্থগত প্রমাণে) অপর নাটকগুলিতে তাঁর রচিত অংশ কোন্‌গুলি সে বিষয়ে আমরা পরিচ্ছন্ন ধারণা করতে পারি।

পাঠশুদ্ধি প্রস্তাবে নিছক অনুমান অগ্রাহ্য। এ বিষয়ে বহুদর্শী অধ্যাপক চ্যাপম্যানের উক্তি স্মরণীয় :

The practice of conjecture is pleasant, but like other pleasant things is dangerous. A commentator is apt to think that every line needs a note ; Johnson said of Warburton that he 'had a rage for saying something when there was nothing to be said' An emender is apt to acquire a rage for correcting when there is nothing to correct. (অনুমানের অভ্যাস সুখকর বটে কিন্তু অন্যান্য সুখকর জিনিসের মতই বিপৎসংকুল। ভাষ্যকার মনে করেন যে প্রতি ছত্রের জন্যই ভাষ্য প্রয়োজন। জন্‌সন্ ওয়র্বর্টন্ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে যে-ক্ষেত্রে কিছুই বলার নেই সেখানেও কিছু বলার জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। যেখানে কিছু সংশোধন করার নেই সেখানেও সংশোধন করার জন্য পাঠ সংশোধকের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হ'তে পারে।)—সম্পাদন-কর্মে নিযুক্ত হ'য়ে আমাদের নিয়ত স্মরণ রাখতে হবে যে পাঠশুদ্ধি কখনোই ভেজালের কাজ নয়, আমাদের স্বকীয় নীতিবোধ, ধর্মজ্ঞান, রাজনৈতিক প্রত্যয় ইত্যাদির বর্ণে যেন আমরা মূল রচনা কখনই রঞ্জিত

না করি। অর্থাৎ সম্পাদন-কর্মে ঐকান্তিক নৈর্ব্যক্তিকতা অপরিহার্য গুণ।

পাঠশুদ্ধি প্রস্তাবে আর একটি কথা নিত্যস্মর্তব্য। কোনো পাঠশুদ্ধিই কেবল ছত্রবিশেষ বা স্তবকবিশেষের প্রসঙ্গে নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। যেহেতু কাব্যের শিল্পমাহাত্ম্য কবিতাটির সম্পূর্ণ নির্মিতিতে, তার সমগ্র অবয়বের সুষমা যোজনায়, সেজন্য সার্থক কাব্যের প্রতিটি শব্দ মূল্যবান। সুতরাং পাঠশুদ্ধির কালে প্রতিটি প্রস্তাব সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে, ভেবে দেখতে হবে প্রস্তাবটিতে সমগ্র কাব্যস্বভাবের সংগতি আছে কিনা।

কয়েকটি বহুজন-স্বীকৃত নীতি শৃঙ্খলিত করলাম, এখন শেষ দুটি সূত্র পেশ করি। সম্পাদনা বিষয়ে, বিশেষত পাঠশুদ্ধি বিষয়ে, শেষ এবং সর্বমুখ্য সূত্র এই যে অন্য কোনো সূত্রই অব্যর্থ নির্বিকল্প সূত্র নয়। এ-সব সূত্রের উদ্দেশ্য সাহিত্য-গ্রন্থে সত্যবস্তুর আবিষ্কার। যদি কোনো গ্রন্থের আলোচনায় দেখা যায় যে প্রচলিত সূত্রগুলিতে সত্যবস্তু ধূমাঙ্কিত হচ্ছে, প্রোজ্জল হচ্ছে না, তা' হলেও সূত্রগুলিতে মনোনিবেশ করা নেহাৎ অন্ধ গতানুগতিকতা হবে। গত দুই শতাব্দীতে ইওরোপে গ্রন্থ-সম্পাদনার অভিজ্ঞতায় যে কয়েকটি মূলসূত্র বহুজনমান্য হয়েছে, সে কয়টি এই অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত করেছি কিন্তু এ কথাও মনে রাখছি যে এমন কোনো পুঁথি বা গ্রন্থ আমাদের আলোচনা করতে হতে পারে অথবা এমন কোনো সাহিত্যিক পরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে হতে পারে (যথা আন্দামান বা নাগাভূমির নিরক্ষর অলিখিত ছড়া বা কাহিনী) যেখানে প্রাগ্রসর সাহিত্যালোচনার সূত্রগুলি নেহাৎই অকেজো। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে উপস্থিত-মত নূতন প্রণালী নির্ণীত হবে। কোনো নিয়মই যে অদ্বিতীয় নয়, সব নিয়মই প্রয়োজনবোধে বদলাতে পারে, সে কথার প্রমাণ পাই এডিশিয়ো প্রিন্‌সেপ্‌স্ ও লেখকের জীবৎকালীন শেষ সংস্করণ এই দুয়েরই প্রতিপত্তিতে।

সর্বশেষ সূত্রটি ঠিক সূত্র নয়, এ সূত্রে বলব যে সম্পাদনার আদর্শ সম্বন্ধে, গ্রন্থ সম্পাদনার চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, আমাদের চেতনা যেন কখনোই মলিন না হয়। সম্পাদনা কর্মে এমন বোধ একান্ত আবশ্যক যে, যে অধ্যবসায়ী একনিষ্ঠ দুরূহ পরিশ্রমের বর্ণনা করেছি কখনই যেন সে পরিশ্রম স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে না দাঁড়ায়,

এই পরিশ্রমের অন্তিম উদ্দেশ্য সাহিত্যের সত্যসন্ধান, এবং সাহিত্যের সত্য রসের সত্য। পুঁথিকর্মী, পাঠশুদ্ধিকার, গ্রন্থপঞ্জীকার সবাই যে যাঁর বিশেষজ্ঞ শক্তিতে রসের সত্যপ্রতিষ্ঠা করছেন। যাঁরা শুদ্ধ কবিতাটি পড়ছেন তাঁরা যেমন এই শুদ্ধির অন্তরালস্থিত পরিশ্রম সম্বন্ধে উন্নাসিক হতে পারেন না, যাঁরা শোধনকর্মে ব্যাপৃত তাঁরাও কখনো শোধনের অন্তিম উদ্দেশ্য বিস্মৃত হবেন না, তাঁরা জানবেন সম্পাদনা পন্থা মাত্র, পথের লক্ষ্য সাহিত্য-শিল্পের আনন্দ।

"বাঙলায় প্রেমের কবিতা"

শিল্পজগতের চিরন্তন কিন্তু সীমিত কয়েকটি বিষয়বস্তুর অন্যতম প্রেম। প্রেমের অভিব্যক্তি নেই এমন কোন শিল্পরূপ নেই। প্রেমের অভিব্যক্তি নেই এমন কোনো সাহিত্য আছে বলে আমি জানি না। কাব্যে হৃদয়াবেগের প্রকাশ, আর প্রেমানুভূতিতে হৃদয়াবেগ পরিস্ফুট। সে-কারণে লিরিক কাব্য প্রেমপ্রবল, অন্যান্য প্রকার কাব্যেও প্রেমের উপস্থিতি অল্পবিস্তর অবধারিত। মানুষের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অসংখ্য কোটি নরনারীর হৃদয় যে-প্রেমানুভূতিতে উদ্বেল হয়েছে, কাব্যে ও অন্যান্য শিল্পে সে-প্রেমানুভূতির যতটুকু প্রকাশ আমাদের আয়ত্তসাধ্য, সে-প্রেমানুভূতির কয়েকটি মূলরূপ আমরা সহজেই নির্ণয় করতে পারি। প্রেমোপলব্ধির বিস্ময়, হর্ষ, উন্মাদনা, ব্যাকুলতা, তার মিলন, বিরহ, তার সম্ভোগ, তার বিক্ষোভ, প্রেমিকের অভিমান, অভিসার, সঙ্কোচ, শঙ্কা, প্রেমের আরো কত না সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য, কোনো না কোনো সজ্জায় সর্বদেশের সাহিত্যেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমের জাতিভেদ নেই, দেশভেদ নেই, প্রেম কালসীমিত নয়। প্রেমের আবরণ মানবিক। প্রবৃত্তির যে-অবিচ্ছেদ্য কারাগারে নির্মম বিধাতা বন্দী করেছেন মানুষকে, নিছক যৌনলিপ্সার সে-কারাগার থেকে সুকুমার আবেগ অনুভবের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকেই বলি প্রেম নামক সভ্য চিত্তবৃত্তি। অন্যান্য আরো কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে মার্জিত তদনুরূপ চিত্তবৃত্তিগুলির যে সম্পর্ক, প্রেম ও তার মূল যৌনবোধে সে-সম্পর্কই বিদ্যমান। মূলকে ভুলে যাওয়া তেমনই অবাস্তব যেমন মূলেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা। শিকড় ছাড়া গোলাপ ফোটে না কিন্তু গোলাপ শিকড়ও নয়। প্রেমে যৌনচেতনার পরম রূপান্তর। যদি এ-রূপান্তরের কৃতিত্ব দিই মানুষকে, তাহলে—বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে—বিনা দ্বিধায় বলব, স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্ট-র মাহাত্ম্যই অধিক।

প্রেমের সৌকুমার্যে সভ্যতার মানদণ্ড। প্রেম দেশকালোত্তর, বিশ্বজনীন। প্রেমে প্রেমিক আপন মানবিকতা পরিস্ফুটরূপে উপলব্ধি করেন। সার্থক প্রেমে মানুষের মহত্ত্বলাভ হয়, আর সে জন্যই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির এষণা যখন দেহ ও কালোত্তর চিত্তবৃত্তিতে পরিশোধিত হয় তখনই তাকে বলি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি। তুলসীদাসের কাহিনী, ইংরেজ কবি ডান্-এর কবিকর্ম, বস্তুত বহু

যৌনপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম সংক্রান্ত কবিতার তুলনাত্মক আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে নর-নারীপ্রেমের পরম sublimation-এর, উর্দ্ধায়নের, শৈল্পিক প্রকাশ হয়েছে ঈশ্বরপ্রেমে।

প্রেমের এই সংক্ষিপ্ত স্বরূপচিন্তন থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব। যদি লক্ষ্য রাখি প্রেমের গূঢ় আবেগের প্রতি, তাহলে সে-আবেগের প্রকাশ যে-কোনো ভাষায় যে-কোনো কালে সমতুল্য। যে ইহুদী যুবতী একদা By the Waters of Babylon অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন, তাঁর সমগোত্রীয়া তরুণী পরবর্তীকালে অন্য দেশেও চিত্তবৈকল্য বোধ করেছিলেন। "মৈমনসিংহ-গীতিকা"র প্রণয়িনীতে ও ইংরেজি ব্যালাড-কাব্যের প্রেমিকায় কোনো দুস্তর ব্যবধান নেই। বিদ্যাসুন্দর ও অভিড্, দাশু রায় ও ভিক্টরীয় স্ট্রিট সিংগার্‌স্, পেত্রার্ক ও কোনো কোনো বৈষ্ণব কবি, তুল্যভাবে প্রকাশ করেছেন প্রেমের বেদনা ও আনন্দ।

কিন্তু বিশ্বজনীনতা প্রেমের শিল্পরূপের সবখানি কথা নয়। প্রেমের গূঢ় স্বরূপ দেশকালোত্তর বিশ্বজনীন বটে, কিন্তু যেহেতু প্রেম প্রেমিকেরই চিত্তবৃত্তি, আর প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি ও চরিত্র তদীয় আবেষ্টনীর সঙ্গে জড়িত, সেজন্য প্রেমের বহিঃপ্রকাশে দেশকাল-প্রভাব, অনন্যতা, অতুলনীয়তা বিদ্যমান। অভিড ও ভারতচন্দ্রের মৌল প্রেরণা তুল্য, অথচ সে-প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ একক্ষেত্রে আঠারো শতকী বঙ্গীয়তায় ও অপরক্ষেত্রে রোমান চরিত্র-ধারায় সুরভিত। বস্তুত প্রেমের কাব্যে তিনটি ভাবস্তরের সংযোজনা লক্ষ্যণীয়। স্তরগুলি পৃথক ও স্বসম্পূর্ণ নয় বরঞ্চ তারা বিস্ময়কর ও প্রায় অবিশ্লেষণীয় উপায়ে নিয়ত একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়। সতর্ক ও সংবেদনশীল পাঠক প্রেমের কাব্যে আবিষ্কার করবেন প্রেমের ঐকান্তিক অনন্যতা—যা' কেবলমাত্র ঐ বিশেষ প্রেমবিষয়ক কাব্যেই উপস্থিত; প্রেমের দেশকালধর্মিতা—যা' ঐ কাব্যের জড়জাগতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবধন্য; প্রেমের বিশ্বজনীনতা—যার গূঢ় মৌলচেতনা দেশ-কালোত্তর, যা' ব্যক্তির ও সসীমের ওপারে ভূমার বিশালতায় নিবেদিত। এ তিন স্তরের মায়াবী মিশ্রণ সে-পাঠকের লক্ষ্যীভূত হবে যিনি বাংলা প্রেমের কাব্য সবিস্তারে ও নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করবেন।

মনে হয় বাঙালী চিত্ত প্রেমানুভূতির সহজ ও উর্ব্বর ক্ষেত্র। প্রাক্-

বৈষ্ণব যুগে আমাদের দেশে প্রেমকাব্য কি পরিমাণে চলতি ছিল জানি না, এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু নরনারীর প্রেমবিষয়ক কাব্যের উদাহরণ দেশী ও বিদেশী অন্য অনেক কাব্যেই—যথা হিন্দী, ইংরেজি —ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে নিতান্ত বিরল। সংস্কৃত কাব্যে যতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় এবং শ্রীযুক্ত নীহার রায় মহাশয়ের ইতিহাসগ্রন্থের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালী জীবনের যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তা' থেকে এমন অনুমান সংগ্রহ অসঙ্গত হবে না যে সে-সব যুগে বাঙালীজীবন ছিল প্রেমানুভূতির অনুকূলে, আর হয়তো সে-অনুভূতি বাঙালীর তৎকালীন সাহিত্যে, বিশেষত গানে, প্রকাশ পেয়েছিল যদিচ সে-সাহিত্য আজ অবলুপ্ত, বিস্মৃত। বৌদ্ধ প্রভাবে সামাজিক জীবন ছিল অনেকাংশে ডেমোক্র্যাটিক। শ্রেণীবৈষম্য উগ্র এমনকি প্রকট ছিল বলে মনে হয় না! নরনারীর স্বচ্ছন্দ মেলামেশায়—অন্ততপক্ষে গ্রামাঞ্চলে, অর্থাৎ দেশের প্রায় সর্বত্রই—তেমন কোন বাধা ছিল না। যে-অসংখ্য অন্তর্নিষেধে বর্তমান সমাজ অহর্নিশি দ্বিধাবিভক্ত, তার নিষ্পেষণে মানুষের চিত্তবৃত্তিগুলি (বিশেষত, নরনারীর সামাজিক সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট চিত্তবৃত্তিগুলি) সেকালে স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য হারায়নি। কৃষিকর্মে, নৌকর্মে, গ্রাম্য সমাজের বহু বৃত্তিতেই নর ও নারী কাজ করত সমতালে, তাদের মেলামেশায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল কমই। অনুমান করতে পারি সেকালে প্রেমের নিগড়ে আবদ্ধ হত বহু তরুণ তরুণী, অনেকে হয়তো গান বাঁধত, পালাগান অথবা গীত, আর সে-গানের মাধ্যমে প্রকাশ করত আপন প্রেমানুভূতি। আরো অনুমান হয় সে-প্রেম ছিল ঘরোয়া প্রেম, সাধারণ মানুষ মানুষীর প্রেম। কোনো উত্তুঙ্গ Amor Intellectualis Dei নয়, যে-নির্বস্তুক প্রেমের ধারণায় চিত্তবৃত্তি চলে যায় জড়জগতের অতীত কোনো মনোনির্ভর রাজ্যে সে-প্রেম নয়, বরঞ্চ প্রত্যক্ষ প্রিয় বা প্রিয়ার সদেহী প্রেমই অহৃক্ষণ যে-প্রেমের কাম্য, যে প্রেম "বিবাহের চেয়ে বড়ো" নয়, বরঞ্চ বিবাহে ও গার্হস্থ্যধর্মে আবিষ্কার করে প্রেমের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক পরিণতি, যে-প্রেম প্রিয়তম বা প্রিয়তমার সঙ্গে সুখনীড় রচনার কল্পনায় বর্ণাঢ্য, সেই কখনো সলজ্জ সঙ্কুচিত ভীরু মৃদুবাক্, কখনো উচ্ছ্বসিত বলিষ্ঠ কথনবিলাসী প্রেম, সে-কালের বাঙলা সমাজে অজ্ঞাত ছিল এমন অনুমান হয় না কেননা সে-প্রেমের রেশ বাজে বৈষ্ণবোত্তর প্রেমকাব্যে, পল্লীকাব্যে, আজ অবধি।

সেকালের প্রেমকাব্যের উদাহরণ যদিচ সাহিত্যের ইতিহাসে পাই না, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি সেকালের সামাজিক ইতিহাস ও আধুনিক কাব্য-প্রকৃতির তুলনাত্মক আলোচনায়।

এই ঘরোয়া প্রেমের সঙ্গে অবশ্য অনেক সময় মিশেছে sophisticated বা নাগরিক প্রেম। সংস্কৃত প্রেমকাব্যের প্রভাব নিশ্চয় সেকালেও আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল। কালক্রমে সম্ভবত বাঙলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে (অন্যান্য অনেক সাহিত্যের বেলায়ও তাই) দেখা দিল শ্রেণীচেতনাজনিত এক দ্বৈততা, সাহিত্যের ও লোকসাহিত্যের, বর্ণসাহিত্যের ও নির্বর্ণসাহিত্যের দ্বৈততা। রবীন্দ্রনাথে ও ভাটিয়ালির অখ্যাতনামা রচয়িতায় যে-পার্থক্য সে-পার্থক্যই সাহিত্যে ও লোকসাহিত্যে। যাকে বলি সাহিত্য, নানা কারণে তা' নাগর সভ্যতায় গ্রাহ্য ও লিপিবদ্ধ হয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে এসেছে আমাদের কাছে, ইতিহাসে তার স্থান নির্দেশিত। যাকে বলি লোকসাহিত্য তা' জন্ম নিয়েছে, বেড়ে উঠেছে, শক্তি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে দূরে। তা' প্রচলিত হয়েছে লোকমুখ থেকে লোকমুখে কিন্তু অধিক স্থলেই তা' লিপিবদ্ধ হয়নি কেননা কবিগণ ও শ্রোতাগণ লেখনব্যাপারে ছিলেন সমান রকমে অপারগ। কালের কৃষ্ণচ্ছায়া থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত এই লোকসাহিত্যের যে-সামান্য অংশ আমাদের কাল অবধি পৌঁছেছে তা' থেকে প্রাচীন প্রেমকাব্যের ধারা সম্বন্ধে কিছু আনুমানিক ধারণা করা সম্ভব। সে-প্রেমের ধারা স্নিগ্ধ, নম্র, অনুগ্র, সে-প্রেম বাংলার গ্রামীণ জীবনের পরিবেশের সঙ্গে একান্তে মিশ্রিত, যে-পরিবেশ এক হিসাবে বড়ই অবিচিত্র অথচ বাঙালীর পক্ষে তার আকর্ষণ ও নবত্ব নিরবশেষ, সে-প্রেম ঘর বাঁধার অভিলাষী, ঘর ভাঙে না; সে-প্রেম বিরহ, ব্যর্থতা, বিনাশ নিয়ে আসতে পারে কিন্তু আত্মায় জ্বালা ধরায় না। এ-প্রেমের আভাস পাওয়া যায় মৈমনসিংহ গীতিকায়, কোনো কোনো মঙ্গল-কাব্যে, ঠাকুরমা ঠাকুরদার গল্পে।

প্রেমের অভিব্যক্তি সাধারণ লোকচিত্তে যেমন হয়েছিল, সমাজের উচ্চ-স্তরের সংস্কৃত চিত্তে তেমনটি হয়নি বলেই মনে হয়, যখন লোকসাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণব-কাব্যের তুলনা করি। লোককাব্যের প্রেম দেহ-সমুখ কিন্তু দেহ-সর্বস্ব ছিল না, কিন্তু যেটুকু দেহচেতনা লোককাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, মনে হয় মার্জিতকাব্যে সেটুকু প্রকাশ সম্বন্ধেও কবিরা কোনো প্রকার নিষেধ

সচরাচর বোধ করতেন। ব্যক্তিগত প্রেম প্রকাশ সম্বন্ধে যেন একটা খুঁতখুঁতি, একটা বাধা বোধ করতেন মার্জিত কবি। এই নিষেধজ্ঞান কোনো সামাজিক কারণে অথবা ধর্মীয় কারণে নিহিত কিনা, অথবা তদানীন্তন নন্দন-চেতনার সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল কিনা বলা আমার সাধ্য নয় কিন্তু মনে হয় এরকম কোনো নিষেধজ্ঞানের বশবর্তী হয়েই ষোল শতক ও তৎপরবর্তী কালের অগণিত কবি সরাসরি ব্যক্তিগত প্রেমকাব্য রচনায় নিযুক্ত না হয়ে আপন প্রেমানুভূতি প্রকাশের জন্য অবলম্বন করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান। কৃষ্ণ-ভক্তি অবশ্য হিন্দুধর্মের গভীর ও ব্যাপক তত্ত্ব। সে-তত্ত্বের আধ্যাত্মিক সংকেত ও ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক কাব্য রচিত হয়েছে, হিন্দী সাহিত্যে, বাঙলাতেও। এ-কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ পাওয়া যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনে, আর এ-ও লক্ষ্য করি যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাব্য ছাড়া যেন অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য প্রেমকাব্য তখনকার দিনের মার্জিত সাহিত্যে ছিল না। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম মার্জিত সাহিত্য থেকে উপচে পড়েছিল লোকসাহিত্যেও। বাঁশি-বাজানো কালিয়ার মোহ নিয়ে গান বেঁধেছিল অনেক অজ্ঞাত কবি—হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। অনুমান হয় যে বৈষ্ণবকাব্যে ধর্মীয় তত্ত্বটা সব সময়ে কবির কাছে (পাঠকের কাছেও) সে-পরিমাণে মুখ্য ছিল না যে-পরিমাণে ছিল তার মানবিক প্রেমলীলার আবেদন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনীতে মিলল বাঙালীর প্রেমভাবনার ধ্রুব রূপক। স্ব-নামে, স্ব-রূপে যে-প্রেম ব্যক্ত হয়নি, তার নিষেধশঙ্কাহীন প্রকাশ পেলাম এই সর্বজনগ্রাহ্য রূপকে। দেবতার প্রেম আসলে হল মানুষ-মানুষীর প্রেম। আর বৈষ্ণবযুগের নব্যন্যায়শিক্ষিত, বিশ্লেষণপটু, রসশাস্ত্রবেত্তা, মার্জিত কবি নরনারীর প্রেমের কত না সূক্ষ্ম ও সুকুমার রূপের সন্ধান পেলেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমে! প্রেমের আনন্দ ও বেদনার, মিলন ও বিরহের, অভিমান ও সমর্পণের কত ভাগ ও অনুভাগ, কত মিশ্র অনুভূতি, ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করল! সুনির্ধারিত হল কোন্ কোন্ পরিবেশে সে-সব প্রেমাচরণ সমুচিত! প্রেমাভিব্যক্তির বৃহত্তম'ও জটিলতম convention সৃষ্ট হল বাঙালীর কীর্তনসঙ্গীতে। প্রেমকাব্যের এত পরিমার্জন ও নিয়ন্ত্রণ, এমন বহুপল্লব প্রকাশ ইওরোপের মধ্যযুগীয় কাব্যেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, আমি অন্তত পাইনি "রোমান্ দ্য লা রোজ"-এ অথবা পেত্রার্কের কাব্যে।

আমার মনে হয় বাংলা প্রেম কাব্যে দুটি সুস্পষ্ট ধারা। একটিকে বলি সহজ ঘরোয়া প্রেম, অপরটি অতি সচেতন, পরিমার্জিত, রূপকপরায়ণ, নাগর প্রেম। দেহপ্রবল প্রণয়ের যে-প্রকাশ ভারতচন্দ্রে, তাতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যতটা উপস্থিত সহজ প্রেমধারার প্রভাব সম্ভবত তার চেয়ে কম নয়, আর অবশ্য প্রবল তো ছিলই তদানীন্তন সামাজিক আচরণ ও রুচির প্রভাব। উনিশ শতকে ভব্যসাহিত্যের রুচি ও গতি বদলালো অনেক পরিমাণে। নবলব্ধ ইংরেজি শিক্ষায় মার্জিতরুচি কাব্যানুরাগী পাঠক লোকসাহিত্য সম্বন্ধে বোধ করলেন উন্নাসিক অবজ্ঞা, লোকসাহিত্য দরিদ্র কুটুম্বের মতো দিনযাপন করতে লাগল সাহিত্যের ইমারতের এক অন্ধকার কুঠরিতে। ঈভাঞ্জেলবাদী খ্রীষ্টধর্মের ও বাঙালী ব্রাহ্মধর্মের অতিনৈতিক প্রভাবে প্রেমকাব্য সম্বন্ধে ইংরেজিনবিশ পাঠকের শুচিতা ও সঙ্কোচ বাড়ল প্রচণ্ড রকমে। সমসাময়িক ইংরেজি কাব্য থেকেও তেমন কোনো সাহায্য পাননি বাঙালী কবি। মনে রাখতে হবে যে উনিশ শতকে কীট্‌স্, রোসেটি ও স্যুইনবর্ণ ছাড়া অন্য সব ইংরেজ কবির প্রেমকাব্য দেহচেতনা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, সঙ্কুচিত, নির্লিপ্ত। শেলির প্রেম বিদেহী, ভাবলোকবাসী। কীট্‌স্ সম্বন্ধে আধুনিক মূল্যায়ন তখন বলবৎ ছিল না ; একথা রোসেটি সম্বন্ধেও খাটে। টেনিসনের প্রেম সুশ্লীল কিন্তু রক্তাল্পতায় পীড়িত। উনিশ শতকের বাঙালী যে ব্রাউনিং বা রোসেটির কাব্য বিশেষ পড়তেন তেমন মনে হয় না। সে যাই হোক, এমন অনুমান সম্ভবত অসঙ্গত হবে না যে সদ্যোলব্ধ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সে যুগে প্রেমকাব্য সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর চিত্ত ছিল শুচিতাক্লিষ্ট ও অনাগ্রহী। বাঙালী তখন মিল্ ও স্পেন্‌সার্, কোঁৎ ও কার্লাইল্, রাস্‌কিন ও জর্জ এলিয়ট প্রভৃতির বিশিষ্ট চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত, অতি "সীরিয়াস্"-মনস্ক গ্রন্থোৎসাহী বাঁধা পড়েন না প্রেমকাব্যের লঘু ও চপল মায়ায়। বস্তুত উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে প্রেমের স্থান মহৎ ও স্মরণীয় নয়। বিহারীলাল থেকে প্রেম আবার পেল সার্থক ও বরণীয় কাব্যবিষয়ের মর্যাদা, সে মর্যাদা আরো ঘনীভূত হল, মহত্তর হল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। প্রেমকাব্যের আবার এক ধারা বেড়ে উঠল বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। এ-ধারা প্রধানত ভাববিলাসী, সচরাচর দেহচেতনা ও জড়জাগতিক স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে, যদিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তীব্র আবেগশীল, দেহচেতন, অলজ্জ প্রেম আদৌ অনুপস্থিত নয়। এ-প্রেমবোধ

বৈষ্ণব-কাব্যের মতো রূপকপরায়ণ বক্রার্থ-নির্ভর নয় বটে, এ-কাব্যের প্রিয় বা প্রিয়তমা মানুষ মানুষী বটে, মানুষের বেশে দেবদেবী নয়, কিন্তু তবুও এ-কাব্যে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ তথ্য এড়িয়ে, প্রধানত প্রেমের ভাবরাজি নিয়ে, ব্যস্ত থাকার নিরন্তর প্রয়াস লক্ষ্য করি। উচ্ছ্বাস ও আবেগের সূক্ষ্মতা, তীব্রতা, নিবিড়তা, প্রাবল্য, সবই পাওয়া যায় প্রেমকাব্যের এই ধারায়, অনুভূতির এত সুকুমার শিল্পরূপ অন্য প্রেমকাব্যে বিরল বটে, তবুও বলতে হয় যে এ-কাব্যের প্রেমে অবয়বতার (concreteness) অভাব। এ-প্রেমাবেগ উচ্ছ্রিত হচ্ছে শরীরী প্রিয় বা প্রিয়ার জন্য নয়, ভাবলোকবাসী প্রেমের জন্য, মানসসুন্দরীর জন্য। এ-নিরবয়ব প্রেম কয়েক দশকের জন্য বাঙলা কাব্যের প্রধান প্রেমবস্তু হয়ে উঠল, পূর্ববঙ্গীয় কবি গোবিন্দদাসের প্রত্যক্ষ অবয়বী প্রেম কোনোরকম প্রতিযোগিতা করতে পারল না এর সঙ্গে, হয়তো যেহেতু রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর করণকৌশল, তাঁর ভাষা রীতিমতো অপকৃষ্ট অথবা যেহেতু তাঁর সাবয়ব প্রেমে তৎকালীন সাহিত্যিক রুচি সন্তুষ্ট হয়নি।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রেমকাব্যের ধারা কোন্ পথে চলল? বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই রবীন্দ্রোত্তর যুগবাসী, তাঁর শেষ দশ বারো বছরের কাব্যে তিনি স্বয়ংই রবীন্দ্রভাব থেকে মুক্ত কেননা প্রায় সপ্ততিবর্ষবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ স্বীয় দীর্ঘ-অনুসৃত সাহিত্যধারায় যে নূতন মোড় দিলেন তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও মিলবে বলে মনে হয় না। "মহুয়া"-তে বাংলা প্রেম-কাব্যের এক আশ্চর্য নূতন বিকাশ ও পর্যায়। প্রেম এখন সাবয়ব। প্রেমিকা এখন ভাবলোকবাসিনী মানসসুন্দরী নয়, মর্ত্যের স্পর্শসাধ্যা নারী, প্রেমানুভূতি এখন উচ্ছ্বাসের চেয়েও বড়ো, এখন ইন্দ্রিয়াধিগম্য। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কাব্য কত পর্যায়ে বিবর্তিত হল সে-এক চিত্তহারী অনুসন্ধান, সে-অনুসন্ধান এখনো হয়নি কিন্তু আশা করছি অচিরেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের শেষের দিককার কবিতা নবীনতর কবিদের কাছে পথিকৃৎ সর্বতোভাবেই। যে-সাবয়বতা, প্রত্যক্ষতা, বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের "পূরবী"-পরবর্তী প্রেমকাব্যে পাই, রবীন্দ্রোত্তর প্রেমকাব্যেও সে সব গুণই বর্তমান যদিও প্রত্যেক কবির হাতে গুণগুলি অল্পবিস্তর বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

রবীন্দ্রোত্তর প্রেমকাব্য, আমার বিবেচনায়, মোটামুটি দু'অংশে ভাগ করা যায় সাল-তারিখের ক্রম অনুসারে। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ, যাঁরা অধুনা প্রবীণ ও অল্পবিস্তর লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁরা উত্তরতিরিশের লেখক। উত্তরতিরিশে (অর্থাৎ "পূরবী"-পরবর্তী দশকে) তাঁরা কবিসভায় আসন গ্রহণ করেন। আর যাঁরা এখনো বয়সে ও কবিকর্মে তরুণ, উত্তরচল্লিশে তাঁদের কবিকৃতির সূত্রপাত। কবি হিসাবে জ্যেষ্ঠতর কবিগণ স্বভাবতই বয়ঃকনিষ্ঠদের চেয়ে উৎকৃষ্ট—স্বকীয় শক্তি ছাড়াও দীর্ঘতর আত্মপ্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা। জ্যেষ্ঠ কবিদের প্রেমকাব্যের যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটি আসলে তাঁদের সমগ্র কাব্যবৈশিষ্ট্যেই নিহিত—এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির প্রয়াস তীক্ষ্ণরূপে আত্মসচেতন। ভাষায়, ছন্দে, বাক্প্রতিমায়, বাক্ভঙ্গীতে এঁরা রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির যে-চেষ্টায় নিরত সে-কঠিন চেষ্টার ক্লেশলক্ষণ এঁদের কাব্যে প্রায়ই লক্ষ্যণীয়, এঁদের প্রথম জীবনের কাব্যে তো বটেই, পরিণত কাব্যেও। এঁদের কয়েক-জনা যে অতীব কুশলী ও শক্তিশালী কবি সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই তবুও এক হিসাবে এঁদের জন্ম-তারিখ গেছে এঁদের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথের মতো মহা প্রতিভাবান কবিকে পেয়ে যে-দেশ ধন্য হয়েছে সে-সৌভাগ্যের জন্য সে-দেশকে কিঞ্চিৎ মূল্য দিতে হবে বৈকি! সাহিত্যের ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে যে মহৎ প্রতিভার তিরোধানের পরে আসে ক্রান্তিকাল, সাহিত্যচিন্তার ও প্রকাশভঙ্গীর অস্থিরতা। নবীন কবিদের প্রধান প্রয়াস ছিল সর্ববিস্তারী পূর্বতন অমোঘ প্রতিভার অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া। নবীন কবিদের এ-প্রয়াসের ফলে নবীনতর কবিগণ চলতে পেরেছেন স্বকীয়তার পথে। যে-ভাবধারা, যে-শিল্পধারা, যে-সাহিত্য-প্রকরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষ-ভাবে সংযুক্ত, সে-ভাব, সে-শিল্প, সে-প্রকরণ উৎকর্ষের উচ্চতম-সম্ভব স্তরে পৌঁছেছিল রবীন্দ্রসাহিত্যে, তার মধ্যে আরো উচ্চতা অর্জন করা অন্য কারুর সাধ্য ছিল না। এক হিসাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিল্পের কতকগুলি বিশেষ দিক যেন পৌঁছল নিঃশেষিত প্রগতিরুদ্ধ পথে। "সম্মুখে রুধিয়া পথ রবীন্দ্র ঠাকুর"। রবীন্দ্রোত্তর নবীন কবিগণ সে-কথা বুঝতে পেরেছিলেন, সে-কথা বুঝতে পেরেই তাঁরা বেরোলেন নূতন পথের সন্ধানে। নবীন কবিদের মধ্যে যাঁরা জ্যেষ্ঠ, আমার মূল্যায়নে, তাঁদের জনকয়েক নিশ্চয় এ-সন্ধানে কৃতকার্য

হয়েছেন, তবুও তাঁদের প্রয়াসশ্রম ও কৃতি, তাঁদের শক্তি ও সাফল্য, উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান রয়ে গেছে। রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তি তাঁরা পেয়েছেন বটে, অন্তত কিয়দংশে, কিন্তু মুক্তিলাভের চেষ্টায় তাঁরা এক কঠিন অন্তঃসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁরা বেড়ে উঠেছেন যে-রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে, যে-রাবীন্দ্রিক আবহাওয়ায় তাঁদের চিন্তা ও শিল্প পরিপুষ্ট, তা' থেকে নিজেকে অপসারিত করা দুঃসাধ্য ও তীক্ষ্ণরূপে আত্মসচেতন কর্ম তো বটেই, সে-অপসরণের ফলে যে-সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে সে-সাহিত্যে শৈল্পিক সততা ও স্বকীয়তা যে-পরিমাণে প্রশংসনীয়, সৃষ্টির আনন্দ সে-পরিমাণে অনাবিল নয়। রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীর জ্যেষ্ঠদের মধ্যে প্রেমস্পৃহার চেয়ে কারুস্পৃহা অধিকতর মুখ্য। বুদ্ধদেব বসু ছাড়া আর কেউই স্বভাবত বিশুদ্ধ প্রেমকাব্য বড় একটা লেখেন না। রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির অস্বচ্ছন্দ প্রয়াসে এই কবিগোষ্ঠীর কাব্য অনেক সময়ই মিশ্রিত বিষয়পরায়ণ। প্রেমকাব্যেও প্রেমের সঙ্গে তাঁরা মিলিয়ে নেন অন্য বিষয়, যথা, আবেষ্টনী-চেতনা, ইতিহাসবোধ, রাজনৈতিক ধারণা। বিশুদ্ধ অনুভূতি নয়, মননমিশ্রিত অনুভূতি এঁদের শিল্পবিষয়।

এই নিত্য সচেতন, প্রয়াসপীড়িত কাব্যের সুফল ভোগ করেছেন নবীনতর কবিরা, যাঁরা ১৯৪০-এর পরে কবিতা লিখেছেন। এঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য দেখেছেন কিঞ্চিৎ দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, এঁদের রবীন্দ্রভক্তি জ্যেষ্ঠদের মতো না আবেগবিহ্বল না শ্লেষবিকৃত, রবীন্দ্রপ্রভাব এঁদের কাছে নাগপাশ নয়, উদ্দীপক পূর্বদৃষ্টান্ত। বাংলা কাব্যের যে-ঐতিহ্য এঁদের কাছে পোঁছেছে তা'তে রবীন্দ্রনাথ শেষ অধ্যায় নন, তাঁর পরেও আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতি। এঁদের কাব্য যে রবীন্দ্রপ্রভাবপীড়িত নয় সেজন্য, আশা করি, জ্যেষ্ঠদের কাছে এঁরা কৃতজ্ঞ। কাব্যকরণের অনেক কৌশল এঁদের শিখতে হয়েছে এখনো রচনা-নিরত পূর্বসূরীদের কাছে, কাব্যের শিল্পরূপ ও গঠনকারুর জন্য এঁরা প্রায়ই জ্যেষ্ঠদের কাছে ঋণী। কবিকৃতিত্বে এঁদের অপ্রবীণতা ঘুচবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, কিন্তু যতদিন শিল্পপ্রবীণতা তাঁদের আয়ত্ত না হচ্ছে ততদিন ও, আমার বিবেচনায় তাঁদের প্রেমকাব্যের আকর্ষণী শক্তি প্রচুর থাকবে। সে-আকর্ষণের উদ্ভব তাঁদের স্বাধীন, অন্তর্নিষেধ থেকে মুক্ত প্রেমানুভূতিতে। বিগত চল্লিশ বছরে যে কয়েকজন বয়ঃকনিষ্ঠ নবীন কবি

প্রেম-কাব্য লিখছেন তাঁদের সম্বন্ধে আমার এই অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উক্তির চেয়ে বিস্তৃততর ও যোগ্যতর বিশ্লেষণ ও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ও সমুচিত।*

* দ্রষ্টব্য : প্রথম প্রকাশ কালে এই প্রবন্ধটি একটি দীর্ঘতর প্রবন্ধের অংশ ছিল। দীর্ঘ প্রবন্ধটি ছিল "পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা" (সম্পাদক, আবু সয়ীদ আইয়ুব) গ্রন্থের সমীক্ষা। ঐ সমীক্ষার প্রায় অর্ধেক অংশ বর্জন করেছি (যদিও ঐ অংশে বিধৃত মতামত আমার আদৌ বদলায়নি) কেননা ঐ অংশে সাহিত্যতাত্ত্বিক চিন্তা প্রবল নয়। বরং যে অংশে নিছক গ্রন্থ সমীক্ষার চেয়েও ব্যাপকতর ও অধিকতর স্থায়ী চিন্তা নিবদ্ধ হয়েছে সেই অংশটুকু এখানে পুনঃপ্রকাশিত হল। মূল প্রবন্ধটি ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

"বাঙলার কাব্য"

(১)

হুমায়ুন কবিরের "বাঙলার কাব্য" নামক বইখানা নানা কারণে চল্তি সাহিত্যের বিশেষ অনুধাবনযোগ্য গ্রন্থ। কবির একদা মেধাবী ছাত্র, পরে কৃতী শিক্ষক ও প্রগতিনিষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থাপক ছিলেন ; স্বভাষায় ও ইংরেজিতে কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা ; অধুনা রাজনৈতিক ও শাসনকর্মী জগতে প্রতিষ্ঠাপন্ন ও ভবিষ্যতে আরো প্রতিষ্ঠাসম্ভব ব্যক্তি ; বর্তমান বাঙলার মধ্যবয়সী পুরুষপর্য্যায়ের অগ্রগণ্য মনীষীদের অন্যতম। এসব কারণেই বইখানা অনুধাবনযোগ্য তা বলছি না (যদিও এ কারণগুলো আদৌ তুচ্ছ নয়), বইখানা স্বগৌরবেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেননা বাঙলার বহু শতবর্ষব্যাপী কাব্যধারায় বাঙালী মানসের প্যাটার্ণ খোঁজার এমন প্রশংসনীয় প্রয়াস ইতিপূর্বে বেশি হয়নি। লেখকের সাহিত্যিক সংবেদনা ও অনুশীলন নিঃসংশয় ; দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা লব্ধযশ ; বাঙলার জটিল অথচ ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা ও উক্তি মূল্যবান। "সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার কাব্যধারার বিস্ময়কর বিকাশের" পরিচয় দেবার যোগ্যতা যে অল্প কয়েকজন বাঙালীর আছে ব'লে জানি, হুমায়ুন কবির তাঁদের পুরোভাগে, অতএব তাঁর বইখানা যে কোনো চিন্তাশীল বাঙালীর অনুধাবনযোগ্য।

(২)

মানুষের ইতিহাস—বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্টভাবে সমাজের, ধর্মের, সাহিত্যের, শিল্পের, অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস হোক অথবা সমগ্র-সংযুক্ত জীবনের ইতিহাস হোক—সময়চেতন দার্শনিকের চিত্তে দোলা লাগিয়েছে প্রাচীন কাল থেকেই। হেরাক্লিটাস্ থেকে শুরু ক'রে ইব্‌ন্ খাল্‌দুন্, কহ্‌লন, হেগেল, মার্ক্‌স্, স্পেংলার, ক্রোচে, টয়ন্‌বি একই সন্ধানে নিরত—বিভিন্ন ঘটনা-সমাবেশের অন্তর্লীন ঐক্যের বা ছাঁদের সন্ধান। ইতিহাস চক্রবৃত্ত হোক, কম্বুরেখ হোক, প্রবহরেখ হোক, ইতিহাসের একটা মানে আছে, এ-বিশ্বাসে পশ্চিম জগতে আজ শতাধিক বৎসর যাবত বারংবার ঐতিহাসিক

তথ্যের আলোচনা ও পুনরালোচনা হচ্ছে, যেমন সমগ্র ঐতিহাসিক ধারার তেমনি ধর্মীয় সাহিত্যিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারার। শুধু যে প্যাটার্ণ খোঁজা হচ্ছে তেমন নয়, প্রতি যুগ তার মনোমত, তার যুগরুচি-সম্মত প্যাটার্ণ খুঁজেছে পূর্বতন প্যাটার্ণ অস্বীকার ক'রে। কেবলমাত্র সাহিত্যিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেই দেখুন না। ফরাসী মনীষী তঁ্যা বা জুসেরাঁ যে ছাঁদ পেয়েছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের তথ্যাবলীতে, সেইন্ট্‌স্‌বেরি বা লিগুই সে-ছাঁদে আকৃষ্ট হননি, হার্ডিন ক্রেইগ পেয়েছেন অন্য ছাঁদ, ডেইচিস্ খুঁজেছেন আরো অন্য ছাঁদ। মূলত একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও যখন ছাঁদ বা ছক খোঁজা হয়—যেমন সাহিত্যের sociological মূল্যায়ন-জ্ঞান থেকে, যে-মূল্যায়নে হুমায়ুন কবির আস্থা রাখেন ব'লে দেখছি—তখনও ছাঁদের চিত্ররূপ বদলে যায়। মার্ক্‌সীয় বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ক্রিস্‌টোফার কড্‌ওয়েল সাহিত্যের যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, ত্রিশ বছর আগে সে-ব্যাখ্যা খুবই জনপ্রিয় ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু সে-ব্যাখ্যা আজকের মার্ক্‌স্‌পন্থীর কাছেও আর তেমন গ্রাহ্য নয়, বরং এল্ সি নাইট্‌স্-এর অথবা লুকাচ-এর গ্রন্থে অথবা এমন কি মার্কিন ভ্যান্ ওয়াইক্ ব্রুক্‌সের ইতিহাসমালায় অধিকতর গ্রাহ্য প্যাটার্ণ পাওয়া যায়।

সাহিত্যের ইতিহাসে প্যাটার্ণ অথবা নীতি ও গতির ছন্দ নিয়ে আলোচনা পশ্চিম জগতেও খুব বেশি হয়নি। আমি যতদূর জানি, বাঙলাতে আদৌ হয়নি, ভারতীয় অন্য ভাষাতেও হয়েছে ব'লে শুনিনি (যদিও বাঙালী মণীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ইংরেজি রচনায় কিছু মূল্যবান আলোচনা পাওয়া যায়)। প্যাটার্ণের সন্ধানে হুমায়ুন কবির সাহসী অভিযাত্রীর সম্মান পাবেন।

কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কবির বাঙলার কাব্যে ঐতিহাসিক নীতির নিদর্শন খুঁজেছেন ও পেয়েছেন? এ-গ্রন্থে তিনি কী করতে চেয়েছেন?—সে প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর সমস্ত বইখানাতে, তা'ছাড়া সংক্ষিপ্ত নির্দেশ পাই ভূমিকা দু'টিতে :

ক) "সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার কাব্যধারার বিকাশের" পরিচয় দেওয়া যাতে সম্ভব হয়, সেজন্য এই গ্রন্থখানিতে লেখক একটি পশ্চাৎপট তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

খ) "সেই পশ্চাৎপটের অভাবে বাঙলার কাব্যে বাঙালীর মানসের বিকাশ পুরোপুরিভাবে বোঝা যায় না, কারণ **ব্যক্তির মধ্যে সমাজমনের প্রকাশেই কাব্যের জন্ম**।" (স্থূলাক্ষর আমার)

গ) "সামাজিক মানসের প্রকাশ হিসাবে" বাঙলা কাব্যের ইতিহাস কি রকম হওয়া উচিত, সে কাজ কত বিস্তৃত, কত শ্রমসাপেক্ষ গবেষণায় তার ভিত্তি, এমন কি সে-ইতিহাসের মালমশলার ভিত্তি লক্ষ্যসাধ্য, লেখক সে কথা জানেন। নিজের ক্ষুদ্র বইখানার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

ঘ) বাঙলাদেশের দ্বিখণ্ডন সত্ত্বেও "বাঙলা সাহিত্যের অবিচ্ছেদ ও অবিচ্ছেদ্য ধারার" কথা কবির আমাদিগকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আমরা যেন মনে রাখি যে "রাষ্ট্রবিভাগের বাধা-বন্ধন অতিক্রম ক'রে বাঙালীর কাব্য সাধনায় ঐক্য ও ধারাবাহিকতা" বর্তমান।

লেখকের চতুর্থ দফার ধারণা সম্বন্ধে দ্বিমত হবে ব'লে মনে হয় না। পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে কী হবে* জানি না, তা' ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদের পরিণামে দূর ভবিষ্যতে সাহিত্যিক ধারণা ও আদর্শের কোনো প্রচণ্ড বিভেদ ঘটবে কিনা তা-ও জানি না, শুধু একথা জানি যে একই জননীর মর্যাদা রক্ষার্থে পদ্মাপারের বাঙালী সেদিন যে-রক্তাক্ত লাঞ্ছনা বরণ করেছে তা' অতুলনীয় আর পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এখনো যে একই জননী-আনুগত্য বিদ্যমান তা' নিয়ে এপারে বা ওপারে শাসনকর্তারা খুব সোয়াস্তি বোধ করেন না। বাঙলা সাহিত্যের যিনিই অনুধাবক হবেন তাঁকেই বাঙলার সমস্ত আঞ্চলিক লেখা সমন্বিত ক'রে একটা সমগ্র মানসের অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকতে হবে, সে-মানস একই বাঙালী মানস, হোক না তাতে হিন্দু মুস্‌লিম উচ্চ বর্ণ ও পতিত জাতি, পদ্মার এপার আর ওপার— এ হেন প্রভেদের প্রকাশ। কবির সাহেব যখন অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য ধারার কথা বলেছেন তখন তিনি উভয় বাঙলার চিন্তাশীল প্রশস্তমনা সব বাঙালীর বিশ্বাস ও আশার বলিষ্ঠ প্রতিধ্বনি করেছেন এমন দাবী করা অসঙ্গত হবে না।

---

* পাঠক যেন অনুগ্রহ করে' লক্ষ্য করেন যে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ১২ বৎসর পূর্বে।

(৩)

কবির সাহেবের তৃতীয় দফা উক্তি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কাব্য সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা ('ব্যক্তির মধ্যে সমাজমনের প্রকাশেই কাব্যের জন্ম'—ভূমিকা) অথবা কাব্য বিচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ('সাহিত্য বিচারে একমাত্র সামাজিক পশ্চাৎপট নিয়েই আলোচনা চলতে পারে'—৮৯পৃঃ) এই দুই ধারণার সঙ্গেই আমার ধারণার মৌল প্রভেদ। কাব্য বিচারে কবির সাহেবের প্রবেশ পথে অনুসরণ করায় আমি আনন্দ পাই না। পেশাদার সাহিত্য-শিক্ষক হিসাবে 'সামাজিক পশ্চাৎপট' সম্বন্ধে আমাকে অবশ্যই আলোচনা করতে হয় কিন্তু একটি কথা আমি নিজে কখনো ভুলি না আর সে কথাটি আমার শ্রোতাদের সমীপে পেশ করতে কখনো ভুলি না যে পশ্চাৎপট পশ্চাৎপটই, সম্মুখপট নয়। কাব্যের আখেরী বিচারে আমি কাব্যের নিজস্ব মানদণ্ডই প্রয়োগ করব, তাতেই কাব্যের প্রতি সুবিচার করা হবে, কাব্যের পশ্চাৎপটের প্রতিও। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নিয়ে আজ তর্ক তুলব না, আপাতত কবিরের দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নিয়েই আলোচনায় এগনো যাক।

কবির বলছেন : 'সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার কাব্যধারার বিস্ময়কর বিকাশের পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়ার দিন আজো বোধ হয় আসেনি! তার জন্য ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক যে তথ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাও আজ পর্যন্ত অসমাপ্ত।'

অতি সত্য কথা। কবে বঙ্গীয় মণীষী দুঃখ করেছিলেন বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, সেই থেকে আজ অবধি বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাস নিয়ে অনেক অধ্যবসায়ী মূল্যবান আলোকসম্পাতী আলোচনা হয়েছে বটে তবুও আমাদের তথ্যজ্ঞানে অনেক বিভ্রমকারী অভাব এখনো প্রবল আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবায় ইতিহাস ও শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের একক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাঙলার ও বাঙালীর সমগ্র ইতিহাসরেখা আজো অস্পষ্ট। সে-অস্পষ্টতা ঘোচাতে অন্তত আরো দু'তিন পুরুষ-পর্যায়ের শ্রম ও নিষ্ঠার আবশ্যক হবে না কি?

যতখানি ইতিহাস আজ আমাদের জানা আছে সেটা প্রধানত রাজনৈতিক ইতিহাস, রাজা ও লড়াইয়ের কাহিনী। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস কতটুকু আমরা জানি? জানা মানে অনুমাননির্ভর অথবা কুলপঞ্জীগোছের

অনৈতিহাসিক তথ্যসমূহ জানা নয়, বরং বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণসম্বলিত জানা। নৃতাত্ত্বিক মতে বাঙালী অতীব মিশ্রিত জাতি। এই নৃতাত্ত্বিক মিশ্রণের ভিত্তিতে অনেকেই বাঙলার সাংস্কৃতিক মিশ্রণের কথা বলেছেন। হয়তো সে-মিশ্রণের থিওরী মূলত সত্য। আমাদের নিজেদের জীবৎকালের অভিজ্ঞতায় সে-থিওরি যেন সত্য ব'লেই মনে হচ্ছে। কিন্তু সে রকম মনে হওয়া তো অনুমান মাত্র, বৈজ্ঞানিক নিঃসংশয়তা নয়। বাঙালীর ধমনীতে আদিবাসী, আর্য, অনার্য, ফিরিঙ্গীর রক্তসংমিশ্রণ কীভাবে হয়েছিল? কোন্ কোন্ শতকে? কোন্ কোন্ দশকে? বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, অ্যানিমিস্ট্, মুসলমান, খ্রীষ্টান সংমিশ্রিত হয়েছে বাঙালী সমাজে একথা আমরা শুধু শুনিই নি, চোখেও দেখতে পেয়েছি কিছু কিছু, কিন্তু প্রবহমান ইতিহাসে এই সংমিশ্রণের কাল-পারম্পর্য কী? সংমিশ্রণ কি হয়েছিল ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতো, না বহু জলধারার কলোচ্ছ্বসিত সংঘাতে? আদিবাসী ব্রাত্যজাতিগুলি থেকে আধুনিক বাঙালী জাতি কী পরিমাণে সামাজিক ভিত্তির স্থাপনা পেয়েছিল? ডক্টর আম্বেদকার অস্পৃশ্য জাতির উদ্ভবের যে-বিবরণ দিয়েছেন, বাঙলাদেশের পক্ষে সে-বিবরণ কতটা সত্য? বাঙালীর চাষবাস, শিল্পকর্ম, আচার ব্যবহার, আমোদ প্রমোদ, গৃহধর্ম, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহুমুখী দিকগুলি সম্বন্ধে কিছু তথ্য (অনেক ক্ষেত্রে সমসাময়িক সাহিত্য থেকে আহরিত) নীহাররঞ্জন রায়ের ইতিহাসে পাওয়া যায় কিন্তু এই দিকগুলি শতক থেকে শতক পর্যন্ত, দশক থেকে দশক পর্যন্ত, কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে? একই ধারা চলেছে চর্যাপদের আমল থেকে, না তাতে পরিবর্তন সংবর্তন বিবর্তন ঘটেছে? সে বিষয়ে ইতিহাস কোনো আলোকসম্পাত করে কি? ইংরেজি কাব্য যখন পড়ি তখন চসর্-এর সমসময়ে ইংল্যাণ্ডের (বিশেষত পূর্ব মিড্ল্যাণ্ড জেলাগুলিতে) গ্রামীণ জীবন কেমন ছিল (নাগরিক জীবনও) সে বিষয়ে ইংরেজ পণ্ডিতের জ্ঞান কত গভীর তা বোঝা যায়—অনেক শ্রদ্ধেয় পুস্তক থেকে, বিশেষত অধ্যাপক কুল্টন্ ও এইলিন্ পাওয়ার-এর গ্রন্থগুলি থেকে। চসর্-এর "প্রলগ্ টু দি ক্যান্টারবেরি টেইল্স্"-এ যে-সমস্ত নরনারীর কথা পড়ি তাদেরকে সমসাময়িক সত্যিকারের নরনারী ব'লে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন অধ্যাপক ম্যানলি (যদিও অনেকে তাঁর সনাক্ত পুরোপুরি মানেন নি) কারণ তাঁর কাছে চৌদ্দ শতকী ইতিহাসের উপাদান ছিল অজস্র। সাহিত্য-সৃষ্ট চরিত্রের

কথা দূরে থাক, আমাদের সাহিত্য-স্রষ্টাদের কথা আমরা কতটুকু জানি? চর্যাপদের লেখক ছিলেন কারা? তাঁদের পদাবলী সাধারণ্যে কতখানি সমাদর পেয়েছিল? আট দশ শতাব্দী আগেকার কথা ছেড়ে দিলাম, আঠারো শতকের বাঙলার কথা কতটুকু জানি? ইংল্যাণ্ডে বেন্ জন্সন্ ছিলেন শেক্স্পিয়রের সমসাময়িক, তাঁর সম্বন্ধে বই লিখেছেন অধ্যাপক এল্ সি নাইট্স্—সে বইয়ে মিলবে কবিরসাহেবের অনুমোদিত সাহিত্যতত্ত্বের নিদর্শন, অর্থাৎ সামাজিক মানসের প্রকাশ হিসাবে সাহিত্যের মূল্যায়ন। বস্তুত, বইখানার নামও "ড্রামা এণ্ড সোসাইটি ইন্ দি এইজ্ অব জন্সন্"। জন্সনের নাটক পাঠ করতে গিয়ে অনেক পাঠকই লক্ষ্য করেছেন যে অধিকাংশ চরিত্রই অর্থগৃধ্নু, সমস্ত চরিত্রই নাগরিক ও মধ্যবিত্ত, নাট্যোল্লিখিত জগৎ একেবারেই বুর্জোয়া জগৎ। অধ্যাপক নাইট্স্ এই নাটকীয় জগৎ সম্মুখপটে রেখে পশ্চাৎপটের চিত্র তৈরি করেছেন সমকালীন অর্থনীতি ও সমাজনীতির তত্ত্বাবলী থেকে, অসংখ্য সমকালীন রেকর্ড ঘেঁটে। ইংরেজি সাহিত্যের 'সামাজিক' মূল্যায়ন সম্ভব কেননা ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ইতিহাস (শতক থেকে শতক পর্যন্ত, দশক থেকে দশক পর্যন্ত, কখনো কখনো প্রতি বৎসর, প্রতি সপ্তাহ এমন কি দৈনন্দিন ইতিহাস পর্যন্ত) সম্বন্ধে মালমশলার অভাব নেই। অনুরূপ অবস্থা বাঙলায় আছে কি?

উপরে আঠারো শতকী বাঙলার উল্লেখ করেছি। সে-বাঙলার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের এখ্তিয়ারে মোটেই নয়, অধ্যাপক কুল্টন্ অথবা অধ্যাপক নাইট্সের নির্বাচিত ইংরেজি সাহিত্যের যুগ সম্বন্ধে যে-পরিমাণ তথ্য তাঁদের এখ্তিয়ারে তার তুলনায় কিছুই নয়। ভারতচন্দ্রের যুগে কবির সাহেব দেখছেন 'রাজসভার ভোগবিলাসের আবহাওয়া', সমাজজীবনের মন্দা, 'অবনতিপ্রবণ সমাজের বিকৃত রুচি' ইত্যাদি (৩৯ পৃঃ)। হ'তে পারে ভারতচন্দ্রের কালে বর্ধমান রাজসভায় ভোগবিলাস ও বিকৃত রুচির প্রাদুর্ভাব ছিল, কিন্তু বস্তুতই ছিল যে তার কতটুকু ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ আমাদের করায়ত্ত? "বিদ্যাসুন্দর" গ্রন্থখানা-ই প্রমাণ নয় কি? কিন্তু "বিদ্যাসুন্দর" তো সাহিত্যিক কন্ভেন্শন্, আর ভারতচন্দ্রের লেখা "অন্নদামঙ্গলে" না আছে রাজসভার ভোগবিলাস, না আছে অবনতিপ্রবণ সমাজের বিকৃত রুচি। যে-বিশ্লেষক "বিদ্যাসুন্দরের" প্রমাণে ভারতচন্দ্রের

যুগে অবনতিপ্রবণতা দেখেন তিনি সিদ্ধান্ত থেকে প্রমাণে যাচ্ছেন না কি ? (আমি সে যুগ সম্বন্ধে ওকালতি করছি না। পূর্বেই বলেছি সে-যুগ বিকৃত হ'তে কোনো বাধা দেখছি না। আমার কথা যে সুষ্ঠু বিশ্লেষণান্বিত ঐতিহাসিক আলোচনায়—যদি সে-আলোচনা অনুমাননির্ভর না হ'য়ে প্রমাণনির্ভর হ'তে চায়—**ঐতিহাসিক, ডকুমেণ্টারি** প্রমাণ আবশ্যক।) আঠারো শতকের বাঙলার কথা মানে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের কথা, সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্রবৃহৎ দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত-উদ্যম-বিরতি ইত্যাদির কথা। সে কথা কোথায় পাব ? মনে পড়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের জনৈক প্রখ্যাতনামা অধ্যাপককে যখন বছর পনেরো আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে 'অন্নদামঙ্গলে'' চিত্রিত সমাজের সমর্থনকারী অনুরূপ চিত্র সমসাময়িক ডকুমেণ্টগুলিতে কতটা পাওয়া যায় (যেমন অ্যাডিসন্ বা পোপ্ এর রচনার সমর্থন পাওয়া যায় ইতিহাসে অথবা হম্ফ্রি হাউসের লেখা "দিস্ ডিকন্স্ ওয়র্ল্ড্" নামক গ্রন্থে ডিক্সের উপন্যাসাবলীর সঙ্গে সমকালীন সামাজিক অবস্থার অনুরূপতা সপ্রমাণ হয়েছে), তিনি বলেছিলেন ব্যাপারটা যেন থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়, অর্থাৎ ইতিহাসবিদ্ সমাজচিত্রের জন্য অথরিটি মানেন ভারতচন্দ্রকে আবার ভারতচন্দ্রের ব্যাখ্যাকার সেই পরাশ্রয়ী ইতিহাসবিদেরই শরণাপন্ন হন!

আমার এসব কথা বলার উদ্দেশ্য কবির সাহেবের উক্তির সমর্থন করা যে বাঙলার ভৌগোলিক ঐতিহাসিক সামাজিক তথ্য-সঞ্চয় আজো অসমাপ্ত। যে-তথ্যপ্রাচুর্যের সাহায্যে ইংরেজ অথবা ফরাসী সমালোচক ইংরেজি বা ফরাসী কাব্যের সঙ্গে ইংরেজি বা ফরাসী সমাজমনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারেন, সে-তথ্যপ্রাচুর্য বাঙালী সমালোচকের আয়ত্তে নেই। তথ্যপ্রাচুর্য নেই বলা-ও ঠিক নয়, তথ্যের রুদ্ধশ্বাস দৈন্যই বরং দেখতে পাই। বিশেষত সামাজিক ইতিহাসে। বরাবর শুনে আসছি বাঙালী বর্ণহিন্দুর জীবন নাকি বল্লালী নিয়মে বাঁধা। বল্লালী আমলের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সে যুগের চিন্তাধারার ও সাহিত্যিক আদর্শের সংযোগ লক্ষ্য করেছেন কবির সাহেব (২৭, ২৯ পৃঃ ও অন্যত্র)। কিন্তু বল্লাল সেন কে ছিলেন, কবে ছিলেন, কোথায় ছিলেন? কেন কোন্ সামাজিক পরিস্থিতিতে তিনি কুলীন—অকুলীনের, জলচল—জল-অচলের আঁটঘাট বাঁধতে গেলেন, সে-বাঁধন কি

বাঙালী হিন্দুসমাজ নির্বিবাদে মেনে নিল, নিলে কেন নিল, না নিয়ে থাকলে কোনো সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল কি?—উত্তর, আমরা জানি না।

আরেক ক্ষেত্রের কথা ভাবুন। বাঙলায়, বিশেষত পূর্ব বাঙলায়, মুসলমান ধর্মাবলম্বী অপরাপর ধর্মাবলম্বীর তুলনায় সংখ্যাধিক একথা কারুর অবিদিত নেই। এ-ঘটনার সাহিত্যিক তাৎপর্য আছে বলে কবির সাহেব মনে করেন, তিনি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী ও মুস্‌লিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর উল্লেখ করেছেন বহুবার। তাৎপর্য আছে ঠিক কিন্তু কি ভাবে এই সংখ্যাধিক্য হ'ল? কবির সাহেব যেন মনে করেন প্রাচীন বাঙলার নির্বল ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধসমাজ সহজেই আত্মসমর্পণ করল তারুণ্য-বলিষ্ঠ ইসলামের বিপ্লবী আহ্বানের কাছে। খুবই সম্ভব সে কথা সত্য, কিন্তু এই আত্মসমর্পণ কি বৈশাখী ঝড়ের মতো সংহত সময়াবদ্ধ না শ্রাবণের ধারার মতো দীর্ঘকাল-বিস্তৃত? যাঁরা আত্মসমর্পণ ক'রেছিলেন তাঁদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক মর্যাদা ও অবস্থা কি ধরনের ছিল? একত্র বহুজনে মিলে (হয়তো একই গ্রামের অথবা একই গোষ্ঠীর সবাই মিলে) ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে তাঁদের মানসমূল কি অপরিবর্তিত র'য়ে গেল? অথবা নূতন প্রত্যয়ের বিপ্লবী অভিসংঘাতে যদি তাঁদের চিত্ত শিহরিত রূপান্তরিত হ'য়ে থাকে তাহলে সে-রূপান্তর কতটা তাৎক্ষণিক অথবা কতটা বদ্ধমূল? কতকাল ধ'রে বাঙালীর এই মানস পরিবর্তন চলেছে? হিন্দুধর্মের উপরে ইসলামের অভিসংঘাত এবং কালক্রমে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সহ-অস্তিত্ব সম্বন্ধে কবির সাহেব কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য মূল্যবান কথা বলেছেন, সে-সব সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার আমার নেই কিন্তু যখন ২, ৩ ও ৪ অধ্যায়ে উক্ত অভি-সংঘাতের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাঙলা কাব্যের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন তখন আমি ক্লিষ্ট অতৃপ্তি বোধ করেছি। তাঁর হাইপথিসিস্‌গুলি খুবই প্রণিধানযোগ্য তবুও আমার বিনীত বিবেচনায় সেগুলি বিস্তৃততর তথ্যপঞ্জীর অভাবে আপাতত আপ্তবাক্যে পর্যবসিত হয়েছে আর সে জন্যই সাহিত্য-বিচারে সেগুলি অগ্রহণীয়।

পূর্বেই বলেছি কাব্যপাঠে কবিরের ও আমার প্রবেশপথ এক নয়। কিন্তু যদি কবিরের প্রবেশপথ অনুসরণ করতেই হয় অর্থাৎ সামাজিক মানসের প্রকাশ হিসাবে বাঙলা কাব্যের আলোচনা করতেই হয় তাহলে সে-কার্যের

দুরূহতা সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। যেখানে কাব্যবিচারে রসরুচি বড় কথা সেখানে আপ্তবাক্য খুব চলে। আমি বলছি এ-কবিতাটি চমৎকার (অথবা এ-কবিতাটির মূল্য এ-হেন), মানতে চাও মানো, না মানো তো আড়ি—রুচিবিদ্ এমন কথা বলে' স্বচ্ছন্দে থামতে পারেন। কিন্তু সমাজ ও সাহিত্যের সংযোগ-সন্ধানী সমালোচককে অনেক তথ্য আহরণ করতে হয়, নিরাসক্ত ('ইম্পার্সোনাল') অসঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে সে-সব তথ্যগুলিকে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ফেলে অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। এঙ্গেল্‌স্ বল্‌জাক্-এর ভক্ত ছিলেন যেহেতু বল্‌জাকের লেখায় ছিল তথ্যের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে সত্যের সৌধ। লেনিন্—যাঁর সাহিত্যদৃষ্টি অবশ্যই সমাজচেতন ছিল—বলেছেন The writer's knowledge must not be the superficial knowledge of the dilettante, it must be profound *even as to details*" (ইটালিক্‌স্ আমার)। যদি স্রষ্টার কাছ থেকে এতই প্রত্যাশা করি তাহলে সমালোচকের কাছ থেকে প্রত্যাশা তো আরো করব।

মনে হয় কবির সাহেব has done too much or done too little : যত বৃহৎ, যত জটিল, যত দায়িত্বসম্পন্ন কাজ তিনি হাতে নিয়েছেন—তাঁরই ভাষায় বলি 'সামাজিক মানসের প্রকাশ হিসাবে বাঙলা কাব্যের ইতিহাস আলোচনা'—তার তুলনায় 'এই অসম্পূর্ণ খসড়ার' (এবারেও তাঁরই ভাষা ব্যবহার করছি) প্রস্তুতি শোকাবহরূপে অসম্পূর্ণ ও অগ্রাহ্য। বলতে হবে যে এহেন বৃহৎ ও দুরূহ কাজের জন্য সর্বপ্রকার যোগ্যতা সত্ত্বেও কবিরের মতো লোক যখন অসম্পূর্ণ খসড়াই পেশ করলেন (ব্যক্তিগত যে-কারণেই হোক) তখন যে-কোনো সাহিত্যসাধকের প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ হবে বৈ কি!

অথবা এমনও হতে পারে যে কত প্রকাণ্ড এই কাজ, এ কাজের উপযুক্ত তথ্যসঞ্চয় তাঁর ও আমার পুরুষপর্যায়ে সাধিত হবে না, অথচ তাঁর মনীষায় কতকগুলি প্রশস্ত নীতি আন্দোলিত হচ্ছে প্রকাশের আবেগে, এ-সব কথা বুঝে কবির ঐ নীতি কয়েকটিকে লিপিবদ্ধ করেছেন ভবিষ্যতের উদ্দেশে। হয়তো যেটুকু তথ্য তাঁর আয়ত্তে তারও পরিমাণ কম নয় কিন্তু সময়াভাবে অথবা অন্য কারণে তিনি তথ্যের চেয়ে প্রশস্ত নীতিকেই বড়ো বিবেচনা

করেছেন। তার ফলে আমা হেন পাঠকের প্রশ্নাকীর্ণ চিত্তে ক্রমাগত সংশয় জাগা অনিবার্য।

(৪)

সংশয় আমার জেগেছে অনেক ক্ষেত্রে। তার মধ্যে অল্প কয়েকটি এখানে পেশ করব।

(ক) কবির বলেছেন: 'শঙ্করের মায়াবাদ ও ব্রহ্মের ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টার তীব্রতার মধ্যেও ইসলামের উন্মাদনা কার্যকরী, একথা মনে করা অন্যায় হবে না। শঙ্করের জীবনের ইতিহাসেও বোধ হয় তার আভাস খুঁজে পাওয়া যায়।' (২৬ পৃঃ)

অতিশয় অনভ্যস্ত মত, তবে সম্ভবত যে হেতু ভারতের বর্তমান শাসনকারকগণ ভারতীয় জীবনের সর্বত্র mosaic pattern খুঁজতে সচেষ্ট সেজন্য শঙ্কর দর্শনে ইসলামী প্রভাব দেখতে পাওয়া খুবই যুগ-সম্মত। সদ্যোপ্রকাশিত *An Outline of the Cultural History of India* (সৈয়দ আবদুল লতিফ সম্পাদিত) গ্রন্থখানিতেও দেখতে পাচ্ছি অধ্যাপক সিদ্দিকী শঙ্কর ও রামানুজ সম্বন্ধে কবিরের অনুরূপ কথা বলেছেন যে মধ্যযুগীয় উক্ত চিন্তানায়ক দুজনেই ইসলামী প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

শঙ্কর অথবা রামানুজের চিন্তায় ইসলামী চিন্তার প্রভাব পড়েছিল কিনা সে কথা আলোচনার শক্তি আমার নেই যদিও না ব'লে পারছি না যে নিয়ত প্রভাব সন্ধান দুর্বল চিন্তাধারার পরিপোষক। মানুষ অপর শক্তিদ্বারা প্রভাবিত হয় সে কথা ঠিক, আবার তার স্বসমুত্থ শক্তিতেও সে মহিমান্বিত। যে-কথা হাজার বছর আগে চীনদেশে কেউ বলেছিলেন সে-কথা আমিও আজ ভাবতে পারি, বলতে পারি, চীনের পূর্বসূরী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেও। খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম এগুলি কোটি কোটি জনগণের উপরে এই কারণেই প্রবল ও গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে যে এ সমস্ত ধর্মের চৌহদ্দির মধ্যেই বস্তুত সমগ্র মানবজাতির চিন্তাধারার প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। কোনো কোনো বিশেষ চিন্তাধারায় হয়তো ধর্মবিশেষের প্রবল প্রবণতা প্রকট কিন্তু যত সব উল্লেখযোগ্য ভাবনাধারা মানুষের পক্ষে সম্ভব তার সবারই কিছু কিছু এসব ধর্মে স্থান পেয়েছে। সে জন্যই এসব ধর্ম বিশ্বজনীন, শুধু কপিলবস্তুর অথবা

বেথলেহেমের অথবা মক্কা মদিনার অথবা কাশী বৃন্দাবনের ধর্ম নয়। এসব ধর্মের স্থিতিস্থাপকতা যেন অনবশেষ। অতএব যে-ঐক্যের প্রত্যয়, ভ্রাতৃত্বের ধারণা, সংসারমুখিতা, যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, মানব মহিমায় বিশ্বাস ও দৈনন্দিন জীবনে মুক্তি-কামনা ইসলামের বৈশিষ্ট্য ব'লে কবির সাহেব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, সন্দেহ নেই সে-সব প্রত্যয় ও প্রবণতা ইসলামের প্রত্যক্ষ ও সর্বজনগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এ ভাবলে ভুল এবং অন্যায় হবে যে অপরাপর ধর্মীয় সমাজে এ সমস্ত প্রত্যয় ও প্রবণতা আদৌ অজ্ঞাত। খ্রীষ্টধর্মে, হিন্দুশাস্ত্রে, বৌদ্ধগ্রন্থে এ সমস্ত প্রত্যয় গৃহীত যদিচ সেখানে এদের ঝোঁক ইসলামের অনুরূপ না-ও হ'তে পারে। যে সন্ন্যাসবাদিতা কবির সাহেব হিন্দুদের মধ্যে প্রবল ব'লে লক্ষ্য করেছেন, খ্রীষ্টধর্মে ও ইসলামে তা মোটেই অপরিচিত নয়।

অতএব সুস্পষ্ট নির্বিধ প্রমাণ না পেলে আমি চিন্তার ক্ষেত্রে প্রভাব আবিষ্কারের চেয়ে—Influence of so-and-so on so-and-so বার করার চেয়ে—স্বসমুথতায় বিশ্বাসের অধিক পক্ষপাতী। শঙ্কর বা রামানুজের ধীশক্তি কি নিজস্ব চিন্তাধারায় পৌঁছবার মতো উপযুক্ত ছিল না? তা ছাড়া ব্রহ্মের ঐক্যে যে-প্রত্যয় তা কি উপনিষদের 'একম্ সদ্‌বিপ্রং বহুধা' বদন্তি' এই শ্লোকে এবং অন্যান্য শ্লোকে মহৎ ঐতিহ্য খুঁজে পায়নি?

শঙ্কর ও ইসলামের যোগাযোগ সম্বন্ধে কবির সাহেব নিজেও যেন খুব আস্থাবান নন। তিনি বলছেন:—

> শঙ্করবেদান্তের উপর ইসলামের প্রভাব নিয়ে মতভেদের প্রচুর অবকাশ রয়েছে, কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে সে প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে তার মধ্যে সে যুগের কাব্য বিকাশের অন্যতম কারণ খুঁজেছি। (ভূমিকা)

এখানেই আমার অসুবিধা। কবির যদি জানেন যে মতভেদের প্রচুর অবকাশ আছে তাহলে তেমন বহুধাসঙ্কুল অস্থিতপ্রকৃতি ধারণার ভিত্তিতে কাব্য বিকাশের কারণ খোঁজা সমীচীন হয়েছে কি? সে-ভিত্তি তো দুর্বল ভিত্তি! আর মতভেদ সত্ত্বেও যদি কবির ইসলামের প্রভাবে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, বেশ কথা, কিন্তু সে-বিশ্বাস কাব্য ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করার আগে যুক্তিদ্বারা বিশ্বাসটিকে সুপ্রতিষ্ঠ করা সঙ্গত ছিল না কি?

(৫)

(খ) কবির বলছেন: 'রামায়ণ মহাভারতের বিপুল প্রসার ও উদার কাহিনীর মধ্যে বাঙলার মাটির রূপরসগন্ধ দানা বাঁধতে পারেনি, সমগ্র ভারতের ঐতিহ্যের বাহন হিসেবেই তাদের বিশেষ মূল্য।' (৩৮ পৃঃ)

যদি কবির সাহেব এই বলতে চেয়ে থাকেন যে সংস্কৃতের এপিক্ বাঙলায় লেখা হয়নি তাহলে সহজে সেকথা মানব কিন্তু 'বাঙলার মাটির রূপরসগন্ধ' দানা বাঁধতে পারেনি? আমার তো মনে হয় বাঙালী কবি যে সংস্কৃত এপিক্ লিখতে যাননি, বরং সে-এপিকের কাহিনীকে বাঙালীর হাসিকান্নায় জারিত করেছেন, বাঙালীর ভাবনায় স্নিগ্ধ করেছেন, সে-কাহিনীর চরিত্রগুলিকে বাঙালী চরিত্রের prototype-এ রূপান্তরিত করেছেন, তাতেই বাঙলার মাটির রূপরসগন্ধ সপ্রমাণ হয়। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীতে সমগ্র ভারতের ঐতিহ্য তো আছেই কিন্তু বাঙালী কবির হাতে সে-ঐতিহ্য কতটা বঙ্গীয়ত্ব পেয়েছে তার নিঃসংশয় প্রমাণ মেলে যখন রামচরিত-মানসের সঙ্গে কৃত্তিবাস অথবা অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের তুলনা করি।

(গ) কবির কয়েক জায়গাতেই (যথা ৪২-৪৪ পৃষ্ঠায়) বাঙলায় সামন্ত-তন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। এই উপলক্ষে একটি উক্তিতে আমি বিভ্রান্ত বোধ করেছি। কবির বলছেন 'রাজসভার আসন ছিল দিল্লী, তাই দিল্লীর আশপাশে পশ্চিম ও উত্তর ভারতে সামন্ততন্ত্র গড়ে উঠবার সুযোগ ছিল অপেক্ষাকৃত কম।...সামন্ততন্ত্রের বিকাশ বাঙলায় যে ভাবে হয়েছিল, একমাত্র অযোধ্যায় ভিন্ন ভারতবর্ষের আর কোথাও তার তুলনা মেলে না।'

আমি তো জানতাম পুরোদস্তুর সামন্ততন্ত্র—শুধু তার শাসনবিধি নয়, ইওরোপীয় মানদণ্ডে যাকে ফিউডল্ শিভাল্রি বলি তারও পরাকাষ্ঠা—সব চেয়ে বর্ণাঢ্য ও গভীরমূলরূপে প্রকাশ পেয়েছিল রাজস্থানে। এমন কি রাজস্থান ছেড়ে দিয়েও দিল্লীর চারদিকে দু'তিন শত মাইল ব্যাসরেখার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের যে-অকৃপণ প্রকাশ হয়েছিল, সে-সামন্ততন্ত্রের যে-ন্যুব্জপৃষ্ঠ অবশিষ্ট আজো আমি পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে, বুন্দেলখণ্ডে, রোহিলখণ্ডে দেখতে পাই তার তুলনা বাঙলার বুদ্বুদোপম ঘনপরিবর্তনশীল বারো ভুঁইয়ার সামন্ততন্ত্রে ছিল কিনা সন্দেহ।

(ঘ) কবির বলছেন: ইংরেজের রাষ্ট্রিক সাফল্যে যে বাঙালী মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর চোখে তার ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরই প্রথম ধরা পড়বে এটা স্বাভাবিক। ইংরেজ রাজশক্তির সক্রিয় সহায়তায় সৃষ্ট এবং ইওরোপীয় সভ্যতার প্রতিফলিত আলোকে শিক্ষিত বাঙালী মানস তাই সেদিন নির্বিচারে ইওরোপের আদর্শকে গ্রহণ করেছিল।' (৫১-৫২ পৃঃ)

কোন্ কালের কথা কবির বলছেন? ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৭৪ সাল, মাইকেল—এদের উল্লেখে অনুমান হয় কবির বলছেন ওয়ারেণ হেস্টিংসের আমল থেকে মোটামুটি ড্যালহৌসি-ক্যানিংয়ের আমলের কথা।

একথা মানতে বাধা নেই যে অনেক বাঙালী মধ্যবিত্তের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ইংরেজের ঐশ্বর্যে কিন্তু যে-আমলের কথা পূর্বের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি, সে-আমলে অর্থাৎ রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-শিবনাথ শাস্ত্রীর আমলে শিক্ষিত বাঙালীর মানস কি শুধুই ইওরোপীয় সভ্যতার আলোকে প্রতিফলিত? আর বাঙালী কি সেদিন নির্বিচারে ইওরোপের আদর্শকে গ্রহণ করেছিল? ঈশ্বর গুপ্তের ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গগুলি কাদের প্রতি উদ্দিষ্ট?

(৬) কবির বলছেন: 'ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে রাষ্ট্রিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এল শিল্পজ অধোগতি। ইওরোপীয় সভ্যতার প্রথম সংস্পর্শেও তা কাটেনি এবং কৃত্রিম অনুকৃতির ফলে শিল্পচেতনায় পর্যন্ত বিকৃতি এসেছে। অবনীন্দ্রনাথের মধ্যেই ভারতীয় চিত্রপ্রতিভার পুনরুজ্জীবনের প্রথম দৃষ্টান্ত মেলে।' (৭০-৭১ পৃঃ)

কোন্ হিসাবে শিল্পজ অধোগতি এসেছিল? আমি অর্থনৈতিক অধোগতির কথা বলছি না, তা তো এসেছিলই—ঢাকাই তাঁতির কথা স্মরণ করুন—আমি ভাবছি শৈল্পিক গতির কথা। কি কারণ আছে এমন মনে করার যে Handicrafts বা হস্তশিল্পের শৈল্পিক অধোগতি হয়েছিল ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে? কি কারণ আছে মনে করার যে সঙ্গীতের অধোগতি হয়েছিল? যদু ভট্ট তো সে-আমলেরই লোক? অথবা কি কারণ আছে মনে করার যে চিত্রশিল্পের অধোগতি হয়েছিল?

যামিনী রায়ের প্রভাবে আমরা কালীঘাটের পটচিত্রের কথা ইদানীং—গত ত্রিশ বছর—খুব শুনেছি। কালীঘাটের পোটোরা কোন্ যুগের? উনিশ

শতক, আঠারো শতকের নয় কি? যে-শিল্পধারা যামিনী রায়ের মারফত বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে তা' আমাদের ঘরের পাশেই সেদিন পর্যন্ত প্রাণবন্ত ছিল, এমন কি হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথ যখন ইওরোপীয় পন্থায় চিত্র-বিদ্যা শিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন তখন পর্যন্ত (বস্তুত যামিনী রায়ের কাল অর্থাৎ আমাদের কাল পর্যন্ত) বাঙলার অতি নিজস্ব চিত্রশিল্পপদ্ধতি স্ব-মহিমায় অথচ সবিনয়ে বিরাজ করেছিল। বাঙলা দেশের অন্যত্র সম্পূর্ণ দেশীয় চিত্র প্রণালী (যেমন দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রে) আদৌ অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত ছিল না। যখন বাঙলা চিত্রশিল্পের বিশদ ইতিবৃত্ত রচিত হবে তখন হুমায়ুন কবিরের উপরি-উদ্ধৃত উক্তি টিকবে কিনা সন্দেহ।

(৬)

আমার অনেক সংশয়ের মধ্যে মাত্র পাঁচটির উল্লেখ করেছি। ভরসা করছি এ কয়টি থেকেই প্রমাণ হবে যে সংকীর্ণ তথ্য-সঞ্চয়ের মধ্যেও যে-কয়েকটি তথ্যের নির্ভরে হুমায়ুন কবির বাঙলার কাব্যে বাঙালী মানসের সন্ধান করেছেন সে-তথ্য কয়টিও সংশয়সঙ্কুল। নিজের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব কয়েকটিকে প্রতিষ্ঠিত করার সময় যেন কবির তথ্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে শিথিল-প্রযত্ন হয়েছেন।

উপরোক্ত সংশয় কয়টি ছাড়াও আরেক বিষয়ে আমার ক্ষোভ জ্ঞাপন না ক'রে পারছি না।

বাঙলার কাব্যধারার আলোচনায় কবির বারংবার, বিশেষত শেষ অধ্যায়ে, বাঙালীকে ভাগ করেছেন হিন্দুতে মোসলেমে। 'হিন্দু মধ্যবিত্ত', 'মোসলেম মধ্যবিত্ত' এ দুটি শব্দবন্ধ শেষ অধ্যায়ে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

হুমায়ুন কবির দেশপ্রেমিক, মুক্তবুদ্ধি, বহু-অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আধুনিক বাঙলার (উনিশ শতক ও তৎপরবর্তী) সমাজ-জীবনে হিন্দু ও মুসলমানের ক্রমবর্ধমান বিভেদ লক্ষ্য করেছেন, সে-লক্ষ্য রিয়্যালিস্টিক্ লক্ষ্য। সে-বিভেদ পূর্বতন শতাব্দীগুলিতেও অল্পবিস্তর ছিল কিন্তু তখনকার প্রধান ঝোঁক ছিল সমন্বয়ের দিকে। কবির সে সমন্বয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ইংরেজ আমলে কি ভাবে বিভেদ বাড়তেই থাকল তারও সুষ্ঠু বিশ্লেষণ করেছেন অথচ বিশ্লেষণে ক্ষণেও তাঁর সমন্বয়-প্রত্যয়ী উদার চিত্ত বিভেদের দরুন ব্যথিত

হয়েছে। তিনি কারুর ওকালতি করেননি, না হিন্দুর না মুসলমানের। তাঁর বিচারে উভয় শ্রেণীতে যতখানি গুণত্রুটি ধরা পড়েছে ততখানি তিনি অপক্ষপাতে বর্ণনা করেছেন।

কবিরের কাব্যালোচনা সমাজবিজ্ঞানী দৃষ্টিতে আলোচনা। সে কারণেই 'হিন্দু মধ্যবিত্ত', 'মোসলেম মধ্যবিত্ত' এই শব্দবন্ধ দুটিতে আমার আপত্তি। এ যেন মানদণ্ডের মিশ্রণ। যখন হিন্দু মোসলেম আখ্যা দুটি ব্যবহার করি, তখন মানুষে মানুষে ধর্মীয় বিভেদ জ্ঞাপন করি, কিন্তু যখন মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, ধনপতি (বা পুঁজিবাদী যা-খুশি বলুন) ইত্যাদি আখ্যাগুলি ব্যবহার করি তখন অন্য মানদণ্ডের বিচারে মানুষে মানুষের বিভেদ বুঝি। যিনি মধ্যবিত্ত তিনি মধ্যবিত্তই, তিনি হিন্দু না খ্রীষ্টান সে কথার সঙ্গে তাঁর মধ্যবিত্ততার সম্পর্ক কী? যে উর্বশী 'আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে/দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো!' সে হিন্দুর ঘরে আসবে না, মুসলমানের ঘরেও আসবে না, সে আসবে মধ্যবিত্তের রক্তে।

ধর্মীয় মানদণ্ডের সঙ্গে মেটিরিয়ালিস্টিক অর্থনৈতিক মানদণ্ডের এই সংমিশ্রণ আমার মনে হয়েছে পরিচ্ছন্ন চিন্তার অন্তরায়, অসঙ্গতি।